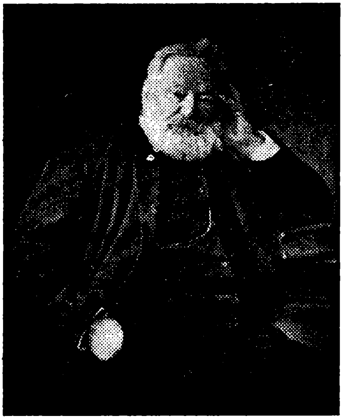
লেখক পরিচিতি



বিখ্যাত ফরাসি লেখক ভিক্টর হুগো ১৮০২ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে ফ্রান্সের বেযানসঁ-তে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম জোসেফ লিয়োপোল্ড সিজিসবার্গ হুগো এবং মায়ের নাম সোফি ট্রেবুশে। ঊনিশ শতকের সবচেয়ে প্রভাবশালী রোমাণ্টিক লেখক বলা হয় ভিক্টর হুগোকে। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, রাজনীতিক ও মানবাধিকার কর্মী। ফ্রান্সে রোমাণ্টিক ধারার সাহিত্যের প্রবক্তাও তিনি। কবিতা দিয়ে সাহিত্য রচনা শুরু। কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাঁকে ফ্রান্সের সেরা কবি হিসেবেও গণ্য করা হয়। কবিতা তাঁর প্রাথমিক খ্যাতি আনলেও পরবর্তীতে তাঁর উপন্যাস এবং নাটক হুগোকে আলাদা উচ্চতায় নিয়ে আসে। *লা মিজারেবল* এবং *হাঞ্চব্যাক অভ নটরডেম* তাঁর রচিত দুটি বিখ্যাত উপন্যাস।

যৌবনে হুগো উদার রক্ষণশীল থাকলেও কয়েক দশকের ব্যবধানে প্রচণ্ড রকমের বাম ঘরানার রাজনীতিতে প্রভাবিত হন। তিনি প্রজাতান্ত্রিক আদর্শের সমর্থক ছিলেন। শুধু একজন সাহিত্যিক হিসেবেই নয়, ফ্রান্সে গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রায় হুগোর ভূমিকা সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত। মুক্তিকামী এ লেখক দরিদ্র ও বঞ্চিতদের জন্য সামাজিক সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি ২৫

বছর বয়সে ফরাসি অ্যাকাডেমির সদস্য হয়েছিলেন এবং একই সময়ে ফরাসি সংসদ সদস্যও নির্বাচিত হয়েছিলেন। রাজা তৃতীয় নেপোলিয়নের স্বৈরশাসনের প্রতিবাদ করায় তাঁকে রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয় এবং প্রায় বিশ বছরের জন্য ব্রাসেলস, জার্সি এবং গুয়ের্নসিতে নির্বাসিত জীবনযাপনে বাধ্য করা হয়। নির্বাসিত জীবনেই তিনি রচনা করেন তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মগুলো। ১৮৭০ সালে নির্বাসন থেকে ফিরে এলে জাতি তাঁকে বীরের সম্মানে ভূষিত করে।

সাহিত্যে রোমান্টিসিজমের অগ্রপথিক মনে করা হয় হুগোকে। তাঁর উল্লেখযোগ্য অন্যান্য বইয়ের মধ্যে রয়েছে *নাইন্টি থ্রি*, *টয়লার্স অভ দ্য সি*, *দ্য ম্যান হু লাফস্*, *হিস্ট্রি অভ আ ক্রাইম*, *দ্য লাস্ট ডে অভ আ কনডেমড্ ম্যান*, *দ্য স্লেভ কিং*, ইত্যাদি।

তিরাশি বছর বয়সে, ১৮৮৫ সালের ২২ মে তারিখে প্যারিসে মারা যান এই মহান লেখক।

এক

১৭৯৩ সাল। মে মাসের শেষ ভাগ।

প্যারিস থেকে এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য পাঠানো হয়েছে ব্রিটানিতে। আস্তিয়ি-র অন্তর্গত লা সুদ্রে-র গভীর জঙ্গলে শত্রুদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে এরা। সব মিলিয়ে মাত্র তিনশো সৈন্য আছে এই ব্যাটালিয়নে। শুরুতে ছিল দ্বিগুণ, মানে ছয়শো... কিন্তু ভয়াবহ যুদ্ধে অর্ধেক সৈন্য হারিয়েছে বাহিনীটা।

উত্তাল এক সময় কাটাচ্ছে ফ্রান্স। গৃহযুদ্ধ চলছে রাজতন্ত্রের অনুসারী এবং বিপ্লবী প্রজাতন্ত্রীদের মাঝে। বিপ্লবীরা ইতোমধ্যে দখল করে নিয়েছে রাজধানী, ফাঁসি দিয়েছে রাজা ষোড়শ লুই-কে। নিজেদের জয়ী বলে দাবি করছে তারা, কিন্তু হার মানেনি রাজতন্ত্রীরা। দেশের বিভিন্ন জায়গায় সংগঠিত হয়ে পাল্টা আক্রমণ চালাচ্ছে তারা। প্রতিবিপ্লবের নামে চলছে ভয়ানক লড়াই।

প্যারিস থেকে প্রজাতন্ত্রীদের বারো হাজার সৈন্যের বিশাল এক বাহিনী পাঠানো হয়েছিল লা ভঁদি-র যুদ্ধে। অস্ত্র-শস্ত্রের কমতি ছিল না ওদের, তবে সৈনিকদের বেশিরভাগই ছিল আনাড়ি। অল্পসময়ে বাহিনী গড়ায় স্বেচ্ছাসেবক না নিয়ে উপায় ছিল না, তাদেরকে ঠিকমত প্রশিক্ষণও দেয়া যায়নি। ফলে যা

ঘটার তা-ই ঘটেছে। লড়াইয়ের মাত্র এক মাসের মধ্যে মারা পড়েছে আট হাজার সৈন্য। যারা বেঁচে আছে, তারাও যে খুব বেশিদিন টিকবে না, তা বলা বাহুল্য।

এ-কারণেই লা সুদ্রে-র জঙ্গলে নিয়োজিত বাহিনীটি কাজ করছে অত্যন্ত সতর্কভাবে। ব্যস্ত হচ্ছে না কেউ। সামনে, পিছনে, ডানে, বামে... সবদিকেই রাখা হয়েছে সতর্ক নজর। অতর্কিতে যাতে হামলা না করতে পারে শত্রুপক্ষ। ঘন গাছপালার কারণে ঠিকমত সূর্যের আলো ঢোকে না বনে, সবখানে ছায়ার রাজত্ব। তার ভিতরে খুব সহজেই ঘাপটি মেরে থাকতে পারে শত্রুরা। তাই সময় নিয়ে, ধীরে-সুস্থে বনের ভিতর তল্লাশি চালাচ্ছে সৈনিকরা। ওদের এগোবার গতি অত্যন্ত মন্থর।

অনেক ফুল ফুটেছে বনের গভীরে। হাজারো গাছের ডালপালা মিলে-মিশে যেন তৈরি করেছে দুর্ভেদ্য এক প্রাচীর, বাইরের পৃথিবী থেকে আলাদা করে দিয়েছে বনকে। গাছের পাতায় লেগে আছে শিশির, ঝলমল করছে গাছের ফাঁকফোকর দিয়ে ঢুকে পড়া সূর্যের আলোয়। গ্ল্যাডিওলাস, নার্সিসাস, জেনোটের মত নানা রকম ফুল দেখা যাচ্ছে আশপাশে। কিন্তু সেদিকে কোনও নজর নেই সৈনিকদের, ঝোপঝাড় ভেঙে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে ওরা। ওদের আওয়াজ পেয়ে ক্ষণে ক্ষণেই উড়ে যাচ্ছে ভয়ার্ত পাখিরা।

শান্তির সময়ে লা সুদ্রের অরণ্য ছিল বিনোদন ও অবকাশ যাপনের জন্য আদর্শ স্থান—মনের আনন্দে পাখি শিকার করত লোকে, বনভোজনের আয়োজন করত... এখন এখানে মানুষ শিকার চলছে। বনটা বার্চ, বিচ আর ওকগাছে ভরা। মাটি সমতল। পায়ের তলায় ঘাস আর শ্যাওলার পুরু গালিচার কারণে পদশব্দ শোনা যায় না। পথের হদিস পাওয়া দায়, আগাছা আর

ঝোপঝাড় এতই ঘন যে, মাঝে মাঝে দশ ফুট দূরের জিনিসও দেখতে পাওয়া যায় না। দেখার মধ্যে শুধু বুনো পাখি দেখছে সৈন্যরা—ওদের উপস্থিতি টের পেলেই ডানা ঝাপটে উড়ে যাচ্ছে ওগুলো। বোঝা যাচ্ছে, আশপাশে কোথাও জলাশয় আছে, সে-কারণেই এত পাখি বাস করছে এদিকে।

এক সারিতে এগোচ্ছে না সৈন্যরা, এগোচ্ছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। যাতে অতর্কিত হামলার মুখে পড়লেও একসঙ্গে সবাই ঘায়েল না হয়। অজানা ভয় আর উত্তেজনায় বুক ঢিব ঢিব করছে সবার। বলা তো যায় না, কখন শত্রুর মুখোমুখি হয়ে যায়!

এরই মধ্যে বেশ কিছু পরিত্যক্ত ক্যাম্পের চিহ্ন দেখেছে ওরা। অগ্নিকুণ্ডের ছাই, পায়ের ছাপ, আর রক্তের দাগ দেখে বুঝতে পেরেছে, ওসব জায়গায় আশ্রয় নিয়েছিল প্রতিপক্ষ—বিশ্রাম নিয়েছে, শিকার করেছে, সেরেছে খাওয়াদাওয়া... আর শুশ্রূষা করেছে আহত সঙ্গীদের। সৈন্যরা পৌঁছুনোর আগেই ক্যাম্প গুটিয়ে কেটে পড়েছে আবার। কোথায় গেছে ওরা কে জানে। কোথাও ঘাপটি মেরে পড়ে থাকলেও অবাক হবার কিছু নেই। হয়তো ফাঁদ অপেক্ষা করছে সৈন্যদের জন্য—নাগালের মধ্যে পেলেই গুলি ছুঁড়ে ঝাঁঝরা করে দেবে।

অবশ্য তেমন কোনও আলামত এখন পর্যন্ত চোখে পড়েনি। বরং হাবভাবে মনে হচ্ছে, বহু আগেই পালিয়ে গেছে শত্রুরা... লা সুদ্রের অরণ্য এখন শত্রুমুক্ত। কিন্তু কেন যেন নিশ্চিন্ত হতে পারছে না সৈন্যরা। জনমানবহীন বনভূমির থমথমে পরিবেশে ক্রমেই বেড়ে উঠছে ওদের অবিশ্বাস আর সন্দেহ। ভয় পাচ্ছে, এই বুঝি ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ে শত্রুরা।

স্কাউট হিসেবে ত্রিশজন বন্দুকধারীকে রাখা হয়েছে সামনে,

এদের নেতৃত্ব দিচ্ছে একজন সার্জেন্ট। নিয়মিত সৈন্যের পাশাপাশি একজন স্বেচ্ছাসেবী ভিভাঁদিয়ের* রয়েছে তাদের সঙ্গে। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল দলটা। সামনে থেকে অস্বাভাবিক একটা শব্দ ভেসে এসেছে, নড়ে উঠেছে একটা ঝোপ। কেউ লুকিয়ে আছে ওখানে!

সঙ্গীদের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে ইশারা করল সার্জেন্ট। চোখের পলকে ঝোপের চারপাশ ঘিরে ফেলল তারা। ভিভাঁদিয়ের এগিয়ে গিয়ে উঁকি দিল ঝোপের পাতা সরিয়ে, তারপরেই ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'থামো! ভয়ের কিছু নেই।'

সন্তুষ্ট হলো না সার্জেন্ট, তাই বলে গুলি চালাবারও হুকুম দিল না। ভিভাঁদিয়ের ইতোমধ্যে ঢুকে পড়েছে ঝোপের ভিতর, সঙ্গীদের অপেক্ষা করতে বলে সার্জেন্টও তাকে অনুসরণ করল। ঝোপ পেরিয়ে অন্যপাশে পৌঁছুতেই চমকে গেল সে। এমন কিছু দেখবে, আশা করেনি।

বড় একটা গাছের ছায়ায়, ঝরা পাতার মাঝে বসে আছে এক যুবতী, সঙ্গে তিনটি শিশু। ছোট্ট বাচ্চাটাকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছে সে; অন্য দুটি বাচ্চা... দু'টি ছেলে... শুয়ে আছে তার পায়ে মাথা রেখে। সবার চেহারা-সুরত নোংরা, ময়লা, পরিশ্রান্ত... যেন ঝড় বয়ে গেছে ওদের উপর দিয়ে।

কোনোদিকে খেয়াল নেই মা বা তার সন্তানদের। ভিভাঁদিয়েরের তীক্ষ্ণ কণ্ঠ শুনে চমকে উঠল।

'অ্যাই! কে তুমি? এখানে কী করছ?'

**ভিভাঁদিয়ের*—আগের আমলে ফরাসি সামরিক বাহিনীর প্রতিটি রেজিমেন্টের সঙ্গে কিছু বেসামরিক নারী সদস্য থাকত। তাদের কাজ ছিল যুদ্ধের ময়দানে লড়াইরত সৈনিকদের মাঝে মদ বিতরণ করা... তাদেরকে চাঙ্গা রাখা। এদেরকেই ভিভাঁদিয়ের বলে।*

মুখ তুলে তাকাল যুবতী। দৃষ্টিতে শূন্যতা।

ভিভাঁদিয়ের কড়া গলায় বলল, 'তুমি কি পাগল? কী মনে করে এখানে ঘাপটি মেরেছ? আরেকটু হলেই তো গুলি খেয়ে পটল তুলতে!'

আরও কিছু সৈন্য ঝোপ মাড়িয়ে সামনে চলে এসেছে, তাদের রুক্ষ চেহারা আর হাতের অস্ত্রশস্ত্র দেখে ঘাবড়ে গেল যুবতী। মুখ দিয়ে কোনও আওয়াজ বেরুল না।

ঘুমন্ত বাচ্চাদুটোও জেগে উঠেছে। একটা ছেলে বলল, 'আমার খিদে পেয়েছে, মা।'

অন্যজন বলল, 'আমার ভয় করছে।' মায়ের গায়ের সঙ্গে সেঁটে গেল সে।

কোলের বাচ্চাটাই শুধু নির্বিকার—বোঝার বয়স হয়নি ওর। একমনে মায়ের দুধ খাচ্ছে।

ওদের অবস্থা দেখে একটু নরম হলো সার্জেণ্ট। কোমল গলায় বলল, 'ভয় পেয়ো না। আমরা *বুলে-হুজ* এর সৈন্যদল।'

লাভ হলো না নরম কথায়। ভয়ে থরথর করে কাঁপছে যুবতী। ভারী গোঁফ, পুরু ভ্রূ আর রক্তলাল চোখ মিলিয়ে সত্যিই ভয়ঙ্কর চেহারা সার্জেণ্টের। বিস্ফারিত চোখে সেদিকে তাকিয়ে আছে সে।

'কে তুমি, মাদাম?' গলার স্বর আরও নরম করে ফেলল সার্জেণ্ট।

তিরতির করে কেঁপে উঠল যুবতীর ঠোঁট। একেবারেই শুকনো-পাতলা দেহ তার। পরনের পোশাক ব্রিটানির গ্রাম্য এলাকার মেয়েদের মত, ছেঁড়াখোঁড়া। পায়ে জুতো নেই, খালি পায়ে হাঁটতে গিয়ে রক্তাক্ত করে ফেলেছে পায়ের তলা।

একটু বিরক্ত হয়ে ভিভাঁদিয়েরের দিকে ফিরল সার্জেণ্ট।

'দেখে তো ভিখিরি মনে হচ্ছে।'

'দাঁড়ান। আমি কথা বলছি।' যুবতীর সামনে হাঁটু গেড়ে বসল ভিভাঁদিয়ের। 'অ্যাই, আমার দিকে তাকাও। তোমার নাম কী?'

এতক্ষণে মুখের ভাষা খুঁজে পেল মেয়েটি। নিচু গলায় বলল, 'মিশেল ফ্লেশা।'

কোলের বাচ্চাটার মাথায় হাত বোলাল ভিভাঁদিয়ের। 'এর বয়স কত?'

'দেড় বছর।'

'তা হলে তো দুধ ছাড়ার বয়স হয়ে গেছে। এসো, আমরা ওকে অন্য কিছু খেতে দেব।'

সাহস ফিরে পেতে শুরু করেছে মিশেল নামের মেয়েটি। ছেলেদুটোও কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। ভয় নয়, এখন ওরা কৌতূহল নিয়ে তাকাচ্ছে সৈন্যদের পোশাক-আশাক আর অস্ত্রের দিকে।

মিশেল বলল, 'সত্যিই খেতে দেবে? খুব ভাল হয় তা হলে। আমার বুকে আর একটুও দুধ নেই।'

'নিশ্চয়ই দেব,' বলে উঠল সার্জেন্ট। 'শুধু ও নয়, তোমরাও খাবার পাবে। কিন্তু তার আগে বলো, তোমাদের রাজনৈতিক দর্শন কী?'

একটু অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল মিশেল। এ আবার কেমনতরো প্রশ্ন!

'জবাব দাও। চুপ করে থেকো না।' রুক্ষ গলায় বলল সার্জেন্ট।

কাঁধ ঝাঁকাল যুবতী। বলল, 'ছেলেবেলায় একটা কনভেন্টে ভর্তি হয়েছিলাম আমি, কিন্তু সন্ন্যাসিনী হতে পারিনি। তাই বিয়ে

করে সংসার শুরু করেছিলাম। কনভেন্টেই আমি ফরাসি ভাষা শিখেছি।' আকুতি ফুটল তার গলায়। 'আমাদের গ্রামে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে, সার। সবাই পুড়ে মরেছে। আমি কোনোমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি... এই দেখুন, জুতো পর্যন্ত পরার সময় পাইনি!'

'এত কাহিনি কে শুনতে চেয়েছে তোমার কাছে?' উষ্মা প্রকাশ করল সার্জেন্ট। 'আমি তোমার রাজনৈতিক দর্শন জানতে চেয়েছি। মানে... তুমি কাদের সমর্থক?'

'আ... আমি আপনার প্রশ্নটা বুঝতে পারছি না।'

'নাটক কোরো না, মাদাম। আমি জানি, এই বনের ভিতরে বহু গুপ্তচর ঘুরে বেড়ায়। তুমি তাদের কেউ নও তো? তা হলে গুলি খেয়ে মরবে।'

'না, না,' তাড়াতাড়ি বলল মিশেল। 'আমি গুপ্তচর নই।'

'তা হলে কে তুমি? জিপসি বলে তো মনে হচ্ছে না। কোন্ দেশের মানুষ তুমি?'

'আ... আমি জানি না।'

'নিজের জন্মভূমির নাম জানো না? ফাজলামি করছ?'

'জন্মভূমি? তা তো জানি। অ্যাজি জেলার সিসকয়নিয়া... ওখানকার এক খামারে জন্ম হয়েছে আমার।'

বিতৃষ্ণা জমল সার্জেন্টের চোখে। 'সিসকয়নিয়া? ওটা কি কোনও দেশ? দেখো মাদাম, আমাকে খেপিয়ো না। তার ফল ভাল হবে না।'

তার চোখে চোখ রাখল মিশেল। খানিক পর উজ্জ্বল হয়ে উঠল মেয়েটার দৃষ্টি। 'এবার বুঝেছি কী জানতে চাইছ। তোমাদের মত আমিও ফরাসি কি না, এই তো? না, আমি ব্রিটানির মানুষ।'

‘একই তো হলো, তাই না? ব্রিটানি এখন ফ্রান্সেরই অংশ।’

‘হয়তো। কিন্তু নিজেকে কখনো ফরাসি ভারিনি আমি, ভেবেছি সিসকয়নিয়ার নাগরিক।’

হাল ছেড়ে দিল সার্জেন্ট। প্রশ্নের ধারা পাল্টাল। ‘তোমার আত্মীয়-স্বজন কি ওখানেই থাকে?’

‘হ্যাঁ।’

‘কী করে ওরা?’

‘কিছুই না। কারণ এখন ওদের কেউই বেঁচে নেই।’

রাগ সংবরণ করা কঠিন হয়ে পড়ছে সার্জেন্টের জন্য। ক্রুদ্ধ গলায় বলল, ‘মরলে মরেছে! আগে কী করত, সেটা তো বলতে পারো। তুমি অযথাই কথা ঘোরাচ্ছ, মাদাম। এখন পর্যন্ত তুমি কোন্ দলের সমর্থক, সেটাও বলছ না। তোমার ভালর জন্য বলছি...’

‘আপনি থামুন তো!’ কড়া গলায় তাকে থামিয়ে দিল ভিভাঁদিয়ের। ‘ওর অবস্থা দেখেছেন? এ-সময় এভাবে জেরা করলে ঠিকঠাক জবাব দেবে কীভাবে?’ আবার হাত বোলাল কোলের বাচ্চাটার মাথায়। ‘বড্ড সুন্দর বাচ্চা। মেয়ে? কী নাম রেখেছ এর?’

‘জর্জেত,’ বলল মিশেল।

‘আর ছেলেদুটো? বয়স কত ওদের?’

‘গুনেজাঁ-র বয়স চার, আর গোয়াঁইলা-র তিন।’

‘তুমি ভাগ্যবতী... এত চমৎকার তিনটে বাচ্চার মা হতে পেরেছ। এসো, পরিচয় হয়ে যাক। আমার নাম মামজেল বিকোমু, লোকে উজার্দ বলে ডাকে। আমি এই ব্যাটালিয়নের ভিভাঁদিয়ের।’

‘পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, উজার্দ।’

'ইশ্‌শ্‌, তোমার পা-দুটোর কী অবস্থা। আমার একজোড়া জুতো দেব? আশা করি সাইজে মিলে যাবে।'

'অশেষ দয়া তোমার, মাদাম।'

'ও কিছু না,' মাছি তাড়াবার ভঙ্গিতে হাত নাড়ল ভিভাঁদিয়ের। মিশেল ওর সঙ্গে সহজ হয়ে এসেছে, তাই কৌশলে শুরু করল জেরা। 'তোমার বাড়ি কোথায়, মিশেল? কোত্থেকে এসেছ?'

'অ্যাজি জেলায় থাকতাম আমি, কিন্তু আমার বাড়িঘর সব পুড়িয়ে দিয়েছে ওরা।'

'কারা পুড়িয়ে দিয়েছে?'

'জানি না। হামলা হয়েছিল আমাদের গ্রামে, কারা করেছে দেখিনি। তার আগেই পালিয়েছি।'

'এখন কোথায় যাচ্ছ?'

'তা-ও জানি না। শুধু জানি, বাঁচতে হলে চলে যেতে হবে বহুদূর।'

'তুমি কোনও রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করো? নীল বা সাদা?'

'কাউকেই সমর্থন করি না আমি।'

সাগ্রহে সামনে ঝুঁকল সার্জেণ্ট। এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে, কীভাবে কথা বলতে হবে মেয়েটির সঙ্গে। বলল, 'আমার নাম রাদু, মাদাম। আমি এই বাহিনীর একজন সার্জেণ্ট। বাড়ি গের্শমিদি শহরে। আমার বাবা-মা ওখানেই থাকেন। তোমার বাবা-মা কী করেন?'

'আমার বাবা ফ্লেশা বংশের লোক ছিল,' বলল মিশেল।

'তা তো বুঝলাম। কিন্তু তাঁর পেশা কী ছিল?'

'কৃষক। খুব গরীব ছিল আমার বাবা। একবার খিদের

জ্বালায় একটা পোষা খরগোশ চুরি করে বসেছিল। ধরা পড়বার পর তাঁর মনিব... মানে আমাদের এলাকার জমিদার... পিটিয়ে পা ভেঙে দেয় তাঁর। পঙ্গু হয়ে যান তিনি।'

'তোমার দাদু?'

'তিনি ছিলেন প্রোটেস্ট্যাণ্ট খ্রিস্টান। এ-নিয়ে গাঁয়ের যাজকের সঙ্গে গোলমাল হয়েছিল তাঁর। শাস্তি হিসেবে ক্রীতদাস হিসেবে একটা যুদ্ধজাহাজে খালাসীর কাজ করতে পাঠানো হয় তাঁকে। আমার বয়স তখন খুবই কম।'

'তাই নাকি? এমন দুর্ভাগা আর কোনও আত্মীয় আছে তোমার?'

'আমার শ্বশুর। লবণের চোরাকারবারি করতেন তিনি। ধরা পড়বার পর রাজা তাঁকে ফাঁসি দেন।'

'এ দেখি জাত অপরাধীর বংশ!' পিছন থেকে ফোড়ন কাটল এক সৈনিক।

ঝট্ করে তার দিকে ফিরে অগ্নিদৃষ্টি হানল সার্জেণ্ট রাদু। 'মুখ সামলে কথা বলো! এটা শুঁড়িখানা নয় যে, মাতালের মত মুখে যা আসবে তাই বলে ফেলবে। ভদ্রতা বজায় রাখো।'

কাঁচুমাঁচু হয়ে গেল সৈনিক।

মিশেলের দিকে ফিরল আবার সার্জেণ্ট। 'তোমার স্বামী কোথায়, মাদাম?'

বিষণ্ন হয়ে উঠল মিশেলের মুখটা। 'নেই। যুদ্ধে গিয়েছিল ও, তিনদিন আগে মারা গেছে।'

'যুদ্ধে গিয়েছিল? কাদের হয়ে? নীল দল, না সাদা দল?'

'আমি জানি না। গাঁয়ের যাজক ওকে জোর করে যুদ্ধে পাঠিয়েছিল। ও তো যেতে চায়নি! আমিও জিজ্ঞেস করিনি কার হয়ে যুদ্ধ করতে যাচ্ছে ও।'

'এটা একটা কথা হলো? এমন ভয়ানক যুদ্ধ চলছে সারা দেশে... অথচ কে কোন্ পক্ষের, তার কিছুই জানো না তুমি?'

'না। এসব আমার ভাল লাগে না। কারা যুদ্ধ করছে, কীসের জন্য এই সর্বনাশা যুদ্ধ... তার কিছুই জানা নেই আমার। আমি শুধু জানি, এই যুদ্ধে আমার স্বামীর প্রাণ গেছে।'

'হুম। স্বামী মারা যাবার পর থেকে তুমি পালিয়ে বেড়াচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় যাবে, বা কী করবে তার কিছুই ঠিক করোনি?'

'না।'

'রাতের বেলায় থাকছ কোথায়?'

'মাটির উপরে।'

'খাচ্ছ কী?'

'গাছের শেকড়-বাকড়।'

'তারমানে তো কিছুই খাওনি।'

খাবারের প্রসঙ্গ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বড় ছেলেটি বলে উঠল, 'আমার খিদে পেয়েছে।'

'আমারও,' সুর মেলাল ছোটটি।

করুণা হলো সার্জেন্টের। নিজের কোমরে ঝোলানো থলে থেকে একটা পাউরুটি বের করে দিল। ওটাকে দু'টুকরো করে ছেলেদের হাতে তুলে দিল মিশেল। বুভুক্ষের মত খেতে শুরু করল বাচ্চাদুটো।

মিশেলের পাশ থেকে উঠে এল ভিভাঁদিয়ের। সার্জেন্টকে বলল, 'দেখলেন, নিজের জন্য ও কিছুই রাখল না।'

'হয়তো খিদে পায়নি।'

'ভুল। খিদে ঠিকই পেয়েছে, কিন্তু মা বলেই খাবারের পুরোটা ছেলেদের দিয়ে দিল নিজে না রেখে। আপনার কি

এখনও মনে হচ্ছে মেয়েটা গুপ্তচর?'

কাঁধ ঝাঁকাল সার্জেন্ট।

মিশেলের পাশে আবারও হাঁটু গেড়ে বসল ভিভাঁদিয়ের। 'অ্যাই মেয়ে, তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে? আমার দলের লোকেরা সত্যিই খুব ভাল। আমার মত তুমিও ভিভাঁদিয়েরের কাজ করতে পারবে। কঠিন কিছু না, যুদ্ধ শুরু হলে সৈনিকদের মাঝে ঘুরে ঘুরে মদ পরিবেশন করতে হয়। এর বিনিময়ে তিন বেলার খাবার আর নিরাপত্তা পাবে। কী বলো?'

'তোমরা আমাকে নেবে?' জিজ্ঞেস করল মিশেল।

'সার্জেন্ট?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে দলনেতার দিকে তাকাল ভিভাঁদিয়ের।

পালা করে মিশেল ও তার তিন সন্তানের উপর দৃষ্টি বোলাল সার্জেন্ট। অসহায়ত্ব ফুটে আছে ওদের চেহারায়। করুণা হলো তার। যথাসর্বস্ব হারিয়েছে এই বিধবা নারী; তার পিতা, শ্বশুর এবং স্বামী অত্যাচারিত হয়েছে রাজা, জমিদার আর গাঁয়ের যাজকের মত রাজতন্ত্রের প্রতিভূদের হাতে। এখন তিনটি অবুঝ শিশুকে নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে বেচারি, পালিয়ে বেড়াচ্ছে যুদ্ধের নৃশংসতার হাত থেকে বাঁচার জন্য। জঙ্গলের গাছগাছড়া ছাড়া ক্ষুধা নিবারণের উপায় নেই, মাথার উপরে মুক্ত আকাশ ছাড়া আর কোনও আচ্ছাদন নেই। এমন সর্বহারাদের মুক্তির জন্যই তো সংগ্রাম করছে বিপ্লবীরা।

দলের সৈনিকদের দিকে ফিরল সার্জেন্ট। গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, 'বন্ধুগণ, আমাদের সবাইকে এই তিনটা অনাথ বাচ্চার পিতৃত্বের দায়িত্ব নিতে হবে। লালন-পালন করতে হবে ওদেরকে। তোমরা রাজি আছ?'

একবাক্যে সায় জানাল সবাই। 'হ্যাঁ, সার্জেন্ট!'

হাসিমুখে এবার মিশেলের দিকে তাকাল রাদু। 'বেশ, আজ থেকে তোমরা আমাদের বুলে-হুজ বাহিনীর সদস্য হয়ে গেলে।'

আনন্দে কেঁদে ফেলল মিশেল। তাকে জড়িয়ে ধরল ভিভোঁদিয়ের। 'দেখো, দেখো, তোমার মেয়েটা কেমন করে তাকাচ্ছে!'

সৈনিকরা স্লোগান দিল, 'প্রজাতন্ত্রের জয় হোক।'

মিশেলের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সার্জেন্ট। 'এসো, মেয়ে। অনেকদূর যেতে হবে আমাদের।'

দুই

জুন মাসের এক তারিখ।

সূর্যাস্তের মাত্র এক ঘণ্টা বাকি। জার্সি উপকূলের নির্জন এক খাঁড়িতে, অতি সংগোপনে সমুদ্রযাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছে একটি কর্ভেট*। চারদিক কুয়াশায় ঢাকা পড়ে আছে, সবার চোখ এড়িয়ে যাত্রা শুরু করার জন্য পরিবেশটা আদর্শ। ইংল্যাণ্ডের নৌ-বহরের সর্বাধিনায়ক, প্রিন্স টুখ-দুভের্নিয়ার নির্দেশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক অভিযানে যাচ্ছে জাহাজটা।

ট্রিনিটি হাউসে *ক্লেমোর* নামে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে জাহাজটির। মালিক ইংল্যাণ্ড সরকার, কিন্তু ক্রু-রা সবাই ফরাসি।

***কর্ভেট—এক ধরনের ছোট রণতরী।**

আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ একটা পণ্যবাহী জাহাজ মনে হবে ওটাকে, আসলে তা নয়। দ্বৈত-উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে এ-জাহাজ—প্রথমত শত্রুদের চোখে ধুলো দিয়ে নির্বিঘ্নে চলাফেরা করবার জন্য; দ্বিতীয়ত জরুরি পরিস্থিতি দেখা দিলে লড়াই করার জন্য। ত্রিশটা উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন কামান লুকানো আছে এর খোলের ভিতরে। বিপদ দেখা দিলে খুলে দেয়া হবে ব্যারেলের সামনের পোর্টহোল, কামানের মুখ বের করে পুরোদস্তুর যুদ্ধজাহাজে পরিণত হবে ক্লেমোর। বাধিয়ে দিতে পারবে তাণ্ডব।

সাউথহ্যাম্পটনের ডকে তৈরি করা হয়েছে জাহাজটা, একেবারে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে। ক্ষমতার দিক থেকে সনাতন ফ্রিগেটের চেয়ে কোনও অংশেই কম নয় ওটা। ফ্রান্স থেকে পালিয়ে আসা অফিসার এবং নাবিকদের সমন্বয়ে গড়া হয়েছে জাহাজের ক্রু। এরা একদিকে যেমন জাহাজ-চালনায় পটু, অন্যদিকে রাজভক্তও বটে। জাহাজ, অস্ত্র আর রাজা—এর বাইরে আর কিছুই জানে না ওরা। এমনভাবে লোক বাছাই করা হয়েছে যেন প্রয়োজনে এই নাবিকরা একেকজন সৈনিক হয়ে উঠতে পারে।

ক্লেমোরের ক্যাপ্টেন হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন কাউন্ট দু রোয়ারগেনিউ—সেইন্ট লুইয়ের প্রাক্তন যোদ্ধা... রাজকীয় নৌবাহিনীর সেরা অফিসারদের একজন। সেকেণ্ড অফিসারের দায়িত্ব নিয়েছে দু লা ফিউতজিল নামে আরেক প্রাক্তন যোদ্ধা, তার অধীনে জাহাজে তোলা হয়েছে একদল ফরাসি সৈন্য। দলটার নেতৃত্ব দিচ্ছে সার্জেন্ট গশ। ক্লেমোরের পাইলট, মানে চালক হলো ফিলিপ গাইকোয়াল—জার্সির অন্যতম সেরা সারেং।

কর্মব্যস্ততায় মুখর হয়ে আছে জাহাজের পাটাতন,

অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছে সবাই। এমন সময় গ্যাংওয়ে ধরে বয়স্ক একজন পুরুষ উঠে এল জাহাজে, গায়ে অতি-সাধারণ চাষাভুষোর পোশাক। মানুষটি সুঠামদেহী; চেহারা আর দৈহিক অবয়বে শক্তির ছটা। মাথার সব চুল পেকে সাদা হয়ে গেলেও দু'চোখ দিয়ে বেরুচ্ছে অদ্ভুত এক দ্যুতি।

বিস্ময়ের ব্যাপার... দ্বীপের গভর্নর বালরাকাস, এবং প্রিন্স টুখ-দুভের্নিয়া সশরীরে এসে জাহাজে পৌঁছে দিয়েছেন এই বৃদ্ধকে, প্রিন্সের ব্যক্তিগত সহচর জেলাম তাঁর মালপত্র বয়ে এনেছে। বিদায় নেবার আগে অভিবাদন জানালেন বালরাকাস, 'আপনার সৌভাগ্য কামনা করছি আমি, জেনারেল।'

'বিদায়, ভ্রাতৃবর!' বললেন প্রিন্স টুখ-দুভের্নিয়া।

জবাবে মৃদু মাথা ঝাঁকালেন বৃদ্ধ। সবাই বুঝে গেল, চাষাভুষোর মত দেখালেও ইনি যে-সে লোক নন। তবে তাঁর সত্যিকার পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেল না।

বাতাস বইতে শুরু করেছে। তাড়াতাড়ি পাল খুলে দেয়া হলো। খাঁড়ি থেকে বেরিয়ে এল ক্লেমোর। ধীরে ধীরে বুলে উপসাগরের আঁধারে হারিয়ে গেল জাহাজটা।

ঘণ্টাখানেক পর সাউথহ্যাম্পটন এক্সপ্রেস মারফত ডিউক অভ ইয়র্কের হেডকোয়ার্টারে, কাউন্ট দাতোয়া-র কাছে একটা বার্তা পাঠাল জেলাম। সেটা এ-রকম:

মসিয়ো, জাহাজটা রওনা হয়ে গেছে। সাফল্য নিশ্চিত। এক সপ্তাহের ভিতর গ্র্যানভিল থেকে সাঁমালু পর্যন্ত সমগ্র উপকূল আগুনে জ্বলে উঠবে।

চারদিন আগে, গ্র্যানভিলে অবস্থানরত প্রিয়ো দু লা মার্ন নামে ফরাসি সেনাবাহিনীর এক সেনানায়ক, ঠিক একই হাতের লেখায় আরেকটি বার্তা পেয়েছে। তাতে লেখা ছিল:

জনাব, আগামী পহেলা জুন তারিখে ছদ্মবেশী যুদ্ধজাহাজ ক্লেমোর বিশেষ এক ভদ্রলোককে ফ্রান্স উপকূলে নামিয়ে দেবার জন্য সমুদ্র পাড়ি দেবে। তিনি লম্বা, বয়স্ক, এবং পক্বকেশঅলা। গায়ে চাষাদের মত সাধারণ পোশাক পরে থাকবেন। বিস্তারিত বিবরণ আগামীকাল পাঠাব। তবে নিশ্চিত থাকুন, মানুষটি দু'তারিখ ভোরে উপকূলে নামবেন। আপনাদের সব জাহাজকে সতর্ক করে দিন—যে-কোনও মূল্যে আটক করতে হবে ক্লেমোরকে, গিলোটিনে চড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে ওই বয়স্ক আরোহীকে!

বলাই বাহুল্য, প্রিন্সের ব্যক্তিগত সহচরটি আসলে একজন গুপ্তচর। ক্লেমোর জানে না, শুরুর আগেই ব্যর্থ হয়েছে ওদের অভিযান।

দক্ষিণে না গিয়ে উত্তর দিকে সেইন্ট ক্যাথারিনের দিকে এগোচ্ছে ক্লেমোর। সার্ক আর জার্সির মাঝামাঝি পৌঁছে পশ্চিমে মুখ ঘোরাল, ঢুকে পড়ল দু লা দিখোত প্রণালীতে। দু'পাশের উপকূলে কোনও লাইটহাউস নেই, রাতও নেমে এসেছে। আঁধারের মাঝ দিয়ে সন্তর্পণে এগিয়ে চলল জাহাজটা।

অনেক যাচাই-বাছাইয়ের পর এই পথ নির্বাচন করেছে সারেং গাইকোয়াল। হ্যানয় আর ডোভারের মাঝ দিয়ে এমনভাবে জাহাজ নিয়ে যেতে চাইছে, যাতে ফরাসি রণতরীগুলো দেখতে না পায় ওদেরকে। সেইন্ট হেলিয়ের আর গ্র্যানভিলের উপর কড়া নজর রাখছে ওগুলো। বাতাস যদি অনুকূলে থাকে, আর অযাচিত কোনও পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়, তা হলে এই পথে ওরা সকাল হবার আগেই ফরাসি উপকূলে পৌঁছে যেতে পারবে।

এখন পর্যন্ত সবকিছুই এগোচ্ছে আশানুরূপভাবে। নিরাপদে

গোয়ের্নি পেরিয়ে এসেছে ক্লেমোর। রাত ন'টার দিকে আবহাওয়া একটু অশান্ত হয়ে উঠল বটে, কিন্তু তাতে সমুদ্র খুব একটা প্রবল বা বিক্ষুব্ধ রূপ ধারণ করল না।

রহস্যময় বৃদ্ধ যাত্রীটি শুরু থেকেই অস্থির ভাবে পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন জাহাজের পাটাতনে। অশান্ত ঢেউয়ের আঘাতে ক্রমাগত দুলছে ক্লেমোর, কিন্তু তাতে ভ্রূক্ষেপ করছেন না তিনি। কথাও বলছেন না ক্যাপ্টেন ছাড়া আর কারও সঙ্গে। নাবিকরা লক্ষ করেছে, ক্যাপ্টেন বেশ সমীহ করে চলছেন মানুষটিকে।

দক্ষ হাতে জাহাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে গাইকোয়াল। হেল্‌ম থেকে নিয়মিত যাত্রার অগ্রগতি সম্পর্কে জানিয়ে চলেছে সে। পিয়ার দ্য লিক-এর বিপজ্জনক রিফ পেরিয়ে এল ক্লেমোর, একে একে আরও পেরুল গ্রেভ দ্য লিক এবং প্লিমন্ট। খুশি হয়ে উঠল সবাই, আলো না জ্বেলে না এমন বিপদসঙ্কুল পথ পাড়ি দেয়া যা-তা কথা নয়। তার ওপর রয়েছে কুয়াশা। কুয়াশা যদিও ক্লেমোরকে শত্রুদের চোখের আড়ালে রাখছে, তাই বলে সমস্যা সৃষ্টি করছে না এমন তো নয়। ঘন কুয়াশায় সামনের কিছুই দেখা যাচ্ছে না, উপকূল থেকে নেয়া যাচ্ছে না কোনও রেফারেন্স, স্রেফ পুরনো অভিজ্ঞতা আর জ্ঞানের উপর ভর করে জাহাজ চালাতে হচ্ছে গাইকোয়ালকে।

রাত দশটায় গ্রান্দ ইতাপে পৌঁছুল ক্লেমোর। এবার দেখা দিল সাগরের সত্যিকার তাণ্ডব। খেপা ঢেউয়ের আঘাতে মাতালের মত দুলতে শুরু করল গোটা খোল। পাটাতনে দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ নয়, তাই বৃদ্ধকে তাঁর কেবিনে নিয়ে গেল ক্যাপ্টেন বোয়াবার্থেলিউ এবং সেকেণ্ড অফিসার ফিউভিল।

ক্যাপ্টেনের স্টেটরুমটাই দেয়া হয়েছে বৃদ্ধকে। ওখানে ঢোকার আগে ওদের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ। বললেন,

'ভদ্রমহোদয়গণ, ব্যাপারটার গুরুত্ব আশা করি আপনারা জানেন। গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে আপনাদের। এই জাহাজে শুধু আপনারা দু'জন আমার সত্যিকার পরিচয় জানেন।'

ক্যাপ্টেন বললেন, 'কিচ্ছু ভাববেন না, মসিয়ো। জীবন দিয়ে হলেও আপনার গোমর রক্ষা করব আমরা।'

কাঁধ ঝাঁকালেন বৃদ্ধ। ক্যাপ্টেনের কথা বিশ্বাস করেছেন কি করেননি, বোঝা গেল না। নিঃশব্দে ঢুকে গেলেন স্টেটরুমে।

ফিউভিলকে নিয়ে পাটাতনে বেরিয়ে এলেন ক্যাপ্টেন। বললেন, 'কী মনে হয় তোমার? ভদ্রলোক কি আমাদের নেতৃত্ব দেবার উপযুক্ত?'

'কী জানি!' বলল ফিউভিল। 'আর কিছু না হোক, উনি একজন প্রিন্স। নেতা হবার মত কিছু না কিছু গুণ নিশ্চয়ই আছে।'

'ব্রিটানিতে উনি প্রিন্স। ফ্রান্সে নন। ওখানে স্রেফ একজন অভিজাত ভদ্রলোক। ঠিক ত্রিমোয়াল আর রোহান্সের মত।'

'শুনেছি ওঁরা এঁর আত্মীয়।'

'কী কপাল!' মাথা নাড়লেন ক্যাপ্টেন। 'ফরাসি রাজপুত্রের অভাবে আমরা এক ব্রিটন রাজপুত্রকে গ্রহণ করলাম!'

'ঠিকই বলেছেন,' একমত হলো ফিউভিল। 'এ যেন ঈগলের বদলে কাককে বেছে নেয়া।'

'এ-মুহূর্তে একজন ভাল নেতার বড়ই প্রয়োজন আমাদের,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন ক্যাপ্টেন। 'বলতে দ্বিধা নেই, তেমন কারও দেখা পাইনি এ-পর্যন্ত। হ্যাঁ... বহু বীরযোদ্ধা দেখেছি, কিন্তু ওদের কেউ নেতা হবার যোগ্য নয়। দেলবির কোনও সমর্থন নেই, লেসকিউ অসুস্থ, বুশাঁ-র হৃদয় বড্ড নরম... কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। এই ধরনের হাজারটা খুঁত রয়েছে প্রত্যেকের মধ্যে। ঈশ্বরের দিব্যি, বিপ্লবের বিরোধিতা করে যে কী লাভ তা

আমি বুঝি না। প্রজাতন্ত্রী আর আমাদের মধ্যে পার্থক্য কীসের, যদি আমরা যেন-তেন লোককে অভিজাতদের নেতা বানিয়ে দিই?'

'বিপ্লব আমাদের সর্বনাশ করে দিয়েছে।'

'ওটা একটা দুষ্টক্ষত, যার জন্য পুরো ফ্রান্স ভুগছে। এখন একমাত্র ইংল্যাণ্ডই পারে আমাদেরকে বাঁচাতে।'

'বাঁচাবে, তাতে আমার সন্দেহ নেই।'

'কিন্তু কতদিন লাগবে তাতে, কোনও ধারণা আছে তোমার, ফিউভিল? ততদিন আমরা জ্বলেপুড়ে মরব।'

'সত্যিই তাই। দেখছি তো, সবখানে অযোগ্য লোকের রাজত্ব। যে-রাজতন্ত্রে স্তফিয়ে-র মত সেনাপতি আর মলেভ্রিয়া-র মত লেফটেন্যাণ্ট আছে, সেই রাজতন্ত্র কী করে প্রজাতন্ত্রকে দোষারোপ করে? এমন দেশে কুলি-মজুরের ছেলে মন্ত্রী হবে না তো কোন্ দেশে হবে? ভঁদির যুদ্ধের কথাই ভাবুন... কারা যুদ্ধ করেছে ওখানে? একদিকে সন্ত্যাখের মত মদের কারবারী, অন্যদিকে গাসতুমের মত পরচুলার ব্যবসায়ী। কীসের রাজতন্ত্র আর কীসের প্রজাতন্ত্র... এদের মধ্যে কোনও পার্থক্য আছে?'

'গাসতুমের ব্যাপারে এভাবে কথা বলা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না,' দ্বিমত পোষণ করলেন ক্যাপ্টেন। 'তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি। গিমিনির যুদ্ধে নীল দলের তিনশো সৈন্যকে তিনি গুলি করে মেরেছিলেন।'

'ও-কাজ যে কেউ করতে পারে... মানে খুনোখুনি আর কী,' বলল ফিউভিল। 'কিন্তু মহৎ কীর্তির কথা যদি বলেন, সেটা অভিজাত লোক ছাড়া আর কাউকে দিয়ে হবে না।'

'নিচু জাতের মধ্যেও অবশ্য ভাল লোক আছে। ঘড়ির কারিগর জোলির কথাই ধরো। ফ্ল্যাণ্ডার্সের বাহিনীতে সার্জেণ্ট ছিল

সে, আর তার ছেলে ছিল প্রজাতন্ত্রী। শেষ পর্যন্ত লড়াইয়ে নামে বাপ-ব্যাটা। ছেলেকে নিজ হাতে খুন করে জোলি।'

'হ্যাঁ,' স্বীকার করল ফিউভিল। 'লোকটা সত্যিকার রাজভক্ত ছিল বটে। তাই বলে রাজতন্ত্রীদের বাহিনী নিচু জাতের লোকে পরিচালনা করবে, এটা মেনে নেয়া কষ্টকর।'

হাসলেন বোয়াবার্থেলিউ। 'ভেবেছ এটা একা আমাদের সমস্যা? প্রজাতন্ত্রীদের বাহিনীও তো পরিচালনা করছে কাউন্ট দ্য কাঁক্লো, ভাইকাউন্ট মিরো, মাহ্খি কাস্তি আর ডিউক বিরনের মত অভিজাত লোক।'

'ডিউক দ্য শার্তাও তো আছে ওদের সঙ্গে। রাজা হতে পারবে না জেনে বেঈমানটা যোগ দিয়েছে প্রজাতন্ত্রীদের সঙ্গে।'

'হতে তো পারেনি বদস্বভাবের কারণে,' বললেন ক্যাপ্টেন। 'অন্যায়-অপরাধ করে নিজেই নিজের মান-মর্যাদা খুইয়েছে। হারিয়েছে সিংহাসনের উত্তরাধিকার। বেঈমান বললে না? একদম ঠিক। প্রজাতন্ত্রীদের সঙ্গেও বেঈমানী করতে যাচ্ছিল... রাজার কাছে এসেছিল সমঝোতার আশায়। জবাবে ওর মুখে থুতু দিয়েছিলেন রাজা... সবার সামনে! আমি তখন ভার্সাইয়ে ছিলাম, স্বচক্ষে দেখেছি ঘটনাটা।'

'একদম উচিত হয়েছে।'

কিছুক্ষণ নীরবতা বিরাজ করল। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফিউভিল বলল, 'কতদিন হলো আমার প্রিয় প্যারিস শহরকে দেখিনি!'

'দেখবে,' আত্মবিশ্বাসের সুরে বললেন ক্যাপ্টেন। 'সবকিছু ঠিকঠাক এগোলে এক মাসের ভিতরেই প্যারিসে পা রাখতে পারব আমরা। লর্ড হুডকে মি. উইণ্ডহ্যাম এমনটাই নিশ্চয়তা দিয়েছেন।'

'পারব?' সন্দেহ প্রকাশ করল ফিউভিল। 'যুদ্ধ পরিচালনার

জন্য তো একজন রাজপুত্রের কোনও বিকল্প নেই। রাজরক্তের জাদুই আলাদা। সাধারণ লোককে মুহূর্তেই সম্মোহিত করতে পারে। কিন্তু আমাদের সঙ্গে তো কোনও রাজপুত্র নেই।'

'জানি,' হতাশ গলায় বললেন বোয়াবার্থেলিউ। 'স্টেটরুমের ওই অভিজাত ভদ্রলোকটিই আমাদের একমাত্র আশা।'

'নামকরা মানুষ, কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু...'

'কিন্তু কী?'

'এমন কঠিন দায়িত্ব সামলানোর মত শক্তি তাঁর আছে কি না, সেটাই প্রশ্ন।'

'বলতে চাইছ, উনি যথেষ্ট নিষ্ঠুর হতে পারবেন কি না, তা নিয়ে সন্দেহ আছে তোমার?'

'সেটা কি অস্বাভাবিক? এই মুহূর্তে নিষ্ঠুর একজন নেতা দরকার আমাদের, যিনি মানবতা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। শত্রুকে দমন করবেন শক্ত হাতে। নরম হলে কী সমস্যা, তা তো জানেন। অঁযু আর পয়তু অঞ্চলের কথাই ধরুন, ওখানে উদারতা দেখাতে গিয়ে কী মারটাই না খেয়েছে আমাদের লোকেরা! অথচ ম্যারাই আর রেৎজ অঞ্চলে আমাদের সেনানায়করা অনেক বেশি নিষ্ঠুর... ফলে যথেষ্ট এগিয়ে গেছে ওরা। শ্যাহেত ভয়ঙ্কর আর বর্বর প্রকৃতির লোক বলেই পাহা-র মত আরেক বর্বরের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছে। আমার তো মনে হয়...'

কথাটা শেষ করতে পারল না ফিউভিল। হঠাৎ ভয়ানক এক আওয়াজে কেঁপে উঠল গোটা জাহাজ। নীচের ডেক থেকে ভেসে এল উত্তেজিত চিৎকার আর হাঁকডাক। সেদিকে ছুট লাগালেন বোয়াবার্থেলিউ আর ফিউভিল।

তিন

সিঁড়ির কাছে যেতেই খোলের ভিতর থেকে নাবিকদের হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসতে দেখলেন বোয়াবার্থেলিউ আর ফিউভিল। পাশ দিয়ে ছুটে যাবার সময় এক নাবিকের হাত খপ করে ধরে ফেললেন ক্যাপ্টেন। কড়া গলায় জানতে চাইলেন, 'অ্যাই! কী হয়েছে?'

'ক্যাপ্টেন,' হাঁপাতে হাঁপাতে জানাল নাবিক, 'ভয়ঙ্কর একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে নীচে...'

ধীরে ধীরে জানা গেল সব।

গান ডেকে ঘটেছে দুর্ঘটনা। লোহার চাকা লাগানো ত্রিশটা কামান রয়েছে ওখানে। স্ক্রু আর শেকলের মাধ্যমে আটকে রাখা হয় কামানগুলো, যাতে জাহাজের দুলুনিতে এদিক-ওদিক ছিটকে যেতে না পারে। কিন্তু শেষবার গোলা ভরার পরে একটা কামানের স্ক্রু আটকাতে ভুলে গেছে কামানরক্ষক। সাগর যতক্ষণ শান্ত ছিল, ভুলটা ধরা পড়েনি; কিন্তু জাহাজের দুলুনি শুরু হতেই ডেকের ভিতরে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে ছোটাছুটি শুরু করেছে ওটা। ইতোমধ্যে জনাপাঁচেক নাবিক মারা গেছে ভারী কামানটার তলায় চাপা পড়ে। সর্বনাশ শুধু ওটুকুই নয়। তীব্র বেগে আঘাত হেনে খোলের কয়েক জায়গায় ফুটোও করে দিয়েছে কামানটা!

সিঁড়ির মাথায় গিয়ে নীচে উঁকি দিলেন বোয়াবার্থেলিউ আর ফিউভিল। নিহত নাবিকদের রক্তাক্ত লাশগুলো পড়ে আছে ডেকের মেঝেতে। খোলের ফুটোগুলোও দেখা গেল—সব মিলিয়ে পাঁচটা। এখনও ওয়াটার লেভেলের উপরে আছে বলে পানি ঢুকছে না, কিন্তু ঝড়-তুফান দেখা দিলে মস্ত বিপদ হবে। কলকল করে ঢুকবে সাগরের পানি, ডুবে যাবে জাহাজ।

কী করবেন ভেবে পেলেন না ক্যাপ্টেন। নীচে কাউকে পাঠানো মানেই তাকে অবধারিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া। পিছনে পায়ের শব্দ পেয়ে ঘাড় ফেরালেন। গোলমালের আওয়াজ পেয়ে স্টেটরুম থেকে বেরিয়ে এসেছেন বৃদ্ধ আগন্তুক, পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁদের।

কামানরক্ষক কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। তার দিকে তাকিয়ে খেঁকিয়ে উঠল ফিউভিল, 'হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছ কী? কিছু একটা করো! তোমার দোষেই মরতে বসেছি আমরা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে গেল লোকটা। সাহসী না বলে উপায় নেই তাকে। পাগলের মত এদিক-সেদিক ছুটে যাচ্ছে কামান, কিন্তু ভয় না পেয়ে স্থির ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল সে। কাছে এলেই ওটাকে আটকে ফেলবে শেকলে। যদিও জানে না, এমন খেপা একটা দৈত্যকে একাকী আটকানো আদৌ সম্ভব কি না।

অসহায় বোধ করছেন বোয়াবার্থেলিউ। সেকেণ্ড অফিসারের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ঈশ্বরে বিশ্বাস করো?'

'হ্যাঁ... না... কখনও কখনও।'

'ঝড়ের সময়?'

'হ্যাঁ... এবং এই ধরনের বিপদের সময়।'

'তা হলে প্রার্থনা করো। একমাত্র ঈশ্বরের দয়া ছাড়া

এ-মুহূর্তে রেহাই নেই আমাদের।'

তাঁদের চারপাশে ভিড় করছে নাবিকেরা, কারও মুখে কোনও কথা ফুটছে না। সেটাই স্বাভাবিক। বিশাল বিশাল ঢেউ এসে অনবরত আছড়ে পড়ছে জাহাজের গায়ে, দুলিয়ে দিচ্ছে পুরো কাঠামো। আর সেই দুলুনিতে বিরাট কামানটা বিলিয়ার্ড বলের মত গড়াচ্ছে পুরো ডেক জুড়ে।

ঘামতে শুরু করল কামানরক্ষক, জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট চাটল। বুঝতে পারছে, তার একার পক্ষে সম্ভব হবে না ওটাকে আটকানো। আচমকা কামানটা ছুটে এল তার দিকে। ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল সে, আর তখুনি ক্যাপ্টেন আর সেকেণ্ড অফিসারকে সরিয়ে বিদ্যুৎবেগে নীচে নামলেন বৃদ্ধ আগন্তুক।

'ধরো!' চেঁচালেন তিনি।

কাছাকাছি আসতেই দু'জনে মিলে আঁকড়ে ধরলেন কামানটাকে। জাহাজ আরেকদিকে দুলে ওঠার আগেই ঝটপট ওটার গায়ে শেকল পরিয়ে দিল কামানরক্ষক, তারপর বৃদ্ধের সহায়তায় ঠেলেঠুলে ওটাকে নিয়ে গেল ওটার জায়গায়। লাগিয়ে দিল স্ক্রু।

'ধন্যবাদ, মসিয়ো,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কামানরক্ষক। 'আপনি আমার জীবন বাঁচিয়েছেন।'

কথা বললেন না বৃদ্ধ। চোখ বোলালেন চারপাশে। বিপদ এখনও কাটেনি। কামানের আঘাতে কয়েক জায়গায় ফেটে গেছে জাহাজের খোল, ঢেউয়ের ঝাপটায় এরই মধ্যে পানি ঢুকতে শুরু করছে ওখান দিয়ে। এখুনি মেরামত করা না হলে ডুবে যাবে ক্লেমোর।

সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে এলেন তিনি, ক্যাপ্টেনকে জানালেন কথাটা। তাড়াতাড়ি যন্ত্রপাতি-সহ মেরামতকর্মীদের নীচে

পাঠালেন বোয়াবার্থেলিউ।

সাগর ততক্ষণে আরও অশান্ত ও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। আরও ঘন হয়েছে কুয়াশা। বাতাসের ধাক্কায় কোর্স থেকে অনেকদূর সরে এসেছে ক্লেমোর, পৌঁছে গেছে গভীর সমুদ্রে। ঢেউয়ের আকার এখানে অনেক বড়, ক্রমাগত চুমো খেয়ে চলেছে কর্ভেটের আহত খোলকে। বাতাসের মতিগতি দেখে বোঝা গেল, খুব শীঘ্রি ঝড়-তুফান শুরু হতে চলেছে।

খোলের ফুটো বন্ধ করবার জন্য মেরামতকর্মীরা দ্রুত হাতে কাজ করে চলল। অন্যান্য নাবিকেরা হাত লাগাল গান ডেকের সবগুলো কামান ঠিকমত সাজিয়ে রাখায়। বৃদ্ধ ভদ্রলোক তখন আপার ডেকে, জাহাজের প্রধান মাস্তুলের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ভাবলেশহীন ভঙ্গিতে।

কামানরক্ষককে তাঁর সামনে নিয়ে গেলেন বোয়াবার্থেলিউ আর ফিউভিল। ক্যাপ্টেন বললেন, 'জেনারেল, নিয়ে এলাম ওকে।'

কোনও কথা বললেন না বৃদ্ধ, দাঁড়িয়ে রইলেন আগের মত।

ক্যাপ্টেন বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, জেনারেল। আজ ও যে-সাহসের কাজটা করল... যে-ঝুঁকি নিয়ে আমাদের সবাইকে বাঁচাল... তার জন্য ওকে কি পুরস্কৃত করা উচিত নয়?'

মাথা ঘোরালেন বৃদ্ধ। 'করা তো উচিত।'

'তা হলে আদেশ দিন...'

'আপনি দিন। এ-জাহাজের আপনিই ক্যাপ্টেন।'

'কিন্তু আপনিই এখানকার সবচেয়ে পদস্থ ব্যক্তি... আপনি একজন জেনারেল। আদেশটা আপনার তরফ থেকে এলেই বেশি ভাল হয়।'

'বেশ।' কামানরক্ষকের দিকে ফিরলেন বৃদ্ধ। 'কাছে এসো।'

কয়েক পা এগিয়ে এল লোকটা। ক্যাপ্টেনের পোশাকের বুক থেকে সেইণ্ট লুইয়ের ক্রুশটা খুলে তাকে পরিয়ে দিলেন বৃদ্ধ। সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসধ্বনি করল আশপাশে দাঁড়ানো নাবিকেরা।

ক্যাপ্টেনের দিকে তাকালেন বৃদ্ধ। শান্ত গলায় বললেন, 'এবার একে গুলি করে মারুন।'

থেমে গেল নাবিকদের কলকাকলি। কেউ বিশ্বাস করতে পারছে না কথাটা। তাদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে জেনারেল উঁচু গলায় বললেন, 'এই লোকের অবহেলার কারণে মস্ত বিপদে পড়েছিলাম আমরা, এখনও সেই বিপদ কাটেনি। ভুললে চলবে না, সমুদ্রই জাহাজের সবচেয়ে বড় শত্রু। সমুদ্রে জাহাজ ভাসানো মানে সেই শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া। এখানে হামলা চালাবার জন্য ওঁৎ পেতে থাকে ঝড়-তুফান আর হরেক রকমের বিপদ... সুযোগ পেলেই সর্বনাশ করে জাহাজের। এমন পরিস্থিতিতে কেউ যদি দায়িত্বে অবহেলা করে, যদি ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয় জাহাজকে... তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। এ-ধরনের ভুল অমার্জনীয়। কাজেই সাহসিকতার জন্য যেভাবে ওকে পুরস্কৃত করা হয়েছে, ঠিক সেভাবে ওকে ওর ভুলের জন্য শাস্তি পেতে হবে।'

গমগম করছে জেনারেলের কণ্ঠ, যেন তীক্ষ্ণ বর্শার মত বিদ্ধ হচ্ছে শ্রোতাদের হৃদয়ে। কেউ তার প্রতিবাদ করবার সাহস পেল না। এমনকী কামানরক্ষকও তার মাথা নিচু করে ফেলল। ক্যাপ্টেনের দিকে ফিরলেন বৃদ্ধ। বললেন, 'আমার আদেশ আপনি পেয়েছেন, ক্যাপ্টেন। নিয়ে যান ওকে।'

তা-ই করা হলো। যাজক ডেকে পাপ-স্বীকার করানো হলো অভিযুক্তকে। তারপর তাকে নিয়ে যাওয়া হলো রেলিঙের ধারে। কয়েক মুহূর্ত পরেই বাতাসের গর্জন ছাপিয়ে গর্জে উঠল

রাইফেল। রেলিং টপকে ঝপাৎ করে পানিতে পড়ল কামানরক্ষকের গুলিবিদ্ধ প্রাণহীন দেহ।

কোনও ভাবান্তর দেখা গেল না বৃদ্ধ জেনারেলের মাঝে। মাস্তুলে হেলান দিয়ে যেভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেভাবেই দাঁড়িয়ে রইলেন। অজেয় সমরনায়কের মত দেখাচ্ছে তাঁকে।

বোয়াবার্থেলিউ ফিসফিস করে ফিউভিলকে বললেন, 'মনে হচ্ছে এতদিনে একজন নেতার মত নেতা পেয়েছি আমরা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে একমত হলো সেকেণ্ড অফিসার।

সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে খারাপ হচ্ছে আবহাওয়া।

সন্ধ্যা থেকে সারা আকাশজুড়ে যে-মেঘগুলো জমতে শুরু করেছিল, সেগুলো ধীরে ধীরে নেমে এল সাগরের দিকে। সৃষ্টি করল ঘন কুয়াশার। দৃষ্টিসীমা সংকুচিত হয়ে এল। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মাতাল হয়ে উঠল সাগর। বাতাসের প্রতিটি ধাওয়া হিংস্র দানব করে তুলল ঢেউগুলোকে। আকাশ ছোঁয়া সচল পাঁচিল যেন, একের পর এক ছুটে আসছে, চূড়ার মাথায় সাপের ফণা আকৃতির সাদা ফেনা বিস্ফোরিত হচ্ছে, জলপ্রপাতের মত নেমে আসছে জাহাজের ওপর। রাত যত বাড়ল ততই প্রবল হয়ে উঠল প্রকৃতির আক্রোশ, পাহাড়ের মত উঁচু প্রতিটি ঢেউ অবিরত আঘাত হেনে দুর্বল ও কাবু করে ফেলছে ক্লেমোরকে। সাধ্যমত সবকিছু করলেন ক্যাপ্টেন—বাড়তি যত রকম বোঝা আছে, সব ফেলে দিয়ে জাহাজকে হালকা করবার চেষ্টা চালালেন, কিন্তু তাতে বিশেষ লাভ হলো না।

ভোরের দিকে ঝড়ের প্রকোপ কিছুটা কমল, তাই বলে ঢেউয়ের তাণ্ডব কমল না বিন্দুমাত্র। মনে হলো বিনা উস্কানিতে এখন ওগুলো আঘাত করে চলেছে দুর্বল, অসহায় জাহাজটাকে।

ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় এমন সাগর পাড়ি দেয়া খুবই কঠিন। সারেং গাইকোয়ালের চেহারায় শঙ্কার ছাপ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। জীবনে বহুবার বিপজ্জনক সাগর পাড়ি দিয়েছে সে, তাই বলে এবারকার মত চেহারা কখনও দেখেনি সাগরের।

ব্রিজে উঠে সারেং-কে সাহস জোগাবার চেষ্টা করল ফিউভিল, 'দেখেছ গাইকোয়াল, ঝড়টা সরে গেছে। এবার আমরা নিরাপদে এগোতে পারব।'

'ঝড় সরে গেলে কী হবে,' বলল গাইকোয়াল। 'কীভাবে বাতাস বইছে দেখছেন?'

'বাতাস বইলে তো ভাল। পালে যত বাতাস লাগবে, ততই দ্রুত এগোতে পারব আমরা।'

'বাতাস শুধু জাহাজের গতিই বাড়ায় না, সার। সাগরে ঢেউও সৃষ্টি করে। এ-মুহূর্তে ঢেউ আমাদের যম।'

'আমরা এখন কোথায়?' জানতে চাইল ফিউভিল।

'আমরা এখন ঈশ্বরের হাতে,' তিক্ত গলায় বলল গাইকোয়াল।

বোঝা গেল, সারেঙের সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। তাই ওখান থেকে সরে এল ফিউভিল। রেলিঙের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। আর তখুনি পেয়ে গেল তার প্রশ্নের জবাব।

বাতাসের ধাক্কায় আচমকা তরঙ্গমালার উপরে জমাট বেঁধে থাকা কুয়াশার পর্দা পাতলা হয়ে এল, ফুটে উঠল দিগন্তরেখা। পুব দিক ফর্সা হতে শুরু করেছে—দুধের মত সাদা একরাশ আলো ফুটে সূচনা করছে প্রভাতের। পশ্চিমাকাশেও রয়েছে ডুবতে থাকা চাঁদের আবছা আভা। দুই আভায় দু'দিকের দিগন্ত ফুটে উঠেছে, সেই সঙ্গে দেখা দিয়েছে নতুন বিপদ।

জাহাজের পশ্চিম দিকে, চাঁদের আবছা আভায় পানি ফুঁড়ে

উঁচু হয়ে আছে তিনটা ডুবোপাহাড়ের ভীমদর্শন চূড়া—ওদিকে যাবার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। আর পুবে, ভোরের আকাশে পটভূমিতে একসারিতে দাঁড়িয়ে আছে আটটা যুদ্ধজাহাজ... শত্রুপক্ষের, তা বলাই বাহুল্য।

ফিউভিলের ডাক শুনে ছুটে এলেন ক্যাপ্টেন বোয়াবার্থেলিউ। প্রমাদ গুনলেন। একদিকে জাহাজডুবির ভয়, অন্যদিকে যুদ্ধ। পাহাড় ঘেঁষে এগোবার ঝুঁকি নিতে পারবেন না তিনি। কোনও কারণে যদি একবার ধাক্কা খায়, সেই ধাক্কা সামলাবার মত ক্ষমতা ক্লেমোরের নেই। শত্রুপক্ষের মুখোমুখি হবার মত ক্ষমতা যে আছে, তা-ও নয়। ত্রিশটা কামানের মধ্যে একুশটাই অকেজো হয়ে গেছে সেই পাগলা কামানের আঘাতে। সচল আছে মাত্র ন'টা। তার ওপর কামান দাগায় পারদর্শী সেরা পাঁচজন নাবিক মারা গেছে। উভয়সঙ্কটে পড়ে গেলেন তিনি।

সকালের আলো তখনও পুরোপুরি ফোটেনি। আকাশ ছেয়ে আছে ঘন মেঘে। ছায়া ছায়া ভাবটা রয়ে গেছে। এ-ছায়া সরতে বেশ কিছুটা সময় লাগবে। বাতাস উড়িয়ে নিয়ে গেছে কুয়াশা, কিন্তু একই সঙ্গে ক্লেমোরকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে পাহাড়গুলোর দিকে। রাতভর খেপা সমুদ্রকে মোকাবেলা করে যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে জাহাজের—হালের একটা অংশ ভেঙে গেছে, ছিঁড়ে গেছে দড়ি-দড়া, ঢিলে হয়ে গেছে মাস্তুল। হেলমের নির্দেশ মানতে চাইছে না ওটা, বাতাসের ধাক্কায় ভেসে চলেছে সর্বনাশের উদ্দেশে।

কী করবেন ভেবে পেলেন না ক্যাপ্টেন। বোঝাই যাচ্ছে পথ ভুল করেছেন তাঁরা। ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করতে করতে সাঁমালু-র দিকে না গিয়ে চলে এসেছেন গ্র্যানভিলের দিকে। যে ফরাসি নৌ-বহরকে এড়াতে চেয়েছিলেন, পড়ে গেছেন তাদেরই

সামনে। এখন না করা যাবে যুদ্ধ, না যাবে পিঠটান দেয়া। জার্সিতে ফিরতে চাইলে পশ্চিমে যেতে হবে, সেখানে পাহাড়গুলো বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

যা হয় হোক ভেবে ফিউভিলকে গান ডেকে পাঠিয়ে দিলেন তিনি। নির্দেশ দিলেন সচল কামানগুলো যুদ্ধের জন্য তৈরি করতে। নিজে একটা দূরবীন নিয়ে উঠে এলেন ব্রিজে। সারেং তখন বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জাহাজকে বিপদের আওতা থেকে বের করে নিয়ে যাবার জন্য যুঝছে।

'পাহাড়গুলো চিনতে পারছ, গাইকোয়াল?' জিজ্ঞেস করলেন বোয়াবার্থেলিউ।

'জী, ক্যাপ্টেন,' বলল সারেং। '*মাঙ্কিয়ির* দ্বীপপুঞ্জের সীমানার ডুবোপাহাড়। আমরা দ্বীপগুলোর পাশে চলে এসেছি।'

'কোন্ পাশে?'

'খারাপ পাশটায়।'

'তলায় কী আছে?'

'ছোট-বড় আরও পাহাড়ের চূড়া। এদিকে ডুবোপাহাড়ের অভাব নেই।'

'পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পারি না?'

'চেষ্টা করাটা আত্মহত্যার শামিল, ক্যাপ্টেন। ছোট নৌকা ছাড়া আর কিছুই ও-পথে যেতে পারবে না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখে দূরবীন তুললেন বোয়াবার্থেলিউ। সারেঙের মতামতের প্রয়োজন ছিল না, মাঙ্কিয়ির দ্বীপপুঞ্জ সম্পর্কে জানা আছে তাঁর। কোনও জাহাজ ভিড়তে পারে না দ্বীপগুলোর গায়ে, ফলে খুব বেশি মানুষও থাকে না ওখানে। মূলত নানা ধরনের সামুদ্রিক পাখির বাসস্থান এই মাঙ্কিয়ির। দ্বীপের দিক থেকে এবার প্রতিপক্ষের দিকে দূরবীন ঘোরালেন

তিনি।

এক সারিতে পাশাপাশি ভাসছে আটটা জাহাজ। দিগন্তের কাছে মাথা তুলে যেন উদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে ওগুলো। মাঝখানের জাহাজটা সবচেয়ে বড়, পানির উপরে তিনটা ডেক আছে ওটার।

'জাহাজগুলো চেনো, গাইকোয়াল?'

'নিশ্চয়ই, ক্যাপ্টেন।'

'ফরাসি নৌ-বহর?'

'শয়তানের নৌ-বহর, সার।'

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। তারপর ক্যাপ্টেন আপনমনে বলে উঠলেন, 'ওদের সবগুলো জাহাজই কি হাজির হয়েছে নাকি?'

'সবগুলো নয়, সার।'

দোসরা এপ্রিলে প্রজাতন্ত্রীদের পক্ষ থেকে ঘোষণা দেয়া হয়েছিল, ইংলিশ চ্যানেল পাহারা দেবার জন্য তারা দশটা ফ্রিগেট এবং ছ'টা অন্যান্য শ্রেণীর যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন করেছে। কথাটা মনে পড়ে গেল ক্যাপ্টেনের।

মাথা ঝাঁকিয়ে তিনি বললেন, 'ঠিকই বলেছ। ষোলটা জাহাজ আছে ওদের বহরে। এখানে তার অর্ধেক দেখতে পাচ্ছি।'

'বাকিগুলো নিশ্চয়ই উপকূলের অন্যান্য এলাকায় টহল দিচ্ছে।'

দূরবীনের সাহায্যে সবগুলো জাহাজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন ক্যাপ্টেন। 'একটা থ্রি-ডেকার, দুটো প্রথম শ্রেণীর ফ্রিগেট, আর পাঁচটা দ্বিতীয় শ্রেণীর।'

'হ্যাঁ,' সায় দিল গাইকোয়াল।

'সবগুলোই ভাল জাহাজ,' মন্তব্য করলেন বোয়াবার্থেলিউ। 'ওর মধ্যে কয়েকটার ক্যাপ্টেনও ছিলাম আমি।'

'আমিও কাজ করেছি কয়েকটাতে,' বলল গাইকোয়াল। 'সম্ভবত জাহাজগুলোর পরিচয়ও বলতে পারব। ফরাসি বহরের সমস্ত জাহাজ আমি চিনি।'

দূরবীনটা তার হাতে ধরিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন। 'থ্রি-ডেকারটা চিনতে পারছ?'

দেখল গাইকোয়াল। বলল, 'ওটা *সিউ তুদোখ*, ক্যাপ্টেন।'

'ওটা নতুন নাম,' বললেন বোয়াবার্থেলিউ। 'আগে জাহাজটার নাম ছিল *ইতা দু বুহ্গোনিয়ো।* চমৎকার জাহাজ! একশো আটাশটা কামান আছে ওটায়।' নোটবই বের করে সংখ্যাটা টুকে নিলেন তিনি। 'বাম দিকের প্রথম জাহাজটার নাম বলতে পারবে, গাইকোয়াল?'

'*ইক্সপেরিমন্তি*, ক্যাপ্টেন।'

'ওটাও মন্দ নয়। বাহান্নটা কামান আছে। ব্রেস্টের বন্দরে ছ'মাস আগে রিফিট করা হয়েছে জাহাজটা।' কামানের সংখ্যা টুকে নিলেন তিনি। 'ওর পাশেরটার নাম বলো।'

'*দ্রিয়াদ।*'

'প্রথম শ্রেণীর ফ্রিগেট... চল্লিশটা কামান। এককালে ভারতে ছিল। নেভাল রেকর্ড চমৎকার। এবার ডানদিকের জাহাজগুলোর নাম বলো।'

'ওগুলো সব দ্বিতীয় শ্রেণীর যুদ্ধজাহাজ, ক্যাপ্টেন। প্রথমটার নাম *রিজোলিউ।*'

'তার পরেরটা?'

'*খিশমোঁ।*'

'একই ডিজাইনের জাহাজ। এরপর?'

'*আতি* আর *ক্যালিপসো।*'

'শেষেরটা?'

'পোনুউজ।'

'প্রত্যেকটায় রয়েছে বত্রিশটা করে কামান।'

নোটবুকে দ্রুত হিস্েব করে নিলেন ক্যাপ্টেন। ফিউভ়িল ব্রিজে ফিরে এলে বললেন, 'দুঃসংবাদ। তিনশো আশিটা কামানের বিরুদ্ধে লড়তে হবে আমাদের, ফিউভ়িল। গান ডেক থেকেই তো এলে। ক'টা কামান ব্যবহারযোগ্য রয়েছে আমাদের?'

'মাত্র ন'টা, ক্যাপ্টেন,' তিক্ত গলায় বলল ফিউভিল।

'কী আর করা!' শ্রাগ করলেন বোয়াবার্থেলিউ। গাইকোয়ালের কাছ থেকে দূরবীন নিয়ে চোখে লাগালেন। বেঁচে যাবার ক্ষীণ যেটুকু সম্ভাবনা ছিল, তা মিলিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। দিগন্তে বড় হতে শুরু করছে ফরাসি জাহাজগুলোর অবয়ব। এগিয়ে আসছে ওগুলো ক্লেমোরকে লক্ষ্য করে।

'ওরা আসছে, ফিউভিল,' শান্ত গলায় জানালেন তিনি।

'আসবেই তো,' বলল ফিউভ়িল। 'ইংরেজদের পছন্দ করে না প্রজাতন্ত্রীরা।'

'জাহাজের অবস্থা কী?'

'একেবারে মন্দ বলব না। নোঙর আর নোঙরের শেকল যথেষ্ট মজবুত। একশো বিশ ফ্যাদম গভীরতা পর্যন্ত নোঙর করতে পারব আমরা। অ্যামিউনিশনও যথেষ্ট পরিমাণে আছে। প্রতিটা কামানের জন্য একশো বাহাত্তর রাউণ্ড।'

'কিন্তু কামান তো মাত্র ন'টা।' দূরবীন আবার চোখে লাগালেন বোয়াবার্থেলিউ। খুব দ্রুত এগোচ্ছে ফরাসি জাহাজগুলো।

ঠাণ্ডা মাথায় পরিস্থিতি বিচার করে নিলেন তিনি। তাঁর কামানগুলো ছোট; তাতে একটা সুবিধা হলো, প্রতি কামানে মাত্র

তিনজন লোক লাগালেই চলে। অসুবিধা বলতে, রেঞ্জ বড্ড কম ওগুলোর। শত্রুজাহাজ একেবারে কাছে না এলে লক্ষ্যভেদ করা কঠিন।

প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারি করলেন ক্যাপ্টেন। জাহাজজুড়ে নেমে এল থমথমে নীরবতা। সরাসরি যুদ্ধঘোষণা না করা হলেও কী ঘটতে চলেছে, সে-ব্যাপারে সন্দেহ নেই কারও। লড়াইয়ে নামবার জন্য ঘুরিয়ে নেয়া হয়েছে জাহাজের মুখ। নাবিকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে পিস্তল, গুলি আর ছোরা। শত্রুরা জাহাজে ওঠার চেষ্টা করলে তাদেরকে প্রতিহত করবার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে সবাইকে। সচল ন'টা কামানের মুখ ঘোরানো হয়েছে সামনের দিকে।

আক্রমণের ছকে এগিয়ে এল ফরাসি নৌ-বহর। সারি ভেঙে অর্ধ-বৃত্তাকার ফরমেশনে চলে গেল—ক্লেমোরকে ঘিরে ফেলবার ইচ্ছে। পিছনদিকে ডুবোপাহাড়, ফলে পিঠটান দেবার কোনও উপায় রইল না জাহাজটার। অগত্যা লড়াইয়ের জন্য সবাইকে মানসিকভাবে তৈরি হবার নির্দেশ দিলেন বোয়াবার্থেলিউ।

চূড়ান্ত আদেশের অপেক্ষায় রইল নাবিকরা।

'প্রথম কামানটা আমরা দাগলেই বোধহয় ভাল হয়,' বললেন ক্যাপ্টেন। 'কী বলো, ফিউভিল?'

'আমার কোনও আপত্তি নেই,' সায় জানাল সেকেণ্ড অফিসার। 'কখন দাগবেন? এখুনি?'

'উঁহুঁ। লড়াই শুরুর আগে একটা কাজ করে নিতে চাই।'

এখনও মাস্তুলের গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন বৃদ্ধ জেনারেল। একবারের জন্যও স্টেটরুমে ফিরে যাননি তিনি। শান্ত চোখে দেখছেন যুদ্ধের প্রস্তুতি।

তাঁর কাছে গিয়ে ক্যাপ্টেন বললেন, 'মাফ করবেন,

জেনারেল। আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?'

ঘুরে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ। 'কী ব্যাপার?'

'অবস্থা তো দেখছেন। ফাঁদে পড়ে গেছি আমরা। একদিকে পাহাড়, অন্যদিকে শত্রু। যেদিকেই যাই, সেদিকেই মৃত্যু। বাঁচার কোনও পথ নেই। তাই বলে হাল ছাড়ছি না, মরবার আগে ফরাসি শয়তানগুলোকে একটা শিক্ষা দিয়ে যাব। মরব বীরের মত।'

'আমারও তেমনটাই ইচ্ছে।'

'দুঃখিত, সার। আপনাকে মরতে দিতে পারব না আমি। আমরা মরলে ক্ষতি নেই, কিন্তু আপনার কিছু হয়ে গেলে অপূরণীয় ক্ষতি হবে ফ্রান্সের। আপনাকে বাছাই করা হয়েছে ভঁদির যুদ্ধ পরিচালনা করবার জন্য, তাতে জয় ছিনিয়ে আনার জন্য। আপনার মৃত্যু মানেই রাজার ক্ষতি... রাজতন্ত্রের ক্ষতি। তাই বেঁচে থাকতে হবে আপনাকে।'

'কীভাবে বাঁচব?'

'আমি একটা নৌকা আর সাহসী একজন নাবিক দেব আপনাকে। যুদ্ধ করে ফরাসি জাহাজগুলোকে ব্যস্ত রাখবে ক্লেমোর, সেই সুযোগে নৌকায় চেপে সহজেই চলে যেতে পারবেন আপনি। পিছনের পাহাড়গুলোকে পাশ কাটিয়ে উপকূলে চলে যাবেন। এখনও সূর্যের আলো ঠিকমত ফোটেনি, কেউ দেখতে পাবে না আপনাকে।'

'আপনি আমাকে কাপুরুষের মত পালিয়ে যেতে বলছেন?' ভুরু কোঁচকালেন বৃদ্ধ।

'এর সঙ্গে পৌরুষের কোনও সম্পর্ক নেই, জেনারেল,' বললেন বোয়াবার্থেলিউ। 'স্রেফ একটা রণকৌশল বলতে পারেন একে। চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য মাঝে মাঝে পিছু হটা অন্যায় কিছু

নয়।'

যুক্তিটা অকাট্য। মাথা ঝাঁকিয়ে তাই মেনে নিলেন বৃদ্ধ। বললেন, 'বেশ, আপনার প্রস্তাবে আমি রাজি।'

হাসি ফুটল ক্যাপ্টেনের মুখে। নাবিকদের দিকে ফিরে উদাত্ত গলায় বললেন, 'বন্ধুগণ, আমি তোমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি!'

সবাই ঘুরে দাঁড়াল তাঁর দিকে।

বৃদ্ধকে দেখিয়ে ক্যাপ্টেন বললেন, 'এই ভদ্রলোকের পরিচয় জানা দরকার তোমাদের। ইনি আমাদের রাজার প্রতিনিধি, এবং একজন জেনারেল—ভঁদির যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্বভার নিয়েছেন। তাঁকে ফ্রান্স উপকূলে পৌঁছে দেবার জন্য রওনা হয়েছিলাম আমরা, কিন্তু তা আর হচ্ছে না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, ব্যর্থ হব আমরা। আমাদের জাহাজ গন্তব্যে না পৌঁছুলে কী হবে, সম্মানিত জেনারেল ঠিকই ফ্রান্সে পৌঁছাবেন... আমরাই নিশ্চিত করব সেটা। ছোট একটা নৌকায় তাঁকে নামিয়ে দেব আমরা... এমন ব্যবস্থা করব, যাতে শত্রুদের অগোচরে এখান থেকে চলে যেতে পারেন তিনি। কী বলো তোমরা?'

'হ্যাঁ! হ্যাঁ!!' সমস্বরে জানাল নাবিকেরা।

'খুব ভাল। এখন তোমাদের মাঝ থেকে নৌকা চালানোর জন্য একজন ভলান্টিয়ার চাই আমি, তার উপরেই দায়িত্ব চাপবে জেনারেলকে উপকূলে পৌঁছে দেবার। পিছনের ডুবোপাহাড়-গুলোর পাশ ঘুরে যেতে হবে তাকে, পাড়ি দিতে হবে উত্তাল সাগর। কাজেই দক্ষ মাঝি হতে হবে তাকে, এদিককার এলাকা যার হাতের তালুর মত চেনা।'

ভলান্টিয়ারের অভাব নেই, কিন্তু এদিককার এলাকা চেনে না সবাই। কাজেই মুখ চাওয়াচাওয়ি শুরু হলো। শেষ পর্যন্ত ভিড়ের

ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একজন। বলল, 'আমি যাব, ক্যাপ্টেন। আমি আশপাশের সবকিছু চিনি।'

'তা হলে দেরি নয়। চলে এসো।'

ক্যাপ্টেনের ব্যক্তিগত ব্যবহারের নৌকাটা তাড়াতাড়ি নামানো হলো পানিতে। জেনারেলকে নিয়ে তাতে চড়ে বসল নাবিকটি। রসদ হিসেবে এক ব্যাগ বিস্কুট, শুকনো মাংস, আর পানির একটা পিপে দেয়া হলো ওদেরকে। বাঁধন খুলে গেলে দ্রুত দাঁড় বাইতে শুরু করল নাবিক, নৌকা নিয়ে রওনা হয়ে গেল ডুবোপাহাড়গুলোর উদ্দেশে।

ত্রস্ত ভঙ্গিতে দূরবীনে ফরাসি জাহাজগুলোর প্রতিক্রিয়া দেখলেন ক্যাপ্টেন। না, কিছুই টের পায়নি ওরা। যেমন ছিল তেমনই আছে। স্বস্তি বোধ করলেন তিনি। অন্ধকারটা বড়ই উপকার করেছে তাঁদের। বাতাস আর ঢেউয়ের আনুকূল্যে নৌকাটা ছুটছেও খুব দ্রুত। কিছুতেই ওটাকে আর ধরতে পারবে না শত্রুরা।

জাহাজের নাবিকদের দিকে ঘুরলেন তিনি। আদেশ দিলেন, 'বন্ধুরা, মাস্তুলে রাজপতাকা ওড়াও! এ-ই হয়তো আমাদের শেষ সুযোগ।'

'রাজা দীর্ঘজীবী হোন!' সমস্বরে স্লোগান দিল নাবিকরা।

পতাকা উড়িয়েই কামান দাগল ক্লেমোর। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুত্তর দিল ফরাসি নৌ-বহর। গর্জে উঠল তাদের তিন শতাধিক কামান। মুহুর্মুহু বজ্রনিনাদে কেঁপে উঠল গোটা সাগর।

চার

তীরবেগে ছুটে চলেছে ছোট্ট নৌকা। দুই আরোহী নিশ্চুপ। পিছন থেকে ভেসে আসছে কামানের গগনবিদারী আওয়াজ। সেদিকে তাকাচ্ছে না কেউই। জেনারেল মাথা নিচু করে রেখেছেন অপরাধবোধে, আর নাবিকটি ব্যস্ত তাদের বাহনকে লড়াইয়ের আওতা থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য।

যত এগোল নৌকা, ততই অস্পষ্ট হয়ে এল যুদ্ধের আওয়াজ। ডুবোপাহাড়ের গা ঘেঁষে মোড় নেবার পর আর শোনাই গেল না কিছু। প্রাথমিক বিপদ কেটে গেছে, কিন্তু কঠিন কাজটা রয়ে গেছে বাকি। ছোট্ট এই নৌকা নিয়ে ভয়াল সাগর পাড়ি দিতে হবে।

উত্তাল ঢেউয়ের মাঝে নাচানাচি করতে করতে এগিয়ে চলল নৌকা। হঠাৎ নীরবতা ভেঙে নাবিকটি ডাকল, 'জেনারেল!'

যেমন ছিলেন তেমনই রইলেন বৃদ্ধ। শুধু বললেন, 'বলো।'

'আপনাকে আমার পরিচয় দেয়া হয়নি।'

'তার কোনও প্রয়োজন আছে?'

'আছে। কারণ আপনি যাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন, আমি তার ভাই!'

এবার মুখ তুললেন বৃদ্ধ। তীক্ষ্ণ চোখে জরিপ করলেন সামনে

বসা নাবিকটিকে। বয়স খুব বেশি নয়, টেনে-টুনে ত্রিশ হতে পারে। গায়ের চামড়া রোদে পোড়া, তামাটে। চোখদুটো অদ্ভুত—নাবিকসুলভ তীক্ষ্ণতার পাশাপাশি ওতে মিশে আছে কৃষকসুলভ সরলতা। এ-মুহূর্তে ক্রোধে ধক ধক করে জ্বলছে চোখদুটো। নাবিকের কোমরের দিকে এবার নজর চলে গেল তাঁর—বেল্টে দুটো পিস্তল, আর একটা ছোরা গুঁজে রেখেছে সে।

'কে তুমি?' শীতল গলায় জানতে চাইলেন জেনারেল।

'আমি আগেই তা বলেছি।'

'কী করতে চাও তুমি আমাকে নিয়ে?'

দাঁড়দুটো ছেড়ে দিল নাবিক, দু'হাত গিয়ে গেল কোমরে গোঁজা পিস্তলদুটোর উপরে। ক্রুদ্ধ গলায় বলল, 'আমি আপনাকে খুন করতে চাই, জেনারেল।'

কাঁধ ঝাঁকালেন বৃদ্ধ। 'যা তোমার মর্জি।'

'তা হলে তৈরি হোন।'

'কীসের জন্য?'

'মৃত্যুর জন্য।'

'কেন?'

প্রশ্নটায় কিছুটা যেন বিব্রত ও হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল নাবিক। কথা খুঁজে না পেয়ে আগের কথার পুনরাবৃত্তি করল, 'বলেছি তো, আপনাকে আমি খুন করব!'

'আমিও জানতে চাইছি, কেন খুন করবে আমাকে?'

বিদ্যুতের ঝিলিক খেলে গেল নাবিকের চোখে। 'কারণ আপনি আমার ভাইকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন!'

'তার আগে আমিই ওর জীবন বাঁচিয়েছিলাম,' শান্ত ও নির্বিকার ভঙ্গিতে বললেন বৃদ্ধ। 'তুমি কি সেটা ভুলে গেছ?'

'বাঁচিয়ে কী লাভ হলো? পরে তো ঠিকই ওকে খুন করলেন!'

‘আমি তোমার ভাইকে খুন করিনি।’

‘তা-ই?’ মুখ বাঁকা করল নাবিক। ‘তা হলে কে করেছে?’

‘তার নিজের ভুলই তাকে হত্যা করেছে।’

হাঁ হয়ে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল নাবিক, মুখের ভাষা হারিয়েছে। বৃদ্ধ প্রশ্ন করলেন, ‘তোমার নাম কী?’

‘নাম জেনে কী করবেন? আমার নাম অলমালো।’

এমন সময় সূর্য উঠল আকাশে। সকালের প্রথম রোদে প্রকট হয়ে উঠল নাবিকের মুখের হিংস্র ভাবটা। ডান হাতে একটা পিস্তল তাক করল সে।

‘তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করো?’ শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন বৃদ্ধ।

‘হ্যাঁ,’ বুকে ক্রুশ আঁকল অলমালো। ‘তিনি আমাদের পরম পিতা... স্বর্গে বাস করেন।’

‘মা আছে তোমার?’

‘আছে,’ দ্বিতীয় ক্রুশ আঁকল অলমালো। ‘আর কথা নয়। মরবার জন্য তৈরি হোন, সেনিয়োখ্*!’

ভুরু কোঁচকালেন বৃদ্ধ। ‘তুমি আমাকে সেনিয়োখ্ বললে কেন?’

‘আপনি যে একজন সেনিয়োখ্, তা দেখলেই বোঝা যায়।’

‘তোমার নিজের কোনও সেনিয়োখ্ আছে?’

‘থাকবেন না কেন? সেনিয়োখ্ ছাড়া কেউ থাকতে পারে?’

‘কোথায় তিনি?’

‘জানি না। আমার সেনিয়োখ্ দেশ ছেড়ে চলে গেছেন। তাঁর নাম মাহ্খি দু লঁতেনাক—ফঁতেনে-র ভাইকাউন্ট... ব্রিটানির

সেনিয়োখ্ (Seigneur)—প্রভু, বা এলাকা-প্রধান। ব্রিটেনে লর্ড বলে সম্বোধন করা হয় এঁদেরকে।

যুবরাজ। সাত অরণ্যের অধিপতি! আমি কোনোদিন তাঁকে দেখিনি, তবু তিনিই আমার সেনিয়ো... আমার প্রভু!'

'দেখা পেলে নিশ্চয়ই তাকে মান্য করবে?'

'করব না কেন? না করলে তো নাস্তিক হয়ে যাব! ঈশ্বরকে মানলে রাজাকে মানতে হয়, কারণ রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি। আর রাজাকে মানলে সেনিয়োখ্-কেও মানতে হয়, কারণ তিনি রাজার প্রতিনিধি! যা হোক, অনেক বাজে আলাপ হয়েছে। এবার মরবার জন্য তৈরি হোন। আপনি আমার ভাইকে মেরেছেন, আমি তার প্রতিশোধ নেব।'

'নাও। কিন্তু আমার যাজক কোথায়?'

'যাজক?' বিস্ময় ফুটল অলমালোর চেহারায়।

'মরবার সময় পাপস্বীকার করব না?' বললেন বৃদ্ধ। 'তোমার ভাইকে তো সে-সুযোগ দিয়েছিলাম, আমারও তা প্রাপ্য।'

'জাহাজে যাজক ছিল। এখানে আমি যাজক পাব কোথায়?'

'মরবার আগে পাপস্বীকার না করলে আমি যে আত্মা হারাব! তুমি কি তা-ই চাও?'

কী বলবে ভেবে পেল না অলমালো।

বৃদ্ধ এবার কঠিন গলায় বললেন, 'আমার আত্মার ক্ষতি হলে তুমিও আত্মা হারাবে, অলমালো। শোনো, তোমার প্রতি আমার সহানুভূতি আছে... তাই কয়েকটা কথা বলতে চাই। জাহাজে আমি যা করেছি, তা স্রেফ কর্তব্যের খাতিরে। কর্তব্যের খাতিরেই তোমার ভাইয়ের জীবন বাঁচিয়েছিলাম আমি, সে-কারণেই পরে আবার শাস্তি দিয়েছিলাম। এখন তোমার আত্মাকেও আমি সেই কর্তব্যের খাতিরেই বাঁচাবার চেষ্টা করছি। পিছনে কী ঘটছে, তা ভেবে দেখো। কত লোক যুদ্ধে মরছে! কত স্বামী তার স্ত্রীকে আর দেখতে পাবে না, কত পিতা তার

সন্তানকে আর দেখতে পাবে না... তোমার মত কত ভাই তার ভাইকে আর দেখতে পাবে না! কিন্তু কার দোষে? তোমার ভাইয়ের দোষে!

'তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করো... তা হলে ভেবে দেখো, কত কষ্ট পাচ্ছেন তিনি! যিশুর মত রাজাও তাঁর সন্তান, সেই সন্তানকে হত্যা করা হয়েছে, রাজার উত্তরাধিকারীকে আটকে রাখা হয়েছে বন্দিশালায়। ধর্মবাণীর অবহেলায়, প্রার্থনাগৃহের অবমাননায়, যাজকদের হত্যায় আহত হচ্ছেন তিনি। জাহাজ নিয়ে আমরা রওনা হয়েছিলাম ঈশ্বরের সন্তানদের রক্ষা করতে। অথচ তাতে ব্যর্থ হলাম তোমার ভাইয়ের কারণে। সে যদি ঠিকমত দায়িত্ব পালন করত, তা হলে গান ডেকে দুর্ঘটনা ঘটত না, বিকল হয়ে পড়ত না আমাদের কামান আর জাহাজ। পথ হারাতাম না আমরা, মুখোমুখি হতাম না শত্রুদের। এখন আমরা বীর সৈনিক এবং নাবিকের মত পতাকা উড়িয়ে অস্ত্রহাতে ফ্রান্সের উপকূলে পৌঁছাতাম। ভঁদির যুদ্ধে যোগ দিতে পারতাম দেশকে উদ্ধার করবার জন্য। এখনও আমি সে-চেষ্টাই করছি, আর তুমি কিনা বাধা দিচ্ছ তাতে? ধর্মের বিরুদ্ধে অধর্মের, রাজার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহীদের, আর ঈশ্বরের বিরুদ্ধে শয়তানের এই লড়াইয়ে তুমি শয়তানের পক্ষ নিচ্ছ? আমি মরে গেলে কে নেবে নেতৃত্ব? কে জেতাবে রাজতন্ত্রীদের? আমাদের জাহাজের সঙ্গীরা যেভাবে মারা যাচ্ছে, ঠিক সেভাবে মারা যাবে হাজার হাজার লোক। আর তার জন্য দায়ী থাকবে তুমি!

'হ্যাঁ, এ-কথা ঠিক, তোমার ভাইকে আমি মৃত্যুদণ্ড দিয়েছি। কিন্তু আমি তো নিজের কর্তব্য পালন করেছি মাত্র! তুমি কী করছ? যে-বিশ্বাস নিয়ে তোমার হাতে তুলে দেয়া হয়েছে আমাকে... যে-দায়িত্ব তোমাকে দেয়া হয়েছে, তা তো তুমি

পালন করছ না! মিথ্যে বলেছ ক্যাপ্টেনকে... আমাকে নিয়ে এসেছ খুন করবার উদ্দেশ্যে! রাজভক্তির বদলে তুমি দেখাচ্ছ রাজদ্রোহিতা! কাকে খুন করতে বসেছ তার কিছুই জানো না, অন্ধ হয়ে গেছ প্রতিহিংসায়! যা খুশি করো, আমি বাধা দেব না। তোমাকে ধন্যবাদ, শয়তানের জয় হবে; তোমাকে ধন্যবাদ, চার্চের পতন হবে; তোমাকে ধন্যবাদ, নাস্তিকরা চার্চের ঘণ্টা গলিয়ে এখন থেকে কামান তৈরি করবে, আর সেই কামানের গোলায় খুন হবে ঈশ্বরভক্তরা। করো তোমার পাপকাজ! কিন্তু জেনে রেখো, একদিন তোমারও বিচার হবে। ঈশ্বরের কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে তোমাকে আজকের অন্যায়ের জন্যে। সবকিছু শেষ করে দাও। আমি বৃদ্ধ, তুমি যুবক। আমি নিরস্ত্র, তুমি সশস্ত্র। খুন করো আমাকে!'

প্রমত্ত ঢেউয়ের গর্জন ছাপিয়ে গমগম করছে বৃদ্ধের কণ্ঠ। তাঁর কথাগুলো যেন অন্তরের অন্তস্তলে গিয়ে আঘাত হানছে। ফ্যাকাসে হয়ে গেল অলমালোর মুখ। ঝরতে লাগল ঘাম। কাঁপতে শুরু করল সে। বৃদ্ধের কথা শেষ হতেই হাত থেকে ফেলে দিল পিস্তল, নতজানু হয়ে বসে পড়ল তাঁর সামনে।

'দয়া করুন, প্রভু!' হাহাকার করে উঠল অলমালো। 'বড্ড ভুল করেছি আমি। ক্ষমা করুন! আ... আমার ভাই যে-ভুল করেছিল, তার প্রায়শ্চিত্ত করতে দিন আমাকে!'

'ওঠো,' শান্ত গলায় বললেন বৃদ্ধ। 'আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম।'

হু হু করে কেঁদে ফেলল অলমালো।

নৌকার সঙ্গে দেয়া খাবারগুলো খুব কাজে লাগল দুই পলাতকের।

সোজাসুজি ফরাসি উপকূলের দিকে এগোনো বিপজ্জনক, তা ছাড়া বিক্ষুব্ধ সাগরে একটানা একদিকে চলাও প্রায় অসম্ভব একটা কাজ—ঢেউয়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নৌকার মুখ ঘোরাতে হয়, এগোতে হয় এঁকেবেঁকে... তাই ঘুরপথে গন্তব্যে পৌঁছুতে পাক্কা ছত্রিশ ঘণ্টা লেগে গেল ওদের। একটা রাত কাটাতে হলো খোলা সমুদ্রে। খাবার না থাকলে এতটা সময় টিকতে পারত না ওরা।

নাবিক হিসেবে আশ্চর্য দক্ষতা এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিল অলমালো। শক্ত হাতে সামাল দিল সব ধরনের বাধা-বিপত্তি, শত্রুপক্ষের চোখ এড়িয়ে অনায়াসে এগিয়ে নিয়ে চলল নৌকাকে। প্রথমে উত্তরমুখী একটা কোর্স ধরে মাঙ্কিয়ির দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে দূরত্ব বাড়িয়ে নিল, তারপর দক্ষিণে ঘুরে গ্র্যানভিল আর শোজি দ্বীপের মাঝখান দিয়ে ঢুকে পড়ল সেইণ্ট মাইকেল উপসাগরে। দ্বিতীয় দিনে, সূর্যাস্তের ঘণ্টাখানেক আগে নির্জন এক সৈকতে পৌঁছুল নৌকা। জায়গাটা অলমালোর চেনা। চোরাবালির আধিক্যের কারণে লোকে সহজে পা রাখে না এই সৈকতে। ওদের জন্য অবশ্য ভয়ের কিছু নেই, কারণ তখন জোয়ার চলছে। সৈকতের বিপজ্জনক অংশটা চলে গেছে পানির তলায়।

নৌকাটা যদ্দূর পারল তীরের কাছে নিয়ে গেল অলমালো। তারপর নৌকা থেকে নেমে ওটাকে টেনে তুলল ডাঙায়। ওর পিছু পিছু বৃদ্ধও নামলেন। তীক্ষ্ণ চোখে দিগন্ত জরিপ করলেন তিনি।

'আমরা কুইনুম নদীর মোহনায় এসে পড়েছি, জেনারেল,' বলল অলমালো। 'ডানে বুভোয়া, বাঁয়ে উয়িন। সামনে এগোলে আখ্‌দুভোম-এর বেল টাওয়ার।'

বিস্কুটের প্যাকেট থেকে একটা বিস্কুট নিয়ে পকেটে ভরলেন বৃদ্ধ। ওকে বললেন, 'বাকিগুলো তুমি নাও।'

একটা বস্তায় বিস্কুট আর শুকনো মাংস ভরে ফেলল অলমালো, ওটা পিঠে ঝোলাল। জিজ্ঞেস করল, 'আমি কি আপনার সামনে থাকব, না পিছনে?'

'কোনোটাই না,' বললেন বৃদ্ধ। 'এখানে আমরা আলাদা হয়ে যাব।' পকেট থেকে সবুজ রঙের একটা ব্যাজ বের করলেন তিনি, মাঝখানটায় সোনালি সুতো দিয়ে ফ্লুখ্-দু-লিস... মানে, ফ্রান্সের রাজকীয় প্রতীকের কারুকাজ করা হয়েছে। অলমালোকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি পড়তে পারো?'

'জী না, মসিয়ো।'

'বাঁচা গেল। শিক্ষিত লোকজনই বেশি সমস্যার সৃষ্টি করে। তোমার স্মরণশক্তি কেমন?'

'মন্দ নয়।'

'তা হলে মনোযোগ দিয়ে শোনো। এখান থেকে তুমি যাবে ডানে, আর আমি ধরব বাঁয়ের পথ। আমি ফুজের-এর দিকে যাব, তুমি যাবে বাজুশ-এর দিকে। বস্তাটা সঙ্গে রাখবে সবসময়, তা হলে তোমাকে সাধারণ কুলি-মজুরের মত দেখাবে। অস্ত্রগুলো লুকিয়ে রেখো। আর একটা ছড়ি বানিয়ে নিয়ো গাছের ডাল কেটে। যতটা সম্ভব আড়ালে-আবডালে থেকে পথ চলবে। নিতান্ত বাধ্য না হলে দেখা দিয়ো না লোকের সামনে। নির্জন মাঠ আর বনের ভিতর দিয়ে এগিয়ো, বড় কোনও রাস্তা বা ব্রিজ ব্যবহার কোরো না। বিশেষ করে... ভুলেও পা রেখো না পনতখ্সোনে। ও হ্যাঁ, নদী পার হতে হবে তোমাকে। কীভাবে পার হবে?'

'সাঁতার কেটে?' প্রস্তাব দিল অলমালো।

'হেঁটেও পার হওয়া যায়। নদী কোথায় অগভীর, তা জানো?'

'জী। আঁসে আর ভিউভিয়েল-এর মাঝামাঝি।'

'একদম ঠিক। তুমি দেখি এদিকটা বেশ ভালই চেনো।'

'কিন্তু, মসিয়ো, এখন তো রাত হয়ে আসছে। আপনি ঘুমাবেন কোথায়?'

'নিজের ব্যবস্থা আমি করে নিতে পারব। তুমি কোথায় ঘুমাবে?'

'গাছের ফাঁপা গুঁড়ি খুঁজে নেব। কোনও অসুবিধে হবে না। গ্রামের ছেলে আমি... আগেও বহুবার ওভাবে রাত কাটিয়েছি।'

'তোমার টুপিটা ফেলে দাও। ওটা দেখলেই তোমার পরিচয় বুঝে ফেলবে লোকে। সামনে কোথাও থেকে একটা খড়ের টুপি জোগাড় করে নিয়ো।'

'ঠিক আছে।'

'এবার তা হলে কাজের কথায় আসা যাক,' সিরিয়াস ভঙ্গিতে বললেন বৃদ্ধ। 'তুমি আশপাশের জঙ্গলগুলো চেনো?'

'নুয়াখ্মুতিয়ে থেকে লাভাল পর্যন্ত সবকিছুই আমার মুখস্থ,' গর্বের সুরে বলল অলমালো।

'আমি জঙ্গলের কথা জানতে চাইছি।'

'ক'টা জঙ্গল আছে, ওগুলোর নাম, ভিতরে কী পাওয়া যায় না-যায়... সব বলতে পারব।'

'হুম! দিনে কতটুকু হাঁটতে পারবে?'

'প্রয়োজনে দশ, পনেরো... এমনকী কুড়ি লিগ পর্যন্ত!'

'অতটা হয়তো দরকার হবে না। শোনো, একটা কাজ করতে হবে তোমাকে। সেইন্ট উঁবা-র জঙ্গলে যাবে তুমি...'

'লম্বালের কাছাকাছি?'

'হ্যাঁ। ওখানে... সেইণ্ট হিয়োল আর প্লিদিলিকার মধ্যবর্তী গিরিখাতের ধারে একটা বিশাল বাদাম গাছ দেখবে। ওটার পাশে গিয়ে দাঁড়াবে তুমি, পেঁচার মত ডাকবে। পেঁচার ডাক পারো?'

'নিশ্চয়ই!' ঠোঁট গোল করে নিখুঁতভাবে ডাকটার নকল করল অলমালো।

'চমৎকার! তোমাকে দিয়েই হবে।' সন্তুষ্ট গলায় বললেন বৃদ্ধ। ব্যাজটা তুলে দিলেন অলমালোর হাতে। 'এটা রাখো। ব্যাজটাই আমার পদবীর পরিচায়ক। আমার নামটা আপাতত গোপন থাকা দরকার, তবে ব্যাজ দেখলেই যা বোঝার বুঝে নেবে লোকে। টেম্পল প্রিজনে বন্দি থাকা অবস্থায় আমাদের রানি নিজ হাতে করেছেন সুতোর কাজটা।'

ব্যাজটায় চুমো খেয়ে ওটা জামার ভিতরে ঢুকিয়ে ফেলল অলমালো। 'কী করব আমি এটা নিয়ে?'

'বাদাম গাছের পাশে গিয়ে তিনবার পেঁচার ডাক ডাকবে। বনের ভিতর থেকে একজন লোক বেরিয়ে আসবে তখন। তার নাম প্লাশেনল। তাকে দেখাবে এই ব্যাজটা। যা বোঝার বুঝে যাবে সে। এরপর তুমি আস্তিয়ি-তে যাবে, খুঁজে বের করবে মুসকেতঁ নামে এক খোঁড়া যোদ্ধাকে। তাকে ব্যাজ দেখিয়ে আমার আদেশ শোনাবে। বলবে, সে যেন যুদ্ধ চালিয়ে যায়, এবং কাউকে কোনও দয়া না দেখায়। আমাদের সমর্থকদের একাট্টা করবার জন্যও বলবে তাকে। এরপর তুমি যাবে কুয়েবুঁ জঙ্গলে। সেখানে পেঁচার ডাক ডাকলে থিউ নামে এক লোক বেরিয়ে আসবে। তাকে নির্দেশ দেবে কুয়েবুঁ-র দুর্গে অস্ত্র সরবরাহ করতে, সেখানে আমাদের পক্ষীয় মাহ্খি দু গ্যার আস্তানা গেড়েছেন... অস্ত্র চাই তাঁর। কুয়েবুঁ থেকে তোমাকে

যেতে হবে সেইন্ট গ্যাঁ-লে-তোয়া জঙ্গলে। একই পদ্ধতিতে যোগাযোগ করবে জাঁ শুয়াঁ নামে আরেক লোকের সঙ্গে। যুদ্ধ চালিয়ে যাবার নির্দেশ দেবে তাঁকে। তারপর তুমি যাবে ভিল-অংলুজ জঙ্গলে, দেখা করবে গিতাখ্ নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে... সেইন্ট মার্তিন বলে পরিচিত তিনি। তাঁকে বলবে, যেন কুখ্মেনিল নামে এক লোকের উপর নজর রাখা হয়। লোকটা আর্জেন্তানদের নেতা গুপিল দু প্রেফিলের মেয়ে-জামাই। কিছুই কিন্তু লিখে দিচ্ছি না, কাগজসহ ধরা পড়লে তুমি তো বটেই, সেই সঙ্গে এই লোকগুলোও মস্ত বিপদে পড়ে যাবে। সব মনে রাখতে পারবে তো?'

'হ্যাঁ। মসিয়োর আদেশ কি শেষ হয়েছে?'

'না, আরও আছে। ভিল-আংলুজ থেকে তুমি যাবে খুজফু জঙ্গলে। সেখানে মিয়েলেত নামে এক লোক থাকে। পায়ের সঙ্গে লাঠি বেঁধে গভীর খাদ পেরুতে পারে সে।'

'আপনি রণপা-র কথা বলছেন, মসিয়ো?'

'হ্যাঁ। রণপা দেখেছ তুমি আগে?'

'দেখব না কেন? আমি ব্রিটানিতে চাষী ছিলাম না? কত্তো ব্যবহার করেছি ওই জিনিস! একবার তো রণপা-র কারণে প্রাণেও বেঁচেছি। অস্ত্রহাতে তিনজন শত্রু আক্রমণ করেছিল আমাকে, পায়ের সঙ্গে লাঠি বেঁধে পালিয়ে গিয়েছিলাম আমি। ওরা ধরতে পারেনি।'

'কবে ঘটেছিল এই ঘটনা?'

'প্রায় দশ বছর আগে।'

'রাজার আমলে?'

'হ্যাঁ। আমি তখন নুনের চোরাকারবারি করতাম।'

'হুম! তুমি *লা তুয়োগ* দুর্গ চেনো?'

'এবার তো আমার বাড়ির খবর জানতে চাইছেন, মসিয়ো!'

'কী রকম?'

'আমার বাড়ি পারিন্‌হি-তে। দুর্গটা ওখানেই। ওটা আসলে আমার সেনিয়োখের পারিবারিক সম্পত্তি। কী জানতে চান লা তুয়োগ সম্পর্কে? ফটকের কথা বলব? ওটা এতই মজবুত আর পুরু... কামানের গোলা ছুঁড়েও ভাঙা যাবে না। দুর্গের নতুন বিল্ডিঙে সেইন্ট বার্থোলোমিউ-র উপর একটা বই আছে, সেটা দেখার জন্য বহু লোক যায় ওখানে। দুর্গের চারপাশে অসংখ্য ব্যাঙ আছে। ছোটবেলায় ওখানে গিয়ে আমি ব্যাঙদের লক্ষ্য করে ঢিল ছুঁড়তাম। আর হ্যাঁ... মাটির তলা দিয়ে একটা গোপন সুড়ঙ্গও আছে—ওটা দুর্গের ভিতরে গিয়ে মিশেছে। তবে আমি ছাড়া ওই সুড়ঙ্গ কেউ চেনে না।'

'কীসের সুড়ঙ্গ?' ভুরু কোঁচকালেন বৃদ্ধ।

'আমার ধারণা, বহুকাল আগে বানানো হয়েছে ওটা... যুদ্ধ-বিগ্রহের আমলে। যাতে শত্রুরা দুর্গ অবরোধ করলে ওখান দিয়ে ভিতরের লোকজন নিরাপদে পালাতে পারে।'

'তুমি ভুল করছ, অলমালো। পুরনো আমলের দুর্গে গুপ্তপথ থাকে বটে, কিন্তু লা তুয়োগে অমন কিছু নেই।'

'আছে, মসিয়ো!' জোর দিয়ে বলল অলমালো। 'যুদ্ধের সময় মসিয়ো দুহোঁ সুড়ঙ্গটা ব্যবহার করতেন, সে-কারণেই ওটার খবর গোপন রাখা হয়েছিল। কিন্তু আমার বাবা ছিলেন দুহোঁ-র বিশ্বস্ত অনুচর। সুড়ঙ্গটা চিনতেন তিনি, আমাকেও দেখিয়েছেন। কীভাবে ওটা খুলতে আর বন্ধ করতে হয়, তা আমি জানি। ব্যাপারটা অনেক জাদু-র মত...'

'অবাস্তব কথা বলছ তুমি,' বিরক্ত হলেন বৃদ্ধ। 'জাদু? ওসব চাষাভুষোদের গল্পগাথা ছাড়া আর কিছু না। তা ছাড়া লা তুয়োগে

অমন কোনও গুপ্তপথ থাকলে আমি নিশ্চয়ই তার খবর জানতাম।'

'কিন্তু...'

'কোনও কিন্তু নয়। লা তুয়োগ একটা দুর্ভেদ্য দুর্গ... যারা ভাবে গোপন সুড়ঙ্গ দিয়ে ওখানে ঢোকা বা বের হওয়া যায়, তারা নির্বোধ ছাড়া আর কিছু নয়।'

মুখ কালো করে ফেলল অলমালো।

'অযথা সময় নষ্ট করে লাভ নেই,' বললেন বৃদ্ধ। 'কাজের কথায় আসি...'

দ্রুত আরও কিছু নাম বললেন তিনি। তাদের সঙ্গে কোথায়, কীভাবে দেখা করতে হবে... কী নির্দেশ দিতে হবে তাদের... সব বলে দিলেন। তারপর অলমালোর হাতে তুলে দিলেন একটা থলে। বললেন, 'এখানে বেশ কিছু স্বর্ণমুদ্রা আছে, আশা করি কাজে লাগবে তোমার। সাবধান থেকো। সবখানে প্রজাতন্ত্রী সৈন্য নেই, তারপরেও সবসময় ছদ্মবেশে থেকো। কাজ শেষ হলে যোগ দিয়ো ওদের সেনাবাহিনীতে। ওখানে আমাদের কয়েকজন গোপন সমর্থক আছে—দেলবি, দু লেসকিউ, দু লাখোজ্ জ্যাকলান। ওদেরকে আমার ব্যাজটা দেখিয়ে বলে দিয়ো, বাহিনীর ভিতরে যতটা সম্ভব যেন ক্ষয়ক্ষতি করে ওরা। আমাদের কাজ তাতে অনেক সহজ হয়ে যাবে।'

চুপ হয়ে আছে অলমালো, বোধহয় আত্মস্থ করতে চাইছে এতসব নির্দেশ।

বৃদ্ধ বললেন, 'অলমালো, আমার সব নির্দেশের অর্থ হয়তো তুমি বুঝতে পারছ না, কিন্তু তাতে অসুবিধে নেই। ঠিকঠিকমত নির্দেশগুলো জায়গামত পৌঁছে দিতে পারলেই চলবে। আমি কী করতে চাইছি, সেটা আশা করি বুঝতে পারছ? ময়দানে নয়,

আমি চাইছি যুদ্ধটা জঙ্গলের ভিতরে নিয়ে আসতে। তাতে অনেক সুবিধে পাওয়া যায়—চোরাগোপ্তা হামলা চালিয়ে ঘায়েল করা যায় শত্রুকে। আর হ্যাঁ, সবাইকে বলে দিয়ো, ইংরেজরা আমাদের পিছনে আছে। প্রজাতন্ত্রীদেরকে দু'দিক থেকে চেপে ধরব আমরা। সারা ইয়োরোপের সমর্থন আছে আমাদের সঙ্গে। প্রজাতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে বাইরে থেকে যুদ্ধ ঘোষণা করবে তারা, আর আমরা লড়াই করব ভিতর থেকে। ফাঁদে পড়ার দশা হবে ওদের। বুঝেছ?'

'জী,' মাথা ঝাঁকাল অলমালো। 'প্রজাতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দেব আমরা। কাউকে দয়া দেখাব না।'

'ঠিক তাই। আবার বলছি, খুব সাবধান! যে-কাজে চলেছ, তাতে পদে পদে মৃত্যুর ভয়!'

'মৃত্যুকে আমি ভয় পাই না, সেনিয়োখ্। কিন্তু যাদের কাছে যাচ্ছি, তাদের কেউ যদি আপনার নাম জানতে চায়?'

'বলবে জানো না। ব্যস।'

'আপনার সঙ্গে আর কি আমার দেখা হবে?'

'নিশ্চয়ই হবে।'

'কীভাবে? আপনি কোথায় যাচ্ছেন, বা কোথায় থাকবেন, তার কিছুই তো আমি জানি না।'

'চিন্তা কোরো না, আমার সব খবর তুমি পেতে থাকবে। দেখবে, লোকে শুধু আমার কথাই বলছে। রাজদ্রোহীদের কঠিন শাস্তি দেব আমি, স্থাপন করব দৃষ্টান্ত। এমন সব কাণ্ড ঘটাব, যার কথা লোকের মুখে মুখে ফিরবে।'

'বুঝতে পেরেছি, মসিয়ো।'

'তা হলে আর দেরি কোরো না। যাও। ঈশ্বর তোমার সহায়

হোন। যদি সফল হয়ে ফিরতে পারো, সেইন্ট লুইয়ের নাইট বানাব তোমাকে।'

'যদি ব্যর্থ হই? আমার ভাইয়ের দশা হবে?'

'হ্যাঁ... যদি বেঁচে থাকো আর কী।' শান্ত গলায় বললেন বৃদ্ধ।

মাথা ঝাঁকিয়ে উল্টো ঘুরল অলমালো। হাঁটতে শুরু করল ডানদিকে। ধীরে ধীরে সাঁঝের আঁধারে মিলিয়ে গেল তার অবয়ব।

পাঁচ

অলমালোকে যতক্ষণ দেখা গেল, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন বৃদ্ধ। তারপর গায়ে আলখাল্লা চাপিয়ে ধরলেন উয়িনের পথ।

দূরে, অন্ধকারের জটলা মাথায় করে দাঁড়িয়ে আছে বড় এক গির্জা এবং তার পাশের একটি দুর্গ। ওগুলোর পিছনে রয়েছে সেইন্ট মাইকেল পাহাড়। পাহাড়ের পাদদেশে রয়েছে বেলাভূমি, সেখানে অবিশ্রাম আছড়ে পড়ছে সাগরের ঢেউ, ক্ষয়ে নিয়ে যাচ্ছে বালি। এত দূর থেকেও পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে ঢেউয়ের গর্জন।

উঁচু একটা বালিয়াড়িতে উঠে গেলেন বৃদ্ধ। পকেট থেকে বের করলেন একটা ম্যাপ, মিলিয়ে দেখলেন সামনের দৃশ্যের সঙ্গে। একদা-পরিচিত একটা জায়গা খুঁজে পেতে চাইছেন, তবে

গোধূলির আবছায়া পরিবেশে সেটা সম্ভব হবে কি না বুঝতে পারছেন না।

বালিয়াড়িটা বেশ উঁচু, চূড়া থেকে নিম্নভূমির অনেকখানি দৃষ্টিগোচর হয়। আলোকস্বল্পতার মাঝেও বেশ ক'টা গ্রামের অবয়ব চিহ্নিত করতে পারলেন বৃদ্ধ। সাগর থেকে ওসব গ্রামের উঁচু মিনারগুলোকে ল্যাণ্ডমার্ক হিসেবে ব্যবহার করে নাবিকেরা।

একটু সময় লাগল, তবে শেষ পর্যন্ত যা খুঁজছিলেন তা পেয়ে গেলেন তিনি। গাছপালায় ঘেরা ছোট্ট একটা জায়গা, তার মাঝখানে কাঠের তৈরি বাড়িঘর। বিস্তীর্ণ প্রান্তর আর ঘন জঙ্গলের মাঝামাঝি দূরত্বে রয়েছে জায়গাটা—একটা খামার।

'ওই তো!' বিড়বিড় করলেন বৃদ্ধ।

খামারবাড়ির উপরে কী যেন উড়ছে। ভুরু কুঁচকে গেল তাঁর। রঙ-টঙ বোঝা যায় না, পতাকার মত লাগছে... কিন্তু ওখানে পতাকা ওড়াবে কে?

ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়ছে বৃদ্ধের। ইচ্ছে করছে যেখানে আছেন সেখানেই বসে পড়তে। তা-ই করলেন। ক্লান্তিকে অগ্রাহ্য করবার মত অবস্থা নেই তাঁর। সাঁঝের প্রথম প্রহরের শান্ত পরিবেশ বিরাজ করছে চারদিকে, বিশ্রাম নিতে নিতে তা উপভোগ করতে লাগলেন তিনি।

হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠলেন বৃদ্ধ। খুব কাছ থেকে কয়েকটা কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে—নারী ও শিশুর। ঝোপঝাড়ের কারণে দেখতে পেলেন না কাউকে, কিন্তু বুঝতে পারলেন, বালিয়াড়ির নীচ দিয়ে যাচ্ছে ওরা। কান পাতলেন তিনি।

'তাড়াতাড়ি পা চালাও, মিশেল,' বলল একটি নারীকণ্ঠ। 'এই পথেই যেতে হবে তো?'

'হ্যাঁ, উজার্দ,' বলল আরেকটি নারী।

‘খামারটার নাম কী?’

‘লিখ্-বন-পাই।’

‘আর কতক্ষণ হাঁটতে হবে?’

‘বড়জোর পনেরো মিনিট।’

‘আরেকটু তাড়াতাড়ি হাঁটো, নইলে গরম সুপ পাব না।’

‘চেষ্টা তো করছি।’

‘দৌড়াতে পারলে ভাল হতো, কিন্তু তিনটা বাচ্চাকে কোলে তুলে তো আর দৌড়ানো সম্ভব না। এমনিতেই একজন তোমার কোলে। ওকে হাঁটতে শেখাও, নইলে দিনে দিনে যন্ত্রণা বাড়বে।’

‘পা চালাও, গুনেজাঁ।’

‘তোমার এই গুণধর ছেলের জন্য আমাদের আরও দেরি হচ্ছে, মিশেল। পথে কোনও মেয়ে দেখলেই দাঁড়িয়ে যায়, কথা বলবার চেষ্টা করে।’

হাসল মিশেল নামের মেয়েটি। ‘ছেলেদের কাছ থেকে আর কী আশা করো? ওর বয়স পাঁচ হতে চলল।’

‘অ্যাই গুনেজাঁ, তুমি তখন ওই চাষীর মেয়েটার সঙ্গে কী নিয়ে এত গল্প করছিলে? ওকে তুমি চেনো?’

‘চিনি তো!’ বলল নতুন একটা কণ্ঠ। বাচ্চা ছেলে। ‘আমার বান্ধবী ও।’

‘বান্ধবী! বান্ধবী হলো কীভাবে?’

‘সকাল থেকে ওর সঙ্গে খেলছিলাম যে!’

‘হায় কপাল! এ দেখি এ-বয়সেই বান্ধবী জোগাড় করতে শুরু করেছে!’

ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এল কণ্ঠগুলো, মিলিয়ে গেল খানিক পর।

চুপচাপ বসে রইলেন বৃদ্ধ। মনের ভিতর নানা রকম উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা ভিড় করে এলেও অনন্ত আকাশের নীচে, সান্ধ্য প্রকৃতির মাঝে আশ্চর্য এক প্রশান্তি অনুভব করছেন তিনি। অন্তরের গভীরে জেগে উঠছে সুস্পষ্ট আশার এক নবীন প্রভাত। সাগরের করাল থাবা এবং নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে যেভাবে তিনি বেঁচে এসেছেন, তাতে মনে হচ্ছে ভাগ্য তাঁর পক্ষে রয়েছে। এই মুহূর্তে কেউ তাঁর নাম জানে না, কেউ তাঁর অবস্থানও জানে না। সম্পূর্ণ মুক্ত ও স্বাধীন তিনি। নিশ্চিন্তে ফেলতে পারেন তিনি পরবর্তী পদক্ষেপ।

আপন চিন্তায় বিভোর হয়ে গিয়েছিলেন বৃদ্ধ। হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠলেন দূরে কিছু একটা নড়তে দেখে। মাথা ঘুরিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি। সামনের প্রান্তরটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে একটা গির্জার মাথার বিশাল ঘণ্টাটা দুলছে ভীষণভাবে। শুধু ওটাই নয়, আশপাশে যত গির্জা আছে, সবগুলোই একই ভঙ্গিতে পাগলের মত ঘণ্টা বাজিয়ে চলেছে। দূরত্বের কারণে আওয়াজ কানে আসছে না, কিন্তু ঘণ্টার দুলুনি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন তিনি।

কিন্তু কী কারণে এই সমবেত ঘণ্টাধ্বনি? কোনও ধরনের সঙ্কেত? সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে কারও আগমনের ব্যাপারে? শঙ্কায় দুলে উঠল বৃদ্ধের মন। কার ব্যাপারে সঙ্কেত দেয়া হচ্ছে? তিনি হতে পারেন না। এলাকার লোকে এত তাড়াতাড়ি তাঁর খবর পাবে না। ফরাসি নৌ-বহর থেকে কেউ এখনও পা রাখেনি ডাঙায়—তিনি নিশ্চিত। এলেও কিছু যায়-আসে না... ক্লেমোর ডুবে গেছে, মারা গেছে জাহাজটার সব আরোহী। ক্যাপ্টেন বোয়াবার্থেলিউ আর ফিউভিল ছাড়া আর কেউ পরিচয়ও জানত না তাঁর।

তা হলে কেন এই ঘণ্টাধ্বনি? অনেক ভেবেও এর কোনও সদুত্তর পেলেন না তিনি।

হঠাৎ খসখস আওয়াজ শুনে ঘুরে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ। শুকনো পাতার মত শব্দ... কোত্থেকে আসছে? সেদিক লক্ষ্য করে এগোতে শুরু করলেন। যে-পাশ ধরে বালিয়াড়িতে উঠে এসেছেন, তার উল্টোপাশের ঢাল ধরে নামতে থাকলেন। কিছুদূর নামতেই দেখতে পেলেন বালিতে গাঁথা একটা বাঁশের দণ্ড, সেটার গায়ে লাগানো হয়েছে একটা প্ল্যাকার্ড। ওটার সামনে যেতেই বুকের রক্ত ছলকে উঠল তাঁর।

গোটা গোটা হরফে একটা নোটিশ লেখা হয়েছে প্ল্যাকার্ডে। সেটা এ-রকম:

<u>ফরাসি প্রজাতন্ত্র: এক ও অভিন্ন</u>

শেরবার্গ উপকূলের গণফৌজের পক্ষ থেকে এই মর্মে সবাইকে অবহিত করা যাচ্ছে যে, প্রাক্তন মাহ্খি দু লঁতেনাক... ফঁতেনের ভাইকাউন্ট, এবং ব্রিটানির তথাকথিত যুবরাজ... অতি সংগোপনে গ্র্যানভিল উপকূলে অবতরণ করতে চলেছে। এতদ্বারা তাকে প্রজাতন্ত্রের পরম শত্রু ও ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে ঘোষণা করা হচ্ছে, এবং তার মাথার জন্য দাম ঘোষণা করা হচ্ছে। লঁতেনাককে জীবিত বা মৃত অবস্থায় যে-ই ধরিয়ে দেবে, তাকেই পুরস্কার হিসেবে ষাট হাজার লিভাখ্-এর সমপরিমাণ স্বর্ণ দেয়া হবে। ঘৃণ্য এই অপরাধীকে ধরবার জন্য শেরবার্গ থেকে অতি শীঘ্রি*

**লিভাখ্ (Livre)—ফ্রান্সের তৎকালীন মুদ্রা।*

একদল সৈন্যও পাঠানো হবে, তাদেরকে সর্বাত্মক সাহায্য করবার জন্য এলাকাবাসীকে নির্দেশ দেয়া হলো।

আদেশক্রমে,
গণফৌজের পক্ষ থেকে
প্রিয়ো দু লা মার্ন।

বুক ধুকপুক করতে শুরু করেছে বৃদ্ধের। বুঝতে পারছেন, এখানে থাকা আর নিরাপদ নয়। তাই তাড়াতাড়ি নেমে এলেন বালিয়াড়ি থেকে। দ্রুতপায়ে এগোলেন খামারের পথে।

প্রান্তরের মাঝ দিয়ে হাঁটতে থাকলেন তিনি। আশপাশ নির্জন। রাত নেমে এসেছে বলেই কি না কে জানে, জনমনিষ্যির সাড়া নেই। নিরাপদে প্রান্তর পেরিয়ে জঙ্গলের কাছে পৌঁছে গেলেন বৃদ্ধ। ওখানে রাস্তা দু'ভাগ হয়ে গেছে, চলে গেছে ডানে আর বাঁয়ে। রাস্তার সংযোগস্থলে আরেকটা প্ল্যাকার্ড দেখা গেল। ওটার দিকে কয়েক পা এগোতেই পিছন থেকে ভেসে এল একটা অচেনা কণ্ঠ।

'কোথায় যাচ্ছ?'

ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ। ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে আরেক বৃদ্ধ। তাঁরই মত লম্বা, তাঁরই মত ধবধবে সাদা চুল। পার্থক্য বলতে... লোকটার বেশভূষা আরও নোংরা এবং শতচ্ছিন্ন। আগে কখনও একে দেখেননি তিনি।

কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে আবার প্রশ্ন ছুঁড়ল অপরিচিত লোকটা। 'কী হলো, কথা বলছ না কেন? কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

'তার আগে আমার প্রশ্নের জবাব দাও,' শান্ত গলায় বললেন বৃদ্ধ। 'এ-জায়গার নাম কী?'

হাসল আগন্তুক। 'আবার জানতে চাইছ? এটা তানিস, মসিয়ো! আমি এখানকার ভিখিরি, আর তুমি এখানকার সেনিয়োখ্!'

'আমি?' কপট বিস্ময় ফোটালেন বৃদ্ধ।

'অভিনয় করে লাভ নেই,' বলল আগন্তুক। 'তোমাকে চিনতে বাকি নেই আমার। তুমিই মাহ্খি দু লঁতেনাক।'

ধরা পড়ে যাওয়ায় চেহারা থমথমে হয়ে উঠল লঁতেনাকের। শীতল গলায় বললেন, 'ভুল বলোনি তুমি। এখন কী করবে? আমাকে ধরিয়ে দেবে?'

'না,' মাথা নাড়ল ভিখিরি। 'আমরা দু'জনেই উদ্বাস্তু। এক উদ্বাস্তু কখনও আরেক উদ্বাস্তুকে ধরিয়ে দেয় না। আমি শুধু জানতে চাইছিলাম, তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

'যেখানেই যাই, তাতে তোমার কী?'

'কথা ঘোরাবার প্রয়োজন নেই, সেনিয়োখ্। তুমি কি লিখ্-বন-পাইয়ের খামারে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

'যেয়ো না। ওখানে নীল দলের সৈন্যরা ঘাঁটি গেড়েছে।'

'কবে থেকে?'

'আজ নিয়ে তিনদিন।'

'খামারের লোকেরা আপত্তি করেনি?'

'কীসের আপত্তি? শুধু খামার না, বলতে গেলে পুরো গাঁ ওদেরকে দরজা খুলে অভ্যর্থনা জানিয়েছে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল ভিখিরি। হাত তুলল খামারবাড়ির ছাতের দিকে। 'পতাকাটা দেখতে পাচ্ছ?'

'পাচ্ছি। কিন্তু কীসের পতাকা, তা বুঝতে পারিনি এখনও।'

‘প্রজাতন্ত্রের তিন-রঙা পতাকা। আমি যে মিথ্যা বলছি না, ওটাই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।’

চিন্তায় পড়ে গেলেন লঁতেনাক। আপনমনে বলে উঠলেন, ‘এখন তা হলে কোথায় যাব আমি?’

‘যদি কোনও অসুবিধে না থাকে, আমার কুটিরে যেতে পারো।’

‘তোমার কুটিরে?’ ভুরু কোঁচকালেন লঁতেনাক।

‘হ্যাঁ,’ বলল ভিখিরি। ‘ওটা আহামরি কিছু নয়—ছোট্ট একটা কামরা... ছাত বলতে গাছের ডালাপালা, আর বিছানা বলতে শুকনো ঘাস ছাড়া আর কিছু নেই। তবে ঘরটা নিরাপদ। খামারে গেলে ওরা তোমাকে গুলি করে মারবে, কিন্তু আমার সঙ্গে গেলে আর কিছু না হোক, শান্তিতে ঘুমাতে পারবে তুমি। কাল সকালে নীলদলের সৈন্যরা অন্যত্র চলে যাবে বলে শুনেছি, তখন নাহয় যেদিকে মন চায় চলে যেয়ো।’

তীক্ষ্ণ চোখে লোকটাকে জরিপ করলেন লঁতেনাক। ‘আমাকে সাহায্য করতে চাইছ কেন? তুমি কাদের সমর্থক? রাজতন্ত্রী, নাকি প্রজাতন্ত্রী?’

‘আমি সামান্য এক ভিখিরি।’

‘রাজতন্ত্রী বা প্রজাতন্ত্রী কিছুই নও?’

‘আমি ওসবে বিশ্বাস করি না।’

‘তুমি রাজার পক্ষে না বিপক্ষে?’

‘ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আমার নেই।’

‘দেশজুড়ে এতকিছু ঘটে যাচ্ছে... আর তা নিয়ে তোমার কোনও মাথাব্যথা নেই?’

‘ক্ষুধার তাড়নায় কাতর মানুষ শুধু খাবার নিয়ে ভাবে, সেনিয়োখ্, আর কিছু নয়।’

'তা হলে তুমি আমাকে সাহায্য করতে চাইছ কেন?'

'কারণ ওরা তোমাকে অপরাধী বলে ঘোষণা করেছে। এ-দেশের আইনের প্রতি বিশ্বাস নেই আমার। দিনের পর দিন না খেয়ে মরছি আমি, আইন আমার জন্য কী করেছে? এটাকে এক ধরনের বিদ্রোহ বলতে পারো।'

'বিদ্রোহ? আমার জন্য? আমাকে তুমি নিজের কাতারের লোক ভাবছ?'

'নয়তো কী? এ-মুহূর্তে তুমি আমার চেয়েও গরীব, আমার চেয়েও অসহায়। আমার অন্তত স্বাধীনভাবে প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিয়ে ঘুরে বেড়াবার অধিকার আছে, তোমার তো তাও নেই।'

'সে-কারণেই আমাকে বাঁচাবে?'

'অবশ্যই, সেনিয়োখ্! এখন আমরা ভাই-ভাই। আমি রুটির কাঙাল, তুমি জীবনের কাঙাল। আমরা দু'জনেই ভিখিরি।'

'তুমি কি জানো, আমার মাথার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে?'

'হ্যাঁ। প্ল্যাকার্ডে দেখেছি।'

'তুমি পড়তে জানো?'

'অবশ্যই! আমাকে অশিক্ষিত ভেবেছিলে বুঝি?'

'তারমানে জেনে-শুনে ষাট হাজার লিভাখ্ এর সোনা পায়ে ঠেলছ তুমি?'

'কাউকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে টাকা কামাতে চাই না আমি,' শান্তস্বরে বলল ভিখিরি। 'এসো, এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ নয়।'

জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে পড়ল দু'জনে। কিছুক্ষণ এগোবার পর দেখা পাওয়া গেল ভিখিরির আবাসের। বিশাল এক ওকগাছের ছায়ায় ডালপাতার ছাউনি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে একটা ছোট্ট

ঘর। গুড়ি মেরে ঢুকতে হয়। কষ্টেসৃষ্টে দু'জন মানুষ শুতে এবং বসতে পারে।

ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ল দু'জনে। আসবাবপত্র বলতে কিছু নেই, মেঝেতে শুকনো পাতা বিছিয়ে রাখা হয়েছে শোয়ার জন্য। এককোণে পানির একটা পাত্র আছে, তার পাশে রাখা হয়েছে কয়েক টুকরো রুটি আর কিছু বাদাম।

'এসো, রাতের খাওয়াটা সেরে নেয়া যাক,' বলল ভিখিরি।

পকেট থেকে নিজের বিস্কুটটা বের করে দিলেন লঁতেনাক। তারপর সব খাবার ভাগাভাগি করে খেলেন অদ্ভুত লোকটির সঙ্গে। খাওয়া শেষে তাকে প্রশ্ন করলেন, 'এত উদাসীন কেন তুমি? দেশে যা-ই ঘটুক, তাতে তোমার কিছু আসে-যায় না?'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল ভিখিরি। 'ওসব হচ্ছে তোমার মত উঁচু তলার মানুষদের ব্যাপার। আমার তাতে কী? আকাশে ঠিকমত চাঁদ-সূর্য উঠলে... আর তিনবেলা খেতে পেলেই আমি খুশি।'

'তোমার নাম কী?'

'আমার নাম তেলমাখ্শ। তবে লোকে আমাকে *কাইমঁদ* বলে ডাকে।'

'কাইমঁদ? ওটা আঞ্চলিক শব্দ না? অর্থ তো বোধহয় ভিখিরি?'

'হুঁ। আরও একটা নামে আমাকে ডাকে ওরা—বুড়ো! গত চল্লিশ বছর ধরে আমাকে বুড়ো ভিখিরি বলে ডাকছে ওরা।'

'চল্লিশ বছর! তখন তো তুমি অনেক জোয়ান ছিলে। বুড়ো বলত কেন?'

'আমি কখনোই জোয়ান ছিলাম না, সেনিয়োখ্! যৌবন থাকে তোমার মত বড়লোকের—যারা তিনবেলা ঠিকমত খেতে পায়। এই দেখো না, এই বয়সেও তুমি কত তাগড়া! অথচ আমি আধ ক্রোশ না হাঁটতেই হাঁপিয়ে যাই। অকালবার্ধক্যের একটা বড়

কারণ হলো ক্ষুধা।'

তেলমাখশের এ-কথার পিঠে কোনও কথা খুঁজে পেলেন না লঁতেনাক।

একটু অপেক্ষা করে লোকটা আবার বলল, 'দারিদ্র্য আর ঐশ্বর্য... এ-দুটোই সমস্ত অনর্থের মূল। গরীবরা ধনী হতে চায়, অথচ ধনীরা গরীব হতে চায় না কিছুতেই। এ-নিয়েই বাধে ঝামেলা। আমি অবশ্য ওসব ঝামেলা এড়িয়ে চলি। থাকি নিজের মত, কারও পক্ষেই যোগ দিই না। রাজাকে ওরা হত্যা করুক, তা আমি চাইনি... কিন্তু কেন চাইনি তা বুঝিয়ে বলা একটু কঠিন। আসলে... হানাহানি আর খুনোখুনি সহ্য হয় না আমার। দেখো না, কত নিরীহ লোককে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে খুন করছে প্রজাতন্ত্রীরা। ক'দিন আগে একজনকে ফাঁসি দেয়া হলো, তার ঘরে বউ আর সাতটা বাচ্চা আছে। কী হবে ওদের, বলো? অবশ্য এসব বলছি বলে এ-কথা ভেবো না, রাজার পক্ষকে আমি সমর্থন করছি। অন্যায়-অবিচারের কথা যদি তোলো, তা হলে সে-আমলেও এ-ধরনের অনেক ঘটনা ঘটেছে।'

পানিতে চুমুক দেবার জন্য একটু থামল তেলমাখ্‌শ। লঁতেনাক জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার দিন চলে কীভাবে? শুধু কি ভিক্ষা করে?'

'নাহ্‌। ছোটখাট চিকিৎসা জানি আমি—ভাঙা হাড় বসাতে পারি, গাছগাছড়া থেকে ওষুধ আর মলম বানাতে জানি... বোকা গ্রামবাসীরা ভাবে আমি জাদুকর। আমাকে খুশি করবার জন্য টুকটাক টাকাপয়সা দেয় ওরা। ওভাবেই চলছি।'

'তুমি কি এ-অঞ্চলের লোক?'

'হ্যাঁ। এই অঞ্চলের বাইরে আমি কখনও যাইনি।'

'আমাকে কখনও দেখেছ?'

'বহুবার। শেষ দেখেছিলাম দু'বছর আগে—ওই যে... যখন তুমি ইংল্যাণ্ডে পালিয়ে গেলে।'

'কিন্তু আমি তো তোমাকে কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না।'

'পড়বে কী করে? ভিক্ষাদাতা কখনও ভিক্ষুকের দিকে তাকায় না। তোমার প্রাসাদের সামনে প্রায়ই ভিক্ষার থালা হাতে যেতাম আমি। তুমিও বহুবার ভিক্ষা দিয়েছ আমাকে। তোমার দেয়া ভিক্ষাই বহুবার অভুক্ত থাকার হাত থেকে বাঁচিয়েছে আমাকে। ধরে নাও আজ আমি তোমার সেই দয়ার প্রতিদান দিচ্ছি।'

'তা হলে তোমাকে আমি অন্তরের অন্তস্তল থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, তেলমাখ্‌শ।'

'ধন্যবাদ জানাবার কিছু নেই। আমার একটা শর্ত পূরণ করলেই খুশি হব।'

'কী শর্ত?'

'কথা দাও, এই এলাকার কোনও ক্ষতি তুমি কোনোদিন করবে না।'

'আমি ভাল কাজই করতে চাই।'

'বেশ। চলো, এবার ঘুমিয়ে পড়া যাক।'

পাতার বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে পড়ল দু'জনে। তেলমাখ্‌শ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নাক ডাকাতে শুরু করল, কিন্তু লঁতেনাক ঘুমাতে পারলেন না। মাটিতে কান ঠেকালেই শোনা যাচ্ছে বহুদূরে বাজতে থাকা ঘণ্টার আওয়াজ। ক্রমাগত বাজছে সমস্ত গির্জার ঘণ্টা, যেন তিনি না ধরা পড়া পর্যন্ত থামবে না।

অন্ধকার কুঁড়েতে শুয়ে ছটফট করতে থাকলেন লঁতেনাক। এক পর্যায়ে ক্লান্তির কাছে হার মানল শরীর। নিজের অজান্তেই অতল ঘুমে তলিয়ে গেলেন তিনি।

ঘুম ভাঙলে তেলমাখ্‌শকে কুঁড়েঘরের দরজায় লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন লঁতেনাক। সকালের উদীয়মান সূর্যের আলো পড়ছে তার মুখের উপর।

পিছনে শব্দ শুনে ঘাড় ফেরাল সে। লঁতেনাককে চোখ মেলা অবস্থায় দেখে হাসল। 'ঘুম ভাঙল, সেনিয়োখ্‌?'

'ক'টা বাজে?' আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসলেন বৃদ্ধ মাহ্‌খি।

'পাঁচটা। গির্জার ঘণ্টা শুনেছি আমি। বাতাসও দিক পাল্টেছে, ডাঙা থেকে সমুদ্রের দিকে বইছে এখন। যেহেতু আলাদা কোনও শব্দ পাচ্ছি না, ধরে নিতে হয় সতর্কধ্বনি থামিয়ে দিয়েছে ওরা। গ্রাম আর খামার শান্ত। নীলদলের সৈন্যরাও বোধহয় চলে গেছে। কাজেই যার যার পথে রওনা হতে পারি আমরা। আমি সাধারণত এ-রকম সময়েই বেরিয়ে যাই।'

'ভাল প্রস্তাব,' উঠে দাঁড়ালেন লঁতেনাক।

'আমি ওই দিকে যাব,' হাত তুলে দেখাল তেলমাখ্‌শ। 'তুমি ওদিকে যাও। খিদে পেলে বাদামগুলো সঙ্গে নিয়ে যেতে পারো।'

মাহ্‌খিকে অভিবাদন জানিয়ে গাছপালার আড়ালে হারিয়ে গেল সে। খানিক পর লঁতেনাকও বেরিয়ে পড়লেন।

ভোরের এই সময়টাকে নরম্যানদের ভাষায় চড়ুইডাকার সময় বলে। নামটা সার্থকতা প্রমাণের জন্যই বুঝি বনপথের চারপাশে গান গেয়ে চলেছে হাজারো পাখি। সেই গান শুনতে শুনতে কাল সন্ধ্যায় যে-পথে এসেছিলেন, সে-পথেই ফিরে চললেন লঁতেনাক। একটু পর পৌঁছে গেলেন পথের সংযোগস্থলে। প্ল্যাকার্ডটা এখনও আগের মত ঠায় দাঁড়িয়ে

আছে, ভোরের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে প্রতিটা অক্ষর।

ভুরু কুঁচকে গেল মাহ্খির। বিজ্ঞপ্তির নীচে ছোট করে লেখা নতুন দুটো লাইন দেখতে পাচ্ছেন, স্বাক্ষর-সহ। গত সন্ধ্যায় আলোকস্বল্পতার কারণে ঠিকমত দেখতে পাননি। ওখানে লেখা হয়েছেঃ

মাহ্খি দু লঁতেনাককে খুঁজে পাওয়ামাত্র তাকে গুলি করে হত্যা করতে হবে।

স্বাক্ষরিতঃ গণফৌজের ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার, গুঁভা।

থমকে গেলেন লঁতেনাক। স্বাক্ষরের নামটার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করলেন, 'গুভাঁ! শেষ পর্যন্ত গুভাঁ!'

খানিক পর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। পাশ ঘুরে হাঁটতে শুরু করলেন। ঢালু একটা পথ ধরে উঠে এলেন উঁচু এক জায়গায়। চোখ বোলালেন চারদিকে। পথের দু'ধারে ঘন হয়ে জন্মেছে আগাছা আর কাঁটাঝোপ। সকালের কোমল রোদে যেন স্নান করছে প্রকৃতি, নিঃশব্দে হাসছে।

হঠাৎ করেই বদলে গেল প্রকৃতির এই শান্ত-সমাহিত রূপ। দূর থেকে ভেসে এল চিৎকার-চেঁচামেচি আর গুলির আওয়াজ। খামার দিক থেকে আকাশে পাক খেয়ে উঠল রাশ রাশ কালো ধোঁয়া।

চমকে গেলেন লঁতেনাক। হচ্ছে কী ওখানে? বিপদের তোয়াক্কা না করে ঢালু পথটা ধরে আরেকটু উপরে উঠে গেলেন তিনি। ঝোপঝাড়ের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিলেন ওপাশে।

আগুন ধরে গেছে খামারবাড়িতে। ওখান থেকেই আসছে গোলাগুলির আওয়াজ। আক্রান্ত হয়েছে খামারটা। কিন্তু কে

আক্রমণ করল? নীলদলের সৈন্যরাই কি? খামারের লোকজন কি ওদের কথার অবাধ্য হয়েছে? সে-কারণেই কি ধরিয়ে দেয়া হয়েছে আগুন... চালানো হচ্ছে হত্যাকাণ্ড? প্রশ্নগুলোর কোনও জবাব খুঁজে পেলেন না লঁতেনাক।

ঘন ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছেন মাহ্খি। এই ঝোপঝাড়ই বাড়তে বাড়তে জঙ্গলের আকার নিয়ে চলে গেছে খামার পর্যন্ত। এখানে লুকিয়ে থাকবেন, না কেটে পড়বেন, বুঝতে পারছেন না তিনি।

সিদ্ধান্তটা নেবার আগেই অনেকগুলো পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলেন তিনি। একসঙ্গে অনেকগুলো সশস্ত্র মানুষ এসে ঢুকেছে বনের ভিতরে। নিশ্চয়ই খামারে যারা ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে, তারাই! কিন্তু এ-মুহূর্তে যুদ্ধ করছে না ওরা কারও সঙ্গে। বরং কাকে যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে বনের মাঝে। কথাবার্তায় প্রকাশ পাচ্ছে জয়ের উল্লাস আর ক্রোধের আবেগ। মাঝে মাঝে চিৎকার করে ডাকছে কাকে যেন। গোলমালের কারণে নামটা প্রথমে ঠিকমত শুনতে পেলেন না বৃদ্ধ মাহ্খি। কিন্তু খানিক পরেই খুব কাছ থেকে আরেকবার ডাকা হলো নামটা ধরে, এবার শোনা গেল পরিষ্কার।

'লঁতেনাক! মাহ্খি দু লঁতেনাক!!'

জমে গেলেন লঁতেনাক। তাঁকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে এরা বনের মাঝে!

ছয়

দেখতে দেখতে পুরো জঙ্গল ভরে গেল বন্দুক, বেয়োনেট আর তলোয়ারধারী সৈন্যে। পাগলের মত ঝোপঝাড় তছনছ করতে শুরু করল তারা।

প্রমাদ গুনলেন লঁতেনাক। পালাবার উপায় নেই, ধরা তাঁকে পড়তেই হবে। মৃত্যুকে সাহসের সঙ্গে বরণ করবার জন্য তৈরি হলেন তিনি। আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন খোলা জায়গায়। সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে ছুটে এল সৈন্যরা, ঘিরে ফেলল তাঁকে। তাদের চোখে অগ্নিদৃষ্টি লক্ষ করলেন মাহ্‌খি।

আলখাল্লার হুড নামিয়ে দিলেন বৃদ্ধ। মুখোমুখি হলেন সৈন্যদের। গমগমে গলায় বললেন, 'আমাকেই তোমরা খুঁজছ। আমিই মাহ্‌খি দু লঁতেনাক—ফঁতেনের ভাইকাউন্ট, রাজার বাহিনীর সেনাপতি... এবং ব্রিটানির যুবরাজ!' আলখাল্লার বাঁধন খুলে নিজের বুক উন্মুক্ত করলেন তিনি। 'এই নাও... এবার এই বুকে গুলি চালাও!'

গুলির আঘাত সহ্য করবার জন্য শরীর শক্ত করে ফেললেন লঁতেনাক, কিন্তু বাস্তবে ঘটল ঠিক উল্টো ঘটনা। তাঁর কথা শেষ হওয়ামাত্র হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়ল সব সৈনিক। মাথার টুপি খুলে সমস্বরে চিৎকার করল, 'লঁতেনাক দীর্ঘজীবী হোন!

জেনারেল দীর্ঘজীবী হোন!!'

এতক্ষণে নিজের ভুল ধরতে পারলেন লঁতেনাক। এরা সবাই তাঁর নিজেরই লোক। ভঁদির যুদ্ধের সাদা সেনাবাহিনী। হাঁটু গেড়ে পুজো করছে তাঁকে। ক্রুদ্ধ চোখগুলোয় ফুটে উঠেছে আশ্চর্য এক সমীহের দৃষ্টি।

নতজানু হয়ে বসে থাকা সৈন্যদের মাঝ দিয়ে অভিজাত বংশীয় এক যুবক মাহ্খির দিকে এগিয়ে এল। গ্রামের লোকের মত মাথায় একটা ফেল্ট হ্যাট পরেছে সে, তাতে সাদা রঙের ব্যাজ লাগানো। গায়ে দিয়েছে ভেড়ার চামড়ার তৈরি জ্যাকেট। কোমরে একটা সাদা স্কার্ফ বাঁধা, তাতে গুঁজে রাখা হয়েছে সোনালি হাতলঅলা একটা তলোয়ার।

মাহ্খির সামনে এসে টুপি খুলে সম্মান দেখাল যুবক। তারপর হাঁটু গেড়ে তলোয়ারটা রাখল তাঁর পায়ের সামনে। বলল, 'অবশেষে আপনাকে আমরা খুঁজে পেয়েছি, জেনারেল। নেতৃত্বের প্রতীক হিসেবে এই তলোয়ার নিয়ে আমাদের পরিচালনার ভার গ্রহণ করুন। এইসব সৈনিক আজ থেকে আপনার অধীন। এতক্ষণ পর্যন্ত আমি এদের নেতা ছিলাম, কিন্তু এখন আপনার অধীনে আমিও সামান্য এক সৈনিকে পরিণত হলাম। হে সেনিয়োখ্, আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ করুন... হে জেনারেল, আমাদের করণীয় কর্ম সম্পর্কে আপনার আদেশ প্রদান করুন!'

যুবকের ইশারা পেয়ে আরেক সৈনিক এগিয়ে এল। হাতে ধরা একটা তিন-রঙা পতাকা নামিয়ে রাখল মাহ্খির পায়ের কাছে... এই পতাকাটাই গতকাল খামারবাড়ির উপরে উড়তে দেখেছিলেন তিনি। যুবক বলল, 'জেনারেল, এই পতাকাটা আমরা নীলদলের লোকদের কাছে পেয়েছি—ওরা ওই খামারটা

গত কয়েকদিন থেকে দখল করে রেখেছিল। আমরা যুদ্ধ করে খতম করেছি ওদের। আমার নাম গ্যাভা... আমি মাহ্খি দু লা হুয়ে-র লোক।'

'খুব ভাল,' শান্তস্বরে বললেন লঁতেনাক। ঝুঁকে তুলে নিলেন তলোয়ারটা। ওটা উঁচু করে বললেন, 'উঠে দাঁড়াও সবাই। রাজা দীর্ঘজীবী হোন!'

সমস্বরে সুর মেলাল সৈনিকরা, 'রাজা দীর্ঘজীবী হোন! মাহ্খি দীর্ঘজীবী হোন! লঁতেনাক দীর্ঘজীবী হোন!'

তাদের হুঙ্কারে কেঁপে উঠল গোটা বনভূমি।

গ্যাভার দিকে ফিরলেন লঁতেনাক। 'কতজন আছে তোমার বাহিনীতে?'

'সাত হাজার, জেনারেল।'

মাথা ঝাঁকিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন লঁতেনাক। সৈনিকরা ঝোপঝাড় কেটে তাঁর জন্য পথ তৈরি করে দিল।

গ্যাভা বলল, 'প্রজাতন্ত্রীরা আমাদের কাজ বড্ড সহজ করে দিয়েছে, সেনিয়োখ্। জনসাধারণ স্রেফ একটা স্ফুলিঙ্গের অপেক্ষায় ছিল। বিজ্ঞপ্তি টাঙিয়ে সেটাই সরবরাহ করেছে বোকাগুলো। আপনার উপস্থিতির খবর জানিয়ে... সেইসঙ্গে আপনার মাথার দাম ঘোষণা করে নিজের অজান্তেই পুরো এলাকাকে রাজার হয়ে বিদ্রোহ করবার জন্য উৎসাহ জুগিয়েছে ওরা। খবরটা গ্র্যানভিলের মেয়রের মারফত পাই আমরা... সে আমাদেরই লোক। ওর বুদ্ধিতেই গতকাল পুরো এলাকায় গির্জার ঘণ্টা বাজানো হচ্ছিল।'

'ওটা আমাকে ধরিয়ে দেবার জন্য নয়?' বিস্মিত হলেন লঁতেনাক।

'জী না। বরং আপনাকে সতর্ক করে দেবার জন্য। যাতে

অসতর্ক অবস্থায় শত্রুর ফাঁদে আপনি পা না দেন।'

'হুম! তোমার সঙ্গে তা হলে সাত হাজার সৈন্য আছে?'

'আপাতত। আগামীকাল আমাদের সংখ্যা হবে পনেরো হাজার। সবাই ব্রিটানির সৈনিক। সংখ্যা আরও বাড়বে। আপনি আসছেন শুনেই কাজে নেমে পড়েছেন মসিয়ো লাখোজ্ জ্যাকলান, এক রাতের ভিতরেই ছ'টা এলাকা থেকে দশ হাজার যোদ্ধাকে একাট্টা করেছেন তিনি। তবে ওদের কাছে অস্ত্র বা গোলাবারুদ নেই। হাতের কাছে যা পাওয়া যাচ্ছে, তা-ই নিয়ে আসছে ওরা। আমরা এদিকে বেরিয়ে পড়েছি আপনাকে খুঁজে বের করতে। পথে লিখ্-বন-পাইয়ের খামারে একদল নীল-সৈন্যকে পেয়ে খতম করে দিয়েছি।'

'ওরা লড়াই করেছিল?'

'সুযোগ পায়নি। খুব ভোরে হামলা চালিয়েছি আমরা, ওরা তখন ঘুমে কাদা। এলাকার কিছু বোকা লোক হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল ওদের, তাই ভেবেছিল এখানকার সবাই ওদের পক্ষে। পাহারা-টাহারা রাখার কথা একদমই ভাবেনি। কিছু বুঝে ওঠার আগেই তাই ঘায়েল হয়েছে।'

'চমৎকার কাজ দেখিয়েছ,' প্রশংসা করলেন লঁতেনাক।

'ধন্যবাদ, জেনারেল। আমার সঙ্গে একটা ঘোড়া আছে, আপনি কি ওটা নেবেন?'

'ঘোড়া পেলে মন্দ হয় না।'

গ্যাভার ইশারা পেয়ে তাগড়া একটা ঘোড়া নিয়ে এল এক সৈনিক। কারও সাহায্য ছাড়াই এক লাফে ওটার পিঠে চড়ে বসলেন লঁতেনাক। অশ্বারোহী সেনাপতিকে সামরিক কায়দায় সম্মান দেখাল সৈনিকরা। পাল্টা অভিবাদনের মাধ্যমে তার জবাব দিলেন লঁতেনাক।

গ্যাভা জানতে চাইল, 'আপনার ঘাঁটি কোথায় হবে, জেনারেল?'

'আপাতত ফুজের জঙ্গলে।'

'আপনার অধীনস্থ সাত অরণ্যের এক অরণ্য ওটা, তাই না, জেনারেল?'

'হ্যাঁ। ভাল কথা, আমাদের একজন যাজক দরকার।'

'আছে তো!'

'কে?'

'লা শ্যাপেলে হুব্‌খি-র প্রধান যাজক।'

'চিনি,' বললেন লঁতেনাক। 'সাগরপথে একবার জার্সিতে গিয়েছিলেন তিনি।'

ভিড়ের মাঝ থেকে যাজকের পোশাক পরা একজন মানুষ বেরিয়ে এল। কুর্নিশ করে বলল, 'আমি আসলে তিনবার গিয়েছিলাম, সেনিয়োখ্‌!'

ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকালেন লঁতেনাক। হাসিমুখে বললেন, 'সুপ্রভাত, ফাদার! কেমন আছেন?'

'ভাল, সেনিয়োখ্‌।'

'আগামী কিছুদিন ব্যস্ত থাকতে হবে আপনাকে—মৃত্যুপথযাত্রী শত্রুদের পাপস্বীকার করাবেন আপনি। মানে... ওরা যদি চায় আর কী। আমরা কারও উপরে জোর খাটাব না।'

'আপনি খাঁটি ভদ্রলোক,' বললেন যাজক। 'গেমেনিতে গাসতুমের লোকেরা প্রজাতন্ত্রীদের কাছ থেকে জোর করে স্বীকারোক্তি আদায় করছে।'

'গাসতুম একটা পরচুলার ব্যবসায়ী, যুদ্ধের কী বোঝে ও?' বিরক্ত গলায় বললেন লঁতেনাক। 'মৃত্যুর সময় কারও উপরে জোর খাটানোটা ছোটলোকী ছাড়া আর কিছু না।'

'আমরা আপনার আদেশের অপেক্ষায় রয়েছি, জেনারেল,' পাশ থেকে বলে উঠল গ্যাভা।

'ফুজের জঙ্গলে যাব আমরা,' বললেন লঁতেনাক। 'সবাইকে রওনা করিয়ে দাও।'

'ধরে নিন রওনা হয়েই গেছে।'

'ভাল,' মাথা ঝাঁকালেন লঁতেনাক। 'আচ্ছা, তুমি না বলছিলে এখানকার লোকে নীলদলের সৈন্যদের সাদরে বরণ করে নিয়েছিল?'

'জী, জেনারেল।'

'খামার তো পুড়িয়ে দিয়েছ। গ্রামটা?'

'ওটার কিছু করিনি, সেনিয়োখ্।'

'তা হলে এখুনি গিয়ে আগুন লাগাও,' কঠিন গলায় বললেন লঁতেনাক। 'যারা নীলদলকে সাহায্য করবে, তাদেরকে কোনও রকম দয়া দেখানো চলবে না। যাও!'

সৈন্যদের কাছে গিয়ে দ্রুত জেনারেলের আদেশ শোনাল গ্যাভা। তারপর ফিরে এল তাঁর কাছে। বলল, 'বন্দিদের ব্যাপারেও আপনার আদেশ প্রার্থনা করছি, জেনারেল।'

'কীসের বন্দি?'

'খামারে যাদেরকে পেয়েছি। দেড়শো লোক ছিল ওখানে, পরাজয় নিশ্চিত জেনে তাদের কেউ কেউ আত্মসমর্পণ করেছে।'

'ওরা কার লোক?'

'সন্ত্যাখের, সেনিয়োখ্।'

দাঁতে দাঁত পিষলেন লঁতেনাক। 'সন্ত্যাখ্? শয়তানটা রাজার মাথা কাটার সময় ঢোল বাজাবার হুকুম দিয়েছিল! এরা তা হলে প্যারিসের ব্যাটালিয়ন?'

'আধা-ব্যাটালিয়ন, সার।'

‘নাম কী এই ব্যাটালিয়নের?’

‘পতাকায় বুলে-হুজ বাহিনী লেখা ছিল।’

‘জানোয়ারের দল!’ ক্রুদ্ধ গলায় বললেন লঁতেনাক। ‘সকক’টাকে শেষ করে দাও!’

‘আহতদেরও?’

‘হ্যাঁ।’

‘দু’জন মহিলা আছে...’

‘সবাইকে খতম করবে তুমি, গ্যাভা... সব্বাইকে!’

‘তিনটা বাচ্চাও যে আছে!’

‘ওদেরকে সরিয়ে নিয়ে যাও। পরে ভেবে দেখব কী করা যায় ওদের নিয়ে।’

কথা শেষ করে ঘোড়ার লাগামে ঝটকা দিলেন লঁতেনাক, বাহনকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়ে চলে গেলেন ওখান থেকে।

সারাদিনের ভিক্ষাবৃত্তির শেষে শ্লথ পায়ে বাড়ি ফিরছে ভিখিরি তেলমাখ্‌শ। চারপাশের পাহাড়, বন বা জলাশয়... কোনোদিকে মনোযোগ নেই। শুধু এগিয়ে চলেছে একাগ্র ভঙ্গিতে। বয়স হয়েছে বলে দ্রুত হাঁটতে পারছে না, লাঠিতে ভর দিয়ে কষ্টেসৃষ্টে এগোচ্ছে সে। বেছে নিয়েছে একটা শর্টকাট রাস্তা, যাতে বেশি পথ হাঁটতে না হয়।

মেসি পার হয়ে ফাঁকা একটা মাঠে বেরিয়ে এল সে। ওখান থেকে অবাধে বহুদূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে। সমুদ্রকূলবর্তী গোটা পশ্চিম দিগন্ত স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয় তার চোখের সামনে।

হঠাৎ আকাশে একরাশ ধোঁয়া দেখতে পেল তেলমাখ্‌শ। ও জানে, ধোঁয়া সাধারণত দু’রকম হয়—ধোঁয়ার রঙ আর ঘনত্ব দেখেই বোঝা যায়, ওটা ঘরের চুলোর ধোঁয়া, নাকি ধ্বংসাত্মক

কোনও অগ্নিকাণ্ডের সঙ্কেত। নির্জন এলাকায় ধোঁয়া দেখে পথিক আশান্বিত হয়, ভাবে ধারেকাছে মানুষের বসতি আছে; আবার তা কোনও অগ্নিকাণ্ডজনিত ধূম্ররাশি ভেবে সে ভীতও হয়ে পড়তে পারে।

এই মুহূর্তে যে-ধোঁয়া দেখছে তেলমাখ্‌শ, তা চুলোর ধোঁয়া নয়। কুচকুচে কালো ধোঁয়া... পাক খেয়ে উঠছে আকাশের দিকে... তার ভিতরে মাঝে মাঝেই নেচে উঠছে লালচে কমলা অগ্নিশিখা। লিখ্‌-বন-পাইয়ের উপরে ভাসছে ওই ধোঁয়া... কখনও কমছে, কখনও বাড়ছে।

দিক পাল্টে ধোঁয়ার দিকে রওনা হলো তেলমাখ্‌শ। কী ঘটেছে ওখানে, জানা দরকার।

খামার আর গ্রাম সংলগ্ন ছোট একটা টিলার উপরে খানিক পরেই পৌঁছে গেল সে। ওখান থেকে দুটোই পরিষ্কার দেখা যায়। যে-দৃশ্যটা ফুটে উঠল তার চোখের সামনে, তা একই সঙ্গে বেদনাদায়ক ও মর্মান্তিক। পাথরের মত স্থির হয়ে গেল তেলমাখ্‌শ।

গ্রাম বা খামারটার চিহ্ন নেই সামনে। তার বদলে রয়েছে শুধু আগুন আর আগুন। লেলিহান শিখা গ্রাস করেছে সবকিছুকে, জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে একাকার করে দিচ্ছে। মাঝে মাঝে বাতাসের তোড়ে ধোঁয়া সরে গেলে দেখা যাচ্ছে ঘর-বাড়ির জ্বলন্ত কাঠামো, পুড়তে পুড়তে ধসে পড়ছে মাটিতে। শুধু ঘর-বাড়িই নয়, আশপাশের গাছপালাতেও ধরেছে আগুন, বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে পোড়া গন্ধ।

আগুনের দিকে তাকিয়ে কান পেতে রইল তেলমাখ্‌শ, যদি কারও আর্তচিৎকার শোনা যায়! কিন্তু হাওয়া আর আগুনের ক্ষীণ আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পেল না সে। তা হলে কি গ্রাম

ছেড়ে পালিয়ে গেছে সবাই? খামারের লোকেরাই বা কোথায়?

টিলা থেকে ধীরে ধীরে নেমে এল তেলমাখ্‌শ। আগুনে পোড়া ঘরগুলোর দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখে এগিয়ে চলল সে। জ্বলন্ত নরকের মাঝে চলমান এক প্রেতের মত দেখাচ্ছে ওকে।

খামারের ফটক পেরুল বৃদ্ধ ভিখিরি, আঙিনায় পা রাখল। আর তখুনি পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে পারল সে। শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে গেল শীতল এক স্রোত।

আঙিনার ঠিক মাঝখানে কালো স্তূপের মত পড়ে আছে অনেকগুলো মানুষ—আগুনের আভায় আলোকিত হয়ে আছে তাদের নিস্পন্দ দেহ। শরীর থেকে বেরিয়ে মাটির উপর দিয়ে গড়িয়ে গেছে রক্তের ধারা, তৈরি হয়েছে যেন লালচে এক পুকুর। মানুষগুলো মৃত!

ধাতস্থ হয়ে একে একে কয়েকটা লাশ পরীক্ষা করল তেলমাখ্‌শ। নীল রঙের ইউনিফর্ম সবার পরনে—তার মানে প্রজাতন্ত্রী সৈনিক। পায়ে জুতো নেই কারও, অস্ত্রও কেড়ে নেয়া হয়েছে। মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে আছে সৈনিকরা, গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেয়া হয়েছে সবাইকে। খুনিরা মৃতদেহ সৎকারের ঝামেলায় যায়নি। যেভাবে পড়ে ছিল, সেভাবেই ফেলে গেছে লাশগুলোকে।

দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তেলমাখ্‌শের বুক চিরে। সবল-সতেজ এতগুলো মানুষ... গতকালও ঘুরে বেড়িয়েছি এই আঙিনায়... অথচ আজ কী ভঙ্গিতেই না পড়ে আছে মাটির বুকে। চলে যাওয়ার জন্য উল্টো ঘুরতে শুরু করল সে, আর তখুনি চোখ চলে গেল আঙিনার একপ্রান্তের ভাঙা দেয়ালের দিকে। দেয়ালের ধ্বংসস্তূপের তলা থেকে দু'জোড়া পা বেরিয়ে আছে। জুতো পরা পা, সৈনিকদের চেয়ে ছোট। মেয়েমানুষ?

চমকে উঠল তেলমাখ্‌শ। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল সেদিকে। দেয়ালের ইঁট-পাথর সরিয়ে বের করে আনল মেয়েদুটোকে। একজনের গায়ে নীল ইউনিফর্ম দেখল সে, পাশে পড়ে আছে একটা ভাঙা পিপে। নিশ্চয়ই দলটার ভিভাঁদিয়ের, অনুমান করল সে। মাথায় চারটা গুলি লেগেছে তার, মারা গেছে সঙ্গে সঙ্গে।

দ্বিতীয় মেয়েটির দিকে নজর দিল বৃদ্ধ ভিখিরি। সৈন্যদলের কেউ বলে মনে হচ্ছে না, পোশাক-আশাক সাধারণ গ্রাম্য নারীর মত। কাঁধে গুলি লেগেছে—আঘাত ততটা মারাত্মক নয়। নাড়ি দেখল সে, দুর্বলভাবে চলছে হৃৎপিণ্ড। বেঁচে আছে মেয়েটা!

সাহায্যের আশায় চারদিকে তাকাল তেলমাখ্‌শ। চেঁচিয়ে উঠল, 'কেউ আছ এখানে? সাহায্য করো আমাকে!'

'কে ওখানে? কাইমঁদ... তুমি?' দূর থেকে ভেসে এল একটা গলা।

'হ্যাঁ। জলদি এসো!'

ভাঙা দেয়ালের ওপার থেকে উঁকি দিল ভয়ার্ত একটা মুখ। খানিক পর দেখা গেল আরেকজনকে। পুরো গ্রামে এই দু'জনই শুধু বেঁচে গেছে—সময় থাকতেই লুকিয়ে পড়েছিল ওরা।

তেলমাখ্‌শের হাতছানিতে খামারের আঙিনায় ঢুকল দুই গ্রামবাসী। অজ্ঞান মেয়েটির উপর নজর পড়ল ওদের। একজন জিজ্ঞেস করল, 'ও কি বেঁচে আছে?'

'হ্যাঁ,' বলল তেলমাখ্‌শ।

'অন্যজন?'

'না,' মাথা নাড়ল তেলমাখ্‌শ। 'কারা এসব ঘটিয়েছে, তোমরা দেখেছ?'

'আমি দেখেছি,' বলে উঠল দ্বিতীয় গ্রামবাসী। 'বাড়ির ভাঁড়ারে লুকিয়েছিলাম আমি, ওখানকার ফোকর দিয়ে দেখতে

পেয়েছি সব। অমানুষ... স্রেফ অমানুষ ছিল লোকগুলো। সবাইকে এক সারিতে দাঁড় করিয়ে নির্বিচারে গুলি করল। পুরুষদের তো বটেই, মেয়েদেরও! এই মেয়েটার ছোট ছোট তিনটা বাচ্চা আছে, তাদেরকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে শয়তানগুলো, তারপর গুলি করেছে ওকে।'

'তুমি কি এখন ওকে বাঁচাবার চেষ্টা করবে, কাইমঁদ?' জিজ্ঞেস করল প্রথমজন।

'অবশ্যই,' জোর গলায় বলল তেলমাখ্‌শ। 'এসো, সাহায্য করো আমাকে। ওকে আমার কুটিরে নিয়ে যাব।'

গাছের ডালপাতা দিয়ে একটা স্ট্রেচার তৈরি করল ওরা। মেয়েটিকে তোলা হলো তাতে। দুই গ্রামবাসী ধরল সেই স্ট্রেচার, তাদের পিছু পিছু এগোল বৃদ্ধ ভিখিরি।

হাঁটতে হাঁটতে চারদিকের ধ্বংসযজ্ঞ আরও ভালভাবে দেখতে পেল ওরা। গ্রামের একটি বাড়িও অক্ষত নেই। ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে সবখানে। দেখতে দেখতে শরীর শিউরে উঠল ওদের।

'কী ভয়ানক!' বলে উঠল প্রথম লোকটা। 'এখন থেকে কি এই অনাচারই দেখতে হবে আমাদের?'

'লম্বামতন ওই বুড়ো লোকটার হুকুমে ঘটেছে এসব,' বলল দ্বিতীয়জন।

'আমি তাকে দেখিনি। কী হুকুম দিয়েছিল?'

'বলেছিল, মারো... পোড়াও... কাউকে দয়া দেখিয়ো না!'

'কে এই লোক?'

'উনি একজন মাহ্‌খি। সত্যি বলতে কী... আমাদেরই মাহ্‌খি!'

'আমাদের মাহ্‌খি!' ভুরু কোঁচকাল তেলমাখ্‌শ। 'কী নাম

তার?'

'মাহ্‌খি দু লঁতেনাক।'

চেহারা থমথমে হয়ে গেল বৃদ্ধ ভিখিরির। 'প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছ তুমি, লঁতেনাক,' বিড়বিড় করল সে। 'তোমাকে সাহায্য করে মস্ত ভুল করেছি আমি!'

সাত

রাজধানী প্যারিস।

এখানে প্রকাশ্য জীবনযাপন করছে মানুষ, আড়াল-আবডাল বা লুকোছাপার বালাই নেই তাদের মাঝে। বাড়ির বাইরে পাতা টেবিল থেকে খাবার খায় সবাই। মেয়েরা গির্জার সিঁড়িতে বসে মার্সাইয়ের গান গায়। পার্ক মোনসু আর লুক্সেমবার্গের বাগান এখন প্যারেডের ময়দান রাস্তার মোড়ে মোড়ে গড়ে উঠেছে অস্ত্রের কারখানা, সেখানে পথিকদের চোখের সামনে তৈরি হচ্ছে নানা ধরনের মারণাস্ত্র পথিকরা আবার হাততালি আর জয়ধ্বনি দিয়ে প্রশংসা করছে অস্ত্র-নির্মাতাদের সবার মুখে একই কথা—*ধৈর্য ধরো, আমাদের বিপ্লব সফল হতে চলেছে।* গর্বের হাসি হাসে ওরা। মনের আনন্দে বিনোদনের জন্য তারা ঘুরে বেড়ায় বিভিন্ন নাট্যশালায়, যেখানে বিপ্লব-ভিত্তিক নানা ধরনের নাটক চলছে।

পরিস্থিতি যে খুব ভাল তা নয়। জার্মানরা প্যারিস আক্রমণের দ্বারপ্রান্তে বলে গুজব রটেছে। তারপরেও ভীত নয় কেউ। ভয় যদি কেউ পায় তো পাবে প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধবাদীরা। নতুন একটা আইন চালু করা হয়েছে, সন্দেহভাজন যে-কাউকে ধরে গিলোটিনে চড়াতে পারে সরকার। বিচার-আচারের প্রয়োজন নেই। তাই বলে দুশ্চিন্তায় ভুগছে না কেউ। লাল টুপি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে সবাই—ওই টুপি প্রজাতন্ত্রীদের প্রতীক।

পুরো প্যারিস শহরই আসলে অদ্ভুত এক ব্যস্ততায় সচল হয়ে আছে। মনিহারী দোকানগুলোতে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদের প্রতীক হিসেবে বিক্রি করা হচ্ছে রাজার ব্যবহৃত হরেক রকম জিনিস। কাপড়ের দোকানে বিক্রি হচ্ছে প্রজাতন্ত্রীদের পোশাক, এমনকী রাস্তার ফেরিঅলারাও ঘুরে ঘুরে বিক্রি করছে প্রজাতন্ত্রী সৈনিকদের উপযোগী জুতো আর বুট। যেদিকেই তাকানো যাক, চোখে পড়বে বিপ্লবী চার নেতা—ফ্রাঙ্কলিন, হুসো, ব্রুটাস আর মাহা-র অসংখ্য আবক্ষ মূর্তি। রাজপ্রাসাদের সামনে ঝলমলে রঙে আঁকা হয়েছে বিশাল এক পেইন্টিং—তাতে রাজা ষোড়শ লুইকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাবার দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

বড় বড় অনেক দোকান খোলা, কিছু আবার বন্ধ। খবরের কাগজের ফেরিঅলারা কাগজ বিক্রি করছে পথে পথে। বেড়ে গেছে পথগায়কের সংখ্যা। বিপ্লবের গান গাইতে গাইতে তারা ঘুরে বেড়ায় সারা শহরময়। বদলে ফেলা হয়েছে বহু জায়গা আর রাস্তার নাম—রু রিশেলু হয়ে উঠেছে স্ট্রিট অভ দ্য ল, মানে আইনের সড়ক... ফুঁবু সন্তোয়া হয়ে গেছে ফুঁবু অভ গ্লোরি, মানে বিজয়ের উপনগর। বাস্তিলের মূর্তি সরিয়ে বসানো হয়েছে প্রকৃতির ভাস্কর্য। প্রায় প্রতিদিনই গিলোটিনে চড়ানো হচ্ছে কাউকে না কাউকে। সে-দৃশ্য দেখবার জন্য এত লোক জড়ো

হয় যে, ঠাট্টা করে বধ্যভূমিকে লাল প্রার্থনাসভা বলে আখ্যা দিচ্ছে মানুষ।

দল বেঁধে সামরিক স্কুলে যায় তরুণেরা—ওদেরকে বলা হয় যুদ্ধের দেবতা মার্সের ছাত্র... খুবেস্পিয়া-র ভৃত্য। বিপ্লবী যুবকেরা প্রথাগত বিবাহপদ্ধতিকে মানে না, তারা কোনও বরকনে-কে রাস্তা দিয়ে যেতে দেখলেই পথরোধ করে দাঁড়ায়, ঠাট্টা-মশকরা করে।

শহরে এখনও তাসের আসর বসে, কিন্তু কার্ড থেকে বদলে দেয়া হয়েছে রাজা-রানির ছবি। রাজার জায়গায় এখন দৈত্যের ছবি, রানির বদলে স্বাধীনতার দেবী। রাজতন্ত্রের অবসান ঘটানোর পর এভাবেই বাড়াবাড়ি করে চলেছে বিপ্লবীরা।

বিপ্লবের ধাক্কায় অনেকের পেশাগত বৃত্তিরও পরিবর্তন ঘটে গেছে। অনেক নাপিত চুলকাটা ছেড়ে মাংস বিক্রি করছে, সাধারণ দোকানে বিক্রি হচ্ছে বিপ্লবের বাণীসমৃদ্ধ চটি বই। খোলা রাস্তায় প্রকাশ্যে বিক্রি হচ্ছে মদ, তার জন্য দেয়া হচ্ছে চটকদার বিজ্ঞাপন। এক নাপিত এমনটা ঘোষণা দেবার সাহস পাচ্ছে, সে যাজক আর সম্ভ্রান্তবংশীয়দের চুল কাটবে না।

খাবারের অভাব রয়েছে শহরে। দাম বেড়ে গেছে রুটি, কয়লা, তরিতরকারি আর মাংসের। এক পাউণ্ড ভেড়ার মাংস মানুষকে কিনতে হচ্ছে পনেরো ফ্রাঁ দিয়ে! তাও কসাইখানা আর খাবারের দোকানের সামনে দিনভর লম্বা লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকে মানুষ। দাম যা-ই হোক, খাবার তো চাই!

এতসব দুঃখকষ্ট জনগণ সহ্য করে চলেছে হাসিমুখে। কারণ তারা রাজতন্ত্রের অবসান ঘটাতে পেরেছে, সমাপ্তি ঘটিয়েছে শ্রেণী-বৈষম্যের, ফিরে পেয়েছে স্বাধীনতা। স্বেচ্ছায় দলে দলে লোক যোগ দিচ্ছে সেনাবাহিনীতে—সদ্য-অর্জিত বিজয়কে অক্ষুণ্ন

রাখবার আশায়। মেনে নিচ্ছে নব্য ও উঠতি নেতাদের নেতৃত্ব। এসব নেতাদের মধ্যে একজনের কথা না বললেই নয়। তার নাম সিমুর্দা।

বিবেকবান মানুষ এই সিমুর্দা—নিজ নীতিতে অবিচল, সেই সঙ্গে অতি গম্ভীর প্রকৃতির একজন মানুষ। এককালে গেঁয়ো এক গির্জার যাজক ছিল সে, আশ্রিত ছিল অন্যের বাড়িতে। পরবর্তীতে উত্তরাধিকারসূত্রে কিছু সম্পত্তির মালিক হয়ে স্বাধীন জীবনযাপন করতে শুরু করে।

একরোখা মানুষ সিমুর্দা। মানুষ যেমন কোনও কাজের জন্য সাঁড়াশি ব্যবহার করে, ঠিক সেভাবে নিজের চিন্তাচেতনাকে ব্যবহার করে সে। মাথায় কোনও ভাবনা এলে সেটাকে কাজে পরিণত না করা পর্যন্ত চিন্তার সাঁড়াশি দিয়ে ধরে রাখে।

চিরকুমার... বিয়ে-থা করেনি, জ্ঞানার্জনের পিছনে উৎসর্গ করে দিয়েছে যৌবন। যথেষ্ট পড়াশোনা তার, ইয়োরোপের প্রধান প্রধান প্রায় সবক'টা ভাষাই জানে। শিক্ষার আলো দূর করে দিয়েছে তার মনের ধর্মীয় গোঁড়ামি। খুলে দিয়েছে মনের চোখ।

রাজার শাসনে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দেখে মনে মনে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে সিমুর্দা। ঘৃণা করতে শুরু করে মিথ্যাচার, শোষণ, আর ধর্মের নামে বাড়াবাড়িকে। বুঝতে পারে, যতদিন দেশে রাজতন্ত্র থাকবে, মানুষের ভাগ্য বদলাবার সুযোগ নেই। তার জন্য বড় কোনও পরিবর্তনের অপেক্ষায় প্রার্থনা করত সে।

১৭৮৯ সালে এসে গেল সেই সুযোগ—শুরু হলো রাজার বিরুদ্ধে বিপ্লব। যাজকের কাজ ছেড়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাতে মনপ্রাণ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সিমুর্দা। যুদ্ধের কঠোরতার সঙ্গে অল্প সময়েই নিজেকে মানিয়ে নেয় সে, ওখানে দুর্বলের কোনও

স্থান ছিল না। ফলাফল, একনিষ্ঠ ও সফল বিপ্লবী হিসেবে পরিচিতি। ঊননব্বুইয়ে বাস্তিলের পতন, জনগণের উৎপীড়নের অবসান, সামন্তবাদের সমাপ্তি, রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ, এবং অবশেষে বিরানব্বুইয়ে প্রজাতন্ত্রের জন্ম... এই সবকিছুই সে দেখেছে নিজ দু'চোখে। বিপ্লবের জোয়ারে কখনোই ঘাবড়ে যায়নি সে, বরং তার অংশ হতে পেরে নতুন এক যৌবন অনুভব করেছে নিজের ভিতরে... এই পঞ্চাশ বছর বয়সেও।

হাজারো বাধা-বিঘ্ন আর সংগ্রাম অতিক্রম করে এখন শুরু হয়েছে ১৭৯৩ সাল। ফ্রান্সের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বছর—প্রজাতন্ত্র লড়ছে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখবার জন্য। সমগ্র ইয়োরোপ ফ্রান্সকে আক্রমণ করতে উদ্যত, আবার গোটা দেশ আক্রমণ করছে প্যারিসকে... সব মিলিয়ে জটিল এক পরিস্থিতি। বিপ্লবের অতি সাধারণ এক গল্পকে মহাকাব্যে পরিণত করতে চলেছে ১৭৯৩। যেন এক প্রচণ্ড ঝড়ে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে গোটা মহাদেশ।

কিন্তু শান্ত রয়েছে সিমুর্দা—প্রচণ্ড ঝঞ্ঝার মাঝে সামুদ্রিক পাখির মত স্থির ও অচঞ্চল। অমিত আত্মবিশ্বাস আছে বুকে—এই ঝড় বেশিদিন টিকবে না... কোনও ক্ষতিও করতে পারবে না তার।

মন থেকে দয়ামায়া বিসর্জন দিয়েছে সে। স্বেচ্ছায় এমন সব কাজ বেছে নেয়, যা হাতে নিতে ভয় পায় অন্যেরা। যেসব মহৎ কাজের বাহ্যিক রূপটা খারাপ, যেসব কাজ আপাতদৃষ্টিতে কঠিন... সেগুলোই করবার জন্য আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে যায় সিমুর্দা। ফলে প্যারিসের একটা অঞ্চলে বিশেষভাবে জনপ্রিয় সে। তার জনপ্রিয়তা এতই বেশি যে ভীত, আর্ত ও উৎপীড়িত জনগণ তার সব কথা মানে ও শোনে।

একই সঙ্গে পণ্ডিত ও মূর্খ বলা চলে তাকে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক কিছুই জানে ও বোঝে সিমুর্দা, কিন্তু বাস্তব জীবনের অনেক বিষয়েই সে একেবারে অজ্ঞ। হোমারের থেমিসের মত চোখদুটো যেন বাঁধা তার। এক অন্ধ নিশ্চয়তায় আশ্বস্ত ও আশান্বিত হয়ে তীর ছুঁড়তে অভ্যস্ত সে। সেই তীর লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত হানুক বা না-ই হানুক, সরলপথে চলবে। সিমুর্দাও ঠিক সেভাবেই স্থির লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যায়। সে জানে না, বিপ্লবের সময় এই সরলরেখাঙ্কিত পথটাই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর... সবচেয়ে মারাত্মক।

সিমুর্দা কনভেনশন, কমিউন কিছুই মানে না। সে *ইভেশি*-র সদস্য। ওটা অদ্ভুত এক সংগঠন, যেখানে ন্যায়-নীতি বা নিয়মকানুনের তোয়াক্কা নেই। শুধু প্যারিসের লোক নয়, বাইরের বহু সদস্যও রয়েছে এর। ওরা শুধু অস্ত্রের ভাষা বোঝে, বিশ্বাস করে চরম পন্থায়। বিপ্লবীদের হিংসার অবাধ উন্মত্ততাকে প্রশ্রয় দেবার জন্যই এই সংগঠনের জন্ম। কাজ বা শক্তি প্রদর্শনের দিক থেকে ইভেশি-র তুলনায় কনভেনশন বা কমিউন একেবারেই ম্লান... একেবারেই দুর্বল। সিমুর্দার বিশ্বাস, নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে-কোনও পথই ন্যায়সঙ্গত; তার এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে একমাত্র ইভেশি-র নীতি মেলে।

একনিষ্ঠা আর কঠোর পরিশ্রমের ফলে সংগঠনের উঁচু পদে উঠে এসেছে সে। বহুভাষী হওয়ায় একটা সুবিধাও রয়েছে তার। ইভেশি-র স্প্যানিশ, ইটালিয়ান, ইংরেজ ও অস্ট্রিয়ান সদস্যের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ তার মাধ্যমেই সারা হয়। ওদের মাঝে অনৈক্য দূর করে ঐক্য বজায় রাখাবার গুরুদায়িত্ব পালন করে সিমুর্দা। তার কাজ যেমন জটিল, তার পদটাও তেমনই সুদৃঢ়। সবাই তাকে সমঝে চলে।

ধীরে ধীরে দুরধিগম্য গুণের মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠেছে সে, হয়ে উঠেছে নির্দয় ন্যায়বিচারক। বিপ্লবের মুখে দ্বিচারী হবার সুযোগ নেই কারও। যে-পথই বেছে নেয়া হোক, সেটা থেকে ফিরে আসার উপায় থাকে না। হয় নির্দয়, নাহয় মহৎ—যে-কোনও একটা দৃষ্টিভঙ্গি নিতে হয়। সিমুর্দা বেছে নিয়েছে নির্দয়ের পথ, কিন্তু সেই নির্দয়তার মাঝে কোথায় যেন মহত্ত্বের লেশ লুকিয়ে আছে। তার সাফল্যের রহস্য ওখানেই।

এমনিতে দেখতে-শুনতে একেবারে সাধারণ মানুষ সিমুর্দা। আটপৌরে পোশাক পরে সে, জাঁকজমক নেই তাতে। যৌবনে মাথায় প্রচুর চুল ছিল, কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সেখানে দেখা দিয়েছে মস্ত এক টাকের। টাকের চারপাশে সামান্য যে ক'টা চুল আছে, তাও পেকে দুধসাদা হয়ে গেছে। কপালটা বেশ চওড়া, তা দেখে স্বভাব-চরিত্রের অনেককিছুই বলে দেয়া যায়। তীব্র এক আবেগ কাজ করে তার ভিতরে, কথা বলে অতি দ্রুত, কণ্ঠে মিশে থাকে আশ্চর্য এক কর্তৃত্বের ছাপ। চেহারায় সর্বক্ষণ ফুটে থাকে তিক্ততা আর বিষাদ, দৃষ্টি যেমন স্বচ্ছ তেমনই গভীর। তাকালেই বুকের ভিতর গুমরে মরতে থাকা এক অব্যক্ত ক্রোধের আভাস পাওয়া যায়।

এইসব মিলিয়েই সিমুর্দা... বিপ্লবীদের অদ্বিতীয় এক নেতা।

আজ তার নাম জানে না কেউ। ইতিহাসে এমন বড় বড় বহু ব্যক্তিরই উল্লেখ নেই।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, এমন মানুষের ভিতরে কি মানবীয় গুণাবলী থাকে? যে-মানুষ সমগ্র মানবজাতির সেবক, তার মধ্যে কি বিশেষ কোনও মানুষের প্রতি ভালবাসা থাকতে পারে? বিশাল সে-আত্মার ভিতরে কি হৃদয় বলে কিছু আছে? যে-আত্মা নির্বিশেষে সব মানুষকে আলিঙ্গন করে, সে-আত্মা কি সামান্য

একজন মানুষকে আলিঙ্গন করবার জন্য ধরণীতে নেমে আসতে পারে?

হ্যাঁ, পারে। অন্তত সিমুর্দা তা পেরেছিল।

যৌবনে এক ধনী লোকের প্রাসাদোপম বাড়িতে গৃহশিক্ষকতার কাজ করত সে। গৃহকর্তার একমাত্র ছেলেটি ছিল তার ছাত্র। তাকে ভালবেসে ফেলে সিমুর্দা... শ্রেণীগত বৈষম্যের কথা ভুলে গিয়ে। তার নিঃসঙ্গ জীবনের সবটুকুই আবর্তিত হতে থাকে ওই ছেলেটিকে ঘিরে। পিতা, ভাই ও শিক্ষক হিসেবে তাকে ভালবেসে চলে সিমুর্দা, আপন সন্তান না হলেও মানসচোখে তাকে সন্তানের মতই দেখত সে। তার এই আত্মিক ও আধ্যাত্মিক পিতৃত্বই ছেলেটির সঙ্গে অক্ষয় এক বন্ধনে জড়িয়ে ফেলে তাকে। তাকে দেখলেই মনেপ্রাণে বয়ে যেত স্নেহ আর ভালবাসার জোয়ার।

বাঁধনটা আরও গাঢ় হলো হঠাৎ করে ছেলেটির বাবা-মা দুর্ঘটনায় মারা যাওয়ায়। অভিভাবক বলতে অন্ধ এক দাদী আর দূর সম্পর্কের এক চাচা ছাড়া আর কেউ ছিল না তার। তাদের কেউই ছেলেটির কাছে থাকত না। ফলে অলিখিতভাবে সিমুর্দাই হয়ে ওঠে তার সত্যিকার অভিভাবক।

এক হাতে ছেলেটিকে লালন-পালন করেছে সে। একবার ভয়ানক অসুখে পড়লে সিমুর্দাই দিনরাত সেবা করে বাঁচিয়ে তুলেছিল তাকে। ওর কাছ থেকে ছেলেটি শুধু শিক্ষা-দীক্ষাই পায়নি, বরং নতুন জীবনও পেয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্নেহ-ভালবাসার এই সম্পর্কের পরিণতি গড়াল বিচ্ছেদে।

বড় হয়ে উঠল ছেলেটি, গৃহশিক্ষকের প্রয়োজন রইল না আর। সিমুর্দাকে বিদায় করে দেয়া হলো ওই বাড়ি থেকে। যে-শিশুকে পরম যত্ন আর স্নেহের সঙ্গে লালন করে এসেছে, যে

ছিল তার হৃদয়ের ধন... তাকেই ছেড়ে আসতে বাধ্য হলো সে। ফিরে আসতে বাধ্য হলো তার পুরনো জীবনে—গির্জার যাজকের জীবন। ছেলেটি তার পড়া শেষ করে সেনাবাহিনীতে যোগ দিল, ক্যাপ্টেনের পদ নিয়ে চলে গেল এক সেনানিবাসে। আর কোনোদিন তার দেখা পায়নি সিমুর্দা।

তারপর এল বিপ্লব। সিমুর্দা যোগ দিল তাতে। মনপ্রাণ ঢেলে দিল মুক্তির সংগ্রামে। তাই বলে যাকে সে শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত লালন করেছে, তার কথা কখনো ভুলে যায়নি এই দুর্ধর্ষ বিপ্লবী। বাইরে যতই কঠোর ও নির্দয় দেখাক তাকে, অন্তরের গহীনে এখনও সেই ছাত্রটির জন্য ভালবাসার ফল্গু বইছে তার।

এই সুপ্ত ভালবাসার কারণে কি শেষ পর্যন্ত নিজের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হবে সিমুর্দা?

তা আমরা যথাসময়ে জানব।

আট

রু দু পঁ-তে একটা শুঁড়িখানা আছে, পোশাকি ভাষায় বলে কাফে। সেই শুড়িখানার পিছনদিকে একটি বিশেষ কামরায় চলে গোপন সভা—ক্ষমতাবান অনেক লোক পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, বিনিময় করে খবরাখবর, করে শলাপরামর্শ। কামরাটা

বিখ্যাত... বলা হয়ে থাকে, ওখান থেকেই নাকি সূচনা হয়েছিল ফরাসি বিপ্লবের।

২৮ জুন, ১৭৯৩।

বিশেষ সেই কামরায়, একটা টেবিল ঘিরে বসে আছে তিনজন মানুষ, চতুর্থ চেয়ারটা খালি। রাত আটটা বাজে, কাফেতে জ্বলছে কৃত্রিম আলো, কিন্তু কামরার ভিতরে বিরাজ করছে অন্ধকার। একটামাত্র তেলের বাতির সাহায্যে শুধু টেবিলটা আলোকিত করা হয়েছে, বাকি সব ঢাকা পড়ে আছে ছায়ায়।

টেবিল ঘিরে বসে থাকা তিনজনের মধ্যে একজন বয়সে যুবক। চোখে নিরুত্তাপ দৃষ্টি, পাতলা এক জোড়া ঠোঁট। থমথম করছে তার চেহারা, দেখে মনে হয় হাসি কী জিনিস জানে না। সুবেশী, হাতে দস্তানা। গায়ে নিভাঁজ নীল কোট, তলায় সুতি ঝালরঅলা জামা। পায়ে সাদা মোজা আর রূপার বকলেস দেয়া জুতো।

বাকি দু'জনের ভিতর একজন বিশালদেহী, অন্যজন খর্বকায়। বিশালদেহীর পরনে ময়লা পোশাক। লাল রঙের কোট পরেছে সে। নেকটাই না বাঁধায় কোটের কলার ঝুলে পড়েছে, উন্মুক্ত হয়ে আছে গলা আর ঘাড়। বোতামও লাগায়নি কোটের, হাঁ হয়ে আছে ল্যাপেল হিলঅলা জুতো পায়ে; মাথায় রুক্ষ, অবিন্যস্ত চুল। মুখভর্তি গুটি গুটি বসন্তের দাগ। কুঞ্চিত ভুরু, মোটা ঠোঁট। হাতদুটো চওড়া, শক্তিশালী।

খর্বকায় লোকটি বেশ ফর্সা। বসে থাকা অবস্থায় কুঁজো দেখাচ্ছে তাকে। চোখদুটো রক্তলাল, যেন নেশা করেছে। মুখটা দাগে ভরা। রুমাল বেঁধে চুল ঢেকে রেখেছে। ছোট্ট কপালঅলা চেহারাটা নিষ্ঠুর, মায়াহীন। ঢোলা একটা পায়জামা পরেছে সে.

উপরে ওয়েস্টকোট, পায়ে সাধারণ চটি জুতো। কোমরে গুঁজে রেখেছে একটি ছোরা।

ফ্রান্সের সবাই চেনে এই তিনজনকে। বিপ্লবের তিন প্রধান নেতা—ম্যাক্সিমিলিয়ে দু খুবেস্পিয়া, জর্জেস দান্তঁ আর জাঁ-পল মাহা।

কামরায় আর কেউ নেই। গ্লাস আর মদের বোতল নিয়ে বসেছে দান্তঁ, মাহার সামনে এক কাপ কফি, খুবেস্পিয়া নাড়াচাড়া করছে কিছু কাগজপত্র। দোয়াতে রাখা কলম তুলে মাঝে মাঝে কিছু লিখছে সে। টেবিলের মাঝখানে বিছিয়ে রাখা হয়েছে পুরো ফ্রান্সের একটা মানচিত্র। কামরার দরজায় পাহারায় রয়েছে মাহা-র ব্যক্তিগত দেহরক্ষী লুহোঁ বাস।

অনেকক্ষণ থেকেই আলোচনা চলছে তিন বিপ্লবী নেতার মাঝে। কখনও কখনও চড়া সুরে উঠে যাচ্ছে তাদের কণ্ঠ, মনে হতে পারে বুঝি ঝগড়া করছে ওরা। এক পর্যায়ে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল দান্তঁ।

বলল, 'বন্ধুগণ, মস্ত বিপদের মধ্যে আছে প্রজাতন্ত্র... এর চেয়ে জরুরি আর কিছুই হতে পারে না। একটা ব্যাপার নিয়েই শুধু মাথা ঘামাতে হবে, ফ্রান্সকে কীভাবে শত্রুর কবল থেকে রক্ষা করা যায়। আর সেজন্যে যে-কোনও পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে, তা যত ভয়ঙ্করই হোক না কেন। নরম-সরম কোনও পথ বেছে নিতে পছন্দ করি না আমি, যা করবার তা শক্ত হাতে করি। তা ছাড়া কোনও সন্দেহ নেই, এখন আমাদেরকে নির্মম হতে হবে। পিষে ফেলতে হবে শত্রুদের, যাতে দ্বিতীয়বার কেউ আমাদের উপর হামলা চালাবার সাহস না পায়।'

'আমার তাতে আপত্তি নেই,' বলল খুবেস্পিয়া। 'কিন্তু প্রশ্ন হলো, শত্রুরা কোথায়?'

'দেশের বাইরে,' বলল দান্তঁ, 'ওদেরকে কিছুতেই ভিতরে ঢুকতে দেয়া যাবে না। তার আগেই প্রতিরোধ গড়তে হবে।'

'দেশের ভিতরেও অনেক শত্রু আছে, বন্ধু,' শান্ত গলায় বলল খুবেস্পিয়া।

'ওদেরকে তাড়া করে ফিরব আমরা।'

'আভ্যন্তরীণ শত্রুকে তাড়া করা সম্ভব নয়।'

'তা হলে কী করতে বলো?'

'ওদেরকে ধ্বংস করতে হবে।'

'আমি রাজি। কিন্তু এখনও আমি বলব, খুবেস্পিয়া, আসল শত্রুরা সীমান্তের ওপারে।'

'আর আমি বলব, শত্রুরা দেশের ভিতরে। ভঁদিতে!'

'আমি মানি না!'

'থামবে তোমরা?' বিরক্ত কণ্ঠে বলে উঠল মাহা। 'কেন খামোকা তর্ক করছ? ভিতরে-বাইরে... সবখানেই শত্রু আছে আমাদের। কোনোটাই অগ্রাহ্য করবার উপায় নেই।'

খুবেস্পিয়া বলল, 'তারপরেও... ভিতরের শত্রুরাই সবচেয়ে বড় হুমকি। আমার কাছে বিস্তারিত তথ্য আছে। জানতে চাও?'

বসে পড়ল দান্তঁ। 'বলো কী বলবে।'

টেবিলের উপর ছড়িয়ে রাখা কাগজপত্র দেখাল খুবেস্পিয়া। 'একটু আগেই প্রিয়ো দু লা মার্ন থেকে আসা সমস্ত বার্তা পড়ে শুনিয়েছি তোমাদের। জিলাইনব্রি-র কাছ থেকে পাওয়া খবরটাও জানিয়েছি। শোনো দান্তঁ, বৈদেশিক যুদ্ধ আসলে কিছুই না। গৃহযুদ্ধই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। বৈদেশিক যুদ্ধ শরীরে স্রেফ আঁচড় কাটে, কিন্তু গৃহযুদ্ধ একটা দেশকে আলসার বা ঘায়ের মত পচিয়ে ফেলে ভিতর থেকে। আর সেটাই কয়েকগুণ শক্তিশালী হতে চলেছে। এতদিন ভঁদিতে একাধিক নেতা ছিল

বিরুদ্ধবাদীদের, ওদের ফৌজ ছিল ছিন্নভিন্ন। কিন্তু এখন একাট্টা হয়ে গেছে ওরা, লড়াই করছে কেন্দ্রীয় এক সেনাপতির অধীনে। ওদের সমস্ত প্রচেষ্টা এখন কেন্দ্রীভূত, আগের চেয়ে অনেক বেশি গোছানো এবং পরিকল্পিত।'

'বলতে চাইছ, লঁতেনাকই সবকিছুর পিছনে কলকাঠি নাড়ছে?' ভুরু কোঁচকাল মাহা।

'অবশ্যই! লোকটা যে-দিন ফরাসি উপকূলে পা রাখল, তার পর থেকেই বদলে যেতে শুরু করেছে যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি। জঙ্গলের ভিতরে চোরাগোপ্তা হামলা নয়, এখন আমাদেরকে মুখোমুখি হতে হচ্ছে পুরোদস্তুর সুশৃঙ্খল বাহিনীর। ব্যাপারটা কাকতালীয় হতে পারে না কিছুতেই। এরই মধ্যে যথেষ্ট ক্ষতি হয়ে গেছে আমাদের। বেশ কয়েকজন গণ-প্রতিনিধি গ্রেফতার বা নিহত হয়েছে, ভয়ে সমর্থন ফিরিয়ে নিতে শুরু করেছে বহু এলাকার লোক।'

'আমরা এ-বিষয়ে সচেতন,' স্বীকার করল দাঁতঁ।

'কী ধরনের সমস্যায় পড়েছি আমরা, তা তো বুঝতেই পারছ। ভঁদির যুদ্ধ ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। ওদিকে ইংরেজরা আবার প্রস্তুতি নিচ্ছে ফ্রান্স আক্রমণের। গুপ্তচরেরা খবর এনেছে, গ্রামে গ্রামে অস্ত্র আর পোশাক সরবরাহ করছে ওরা, জনগণকে উৎসাহিত করছে আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার জন্যে। কৃষক-বিদ্রোহ শুরু হলেই শেষ চাল দেবে ইংল্যাণ্ড, নিজেদের সৈন্য পাঠাবে' মানচিত্রের উপর আঙুল রাখল খ্যবেস্পিয়া। 'ইংরেজরা কংক্যাল থেকে প্যাম্পোল পর্যন্ত যে-কোনও জায়গায় সৈন্য নামাতে পারে। ক্রেইগের পছন্দ সেইণ্ট ব্রিউ-র উপকূল, কর্নওয়ালিসের সেইণ্ট কাস্ত। এগুলো সামান্য বিবরণ। আসল কথা হচ্ছে, লুয়া নদীর পূর্ব পাড় ভঁদির

বিদ্রোহী সেনাদলের দখলে। উসেনি আর পুন্তাখ্সুমের মাঝখানে নর্ম্যানদের যত গ্রাম আছে, সবাই সাহায্য করছে ওদের। তিনটে জায়গা দিয়ে তাই অনুপ্রবেশ করবে ইংরেজরা—প্লিহাঁ, ইফনিয়াক আর প্লেউফ। প্লিহাঁ থেকে সেইন্ট ব্রিউ পৌঁছুনো যায়, আর প্লেউফ থেকে পৌঁছুনো যায় লম্বালে। দ্বিতীয় দিনের মাথায় ওরা দিনো-তে পৌঁছুবে, মুক্ত করবে ওখানে বন্দি নয়শো ইংরেজকে। সেইসঙ্গে দখল করে নেবে সাঁজুয়াঁ আর সাঁমিয়া। অশ্বারোহী সৈন্য মোতায়েন করা হবে ওসব জায়গায়। তৃতীয় দিনে দু'ভাগ হয়ে এগোবে ওদের বাহিনী—একদল যাবে জুয়াঁ-সুখ্-বেদি, আরেকদল যাবে দিনো-সুখ্-বুসেহেল... ওটা একটা রক্ষণাত্মক দুর্গ। সেখানে কামানধারী কিছু লোক রেখে যাবে ওরা। এভাবে চতুর্থ দিনে ওরা রেহ্ন-এ পৌঁছুতে পারবে। ওটা ব্রিটানির কেন্দ্রস্থল, এবং প্রতিরক্ষার দিক থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। যাদের হাতে রেহ্ন থাকবে, তাদের হাতেই থাকবে পুরো এলাকার দখল। পতন ঘটবে শ্যাঁতুলুফ আর সাঁমালু-র। রেহ্নে প্রচুর গোলাবারুদ আর অস্ত্র আছে, সব চলে যাবে ওদের হাতে।'

চেহারায় মেঘ জমল দুই শ্রোতার। মাহ্য বলল, 'এ তো ঘোর দুঃসংবাদ!'

'আরও আছে,' বলল খুবেস্পিয়া। 'রেহ্ন থেকে তিনটা দল তিনদিকে আক্রমণ চালাবে—ফুজের, ভিতি আর রুদোঁ-র উপর। এসব জায়গা থেকে অ্যাভ্রঁশ, উসেনি আর লাভালে যেতে পারবে ওরা অতি সহজে। নান্তে আর ব্রেস্টের পতন ঘটবে। প্যারিসে পৌঁছুনোর পথ উন্মুক্ত হয়ে যাবে ওদের সামনে। পনেরো দিনের মধ্যে গোটা ব্রিটানি চলে যাবে ফ্রান্সের রাজার হাতে।'

'আরেক কথায়... ইংল্যাণ্ডের রাজার হাতে।'

'উঁহুঁ। ফ্রান্সের রাজার হাতেই দেশটা তুলে দেবে ওরা।'

'খুব খারাপ। বিদেশি রাজা হলে তাকে যুদ্ধে হারিয়ে হটিয়ে দেয়া যায়। কিন্তু দেশ থেকে দ্বিতীয়বার রাজতন্ত্র হটাতে হয়তো আরও দু'হাজার বছর লাগবে।'

নীরব হয়ে গেল সবাই।

খানিক পর খুবেস্পিয়া বলল, 'বিপদটা কোথায়, বুঝতে পেরেছ? ভিতি-র পতন মানেই শত্রুদেরকে প্যারিসে আসার পথ খুলে দেয়া।'

ধাম করে টেবিলের উপর ঘুসি বসাল দান্তঁ। 'না, এভাবে হার মানব না আমরা। একদিন আমরা যেমন প্রুশীয়দের তাড়িয়ে দিয়েছিলাম দেশ থেকে, এবারও তেমনি ইংরেজদের তাড়িয়ে দেব।'

'সেবার আমাদেরকে শুধু বিদেশিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়েছিল, কিন্তু এবার ইংরেজদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দেশি বেঈমানেরা।' বন্ধুর হাতে হাত রাখল খুবেস্পিয়া। 'বসো, দান্তঁ। শান্ত হয়ে মানচিত্রের দিকে তাকাও, ওটার উপর ঘুসি মেরো না।'

'আমি তোমার কথা কিছুতেই মানতে পারছি না,' একগুঁয়ের মত বলল দান্তঁ। 'বিপদ যখন পুবদিকে, তখন ওটাকে তুমি দেখছ পশ্চিমে। খুবেস্পিয়া, আমি স্বীকার করি, ইংরেজরা সমুদ্রপথে ছুটে আসছে আমাদের দিকে। কিন্তু স্প্যানিশরাও তো আসছে পিরেনিজ পর্বত টপকে... ইটালি আসছে আল্পসের দিক থেকে... আর জার্মানি জড়ো হচ্ছে রাইন নদীর তীরে। ওদের পিছনে মদদ দিচ্ছে রুশ ভালুক। এইসব ঝুঁকিকে কীভাবে তুমি আভ্যন্তরীণ শত্রুদের চাইতে ছোট ভাবছ? বিপদ আমাদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে, আর আমরা তার ভিতরেই বাস

করছি। দেশের বাইরে মোর্চা, ভিতরে রাষ্ট্রদ্রোহিতা। দক্ষিণে সেরভোঁ স্পেনের রাজার জন্য ফ্রান্সের দরজা আধখোলা করে রেখেছে, উত্তরে হার মেনেছে দুমুরিয়ে। রাঁদুত সাঁতিয়েন বিশ্বাসঘাতকের মত হাত মিলিয়েছে মন্তেস্কিউ-র সঙ্গে। সব সেনাদল বিধ্বস্ত। এমন একটা বাহিনীও নেই যেখানে চারশোর বেশি সৈন্য অবশিষ্ট আছে। দুপঁ-র বিশাল রেজিমেন্ট এখন দেড়শো লোকের ছোট্ট একটা দল ছাড়া আর কিছু নয়। পামারের শিবির আত্মসমর্পণ করছে। ক্লেবার একা হয়ে গেছে। আগ্রাসী জার্মানরা দখল করে নিয়েছে আমাদের বহু এলাকা, নিজেদের পতাকা ওড়াচ্ছে ওখানে। এরকম যদি চলতে থাকে... যদি আমরা ঠিকমত গুছিয়ে উঠতে না পারি... তা হলে বলতে হবে ফরাসি বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে জার্মানির রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডারিখের রাজ্য বড় করবার জন্য। লোকে বলবে, প্রুশিয়ার রাজাকে ক্ষমতা পাইয়ে দেবার জন্য আমরা ফ্রান্সের রাজাকে হত্যা করেছি।'

দান্তঁ-র কথা শেষ হলে মৃদু হাসল মাহা। বলল, 'তোমাদের দু'জনেরই একটা করে বাতিক আছে, বন্ধুরা। দান্তঁ, তোমার বাতিক প্রুশিয়া; আর খুবেস্পিয়া, তোমার বাতিক হচ্ছে ভঁদি। এবার তা হলে আমার কথা শোনো। আমার মতে... সত্যিকার বিপদ হলো এই কাফে আর জুয়ার আড্ডাগুলো। একেকটা একেক পক্ষীয়। খোঁজ নিয়ে দেখো, সবখানে কেউ না কেউ ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে। ওগুলো থেকেই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে ফ্রান্সের ভাগ্য।'

ভুরু কোঁচকাল দান্তঁ। 'তুমি কি রসিকতা করছ, মাহা? যুদ্ধের বদলে নজর দিতে বলছ কাফে আর জুয়ার আড্ডায়?'

'রসিকতা? আমাকে রসিকতা করবার মত লোক বলে মনে

হচ্ছে তোমার, দান্তঁ? কে আমি... কী করি, তা কি ভুলে গেছ? অপরাধ ঘটবার আগেই অপরাধীকে গ্রেফতার করি আমি, গিলোটিনে চড়িয়ে নিকেশ করি সেই বেঈমানকে। তোমরা যে-কথা পরদিন সকালে বলো, আমি সে-কথা আগের দিন সন্ধ্যায় বলে দিই। আইনসভায় আমিই প্রথম ফৌজদারি আইনের খসড়া পরিকল্পনা করবার কথা বলেছি। বিভিন্ন বিভাগের কাজের সঙ্গতির জন্য আমি বিপ্লবী দলগুলোকে একাট্টা করেছি। দুমুরিজের রাষ্ট্রদ্রোহিতার খবর আমিই এনেছিলাম... আমিই প্রমাণ করেছি যে, সাধারণ নিরাপত্তা পরিষদকে ব্রিসোতাঁ ভুয়া পরোয়ানা পাঠিয়েছে। আমার মতামত যদি গ্রাহ্যই না করো, তা হলে কেন এখানে ডেকেছ আমাকে? কী বলছি কিছুই বুঝতে পারছ না... তোমাদের কি রাজনীতি শেখাতে হবে? আমার কথার মর্ম হলো, তোমরা দু'জনেই প্রতারণা করছ নিজের সঙ্গে। বিপদটা লণ্ডনে নয়... বিপদটা বার্লিনেও নয়... বিপদটা রয়েছে প্যারিসে। আসল বিপদ হলো ঐক্যের অভাব, ইচ্ছার অরাজকতা! এ-মুহূর্তে সবাই যে-যার খেয়ালখুশিমত চলছে।'

'অরাজকতা!' প্রায় রেগে গেল দান্তঁ। 'স্বাধীনতাকে অরাজকতা বলছ তুমি?'

'কেন বলব না?' সমান তেজে বলল মারা। 'আমাদের স্বেচ্ছাচারিতার কারণে দেখা দিয়েছে এত দলাদলি। এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে দুর্ভিক্ষের কারণে... এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে জনগণের মতামতকে অবজ্ঞা করে কাগজের নোট চালু করার ফলে। সোনার মুদ্রা আর কাগজের নোট কি এক হলো? তা ছাড়া, ব্যবসায়ীদের একচেটিয়া ফায়দা লোটার সুযোগ করে দিয়েছি আমরা। নজর দিচ্ছি না সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের দিকে। প্যারিসের দিকে তাকাচ্ছি না কেউ... বিপদ যখন হাতের

কাছে, তখন সেটা খুঁজে মরছি দূরে! খুবেস্পিয়া, চারদিকে চর বসিয়ে রেখেছ তুমি, কিন্তু তাতে কী এমন লাভ হচ্ছে? বিপদ আমাদের মাথার উপরে, বিপদ আমাদের পায়ের তলায়! চারদিকে শুধু ষড়যন্ত্র আর ষড়যন্ত্র! রাস্তার লোকেরা খবরের কাগজ পড়ে কানাকানি করে। ছয় হাজার লোকের নাগরিক পরিচয়পত্র নেই। প্যারিসের আনাচে-কানাচে আজও লুকিয়ে আছে মুসকাদাঁ আর ম্যাদভুঁ-রা। কত মানুষ লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে রুটির দোকানের সামনে... মেয়েরা বলাবলি করছে, কখন শান্তি আসবে! তোমরা এগজিকিউটিভ কাউন্সিলের হলঘরের দরজা বন্ধ করে বসে থাকতে পারো, তবু সে-ঘরের সমস্ত কথা লোকে শুনতে পায়। তার প্রমাণ, খুবেস্পিয়া, তুমি গতরাতে সাঁনজাস-কে যা বলেছিলে, তা আমি জানি। তুমি বলেছিলে, পেটমোটা বারবাহু-র পালাতে কষ্ট হবে। সুতরাং বুঝতেই পারছ, বিপদ সর্বত্র। প্রতিক্রিয়াশীলরা ষড়যন্ত্র করছে। ভ্রাম্যমাণ রক্ষীবাহিনীর পায়ে জুতো নেই। ৯ই মার্চ যে-সব অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকদের গ্রেফতার করা হয়েছিল, তাদেরকে আবার ছেড়ে দেয়া হয়েছে। যেসব ভাল জাতের ঘোড়া যুদ্ধের ময়দানে পাঠানো দরকার ছিল, সেগুলো এখন পথে পথে ধুলো ঘেঁটে বেড়াচ্ছে। চার পাউণ্ড রুটির দাম হয়েছে তিন ফ্রাঁ! থিয়েটারে আমাদের প্যারোডি করা হচ্ছে... দেখানো হচ্ছে খুবেস্পিয়া আর দান্তঁ-র গিলোটিন!'

'যথেষ্ট হয়েছে!' চেঁচিয়ে উঠল দান্তঁ। 'চুপ করো!'

খুবেস্পিয়ার মুখ কালো হয়ে গেছে। সে কিছু বলল না।

মাহা বলল, 'যদ্দূর বুঝতে পারছি, এখন দেশে একনায়কতন্ত্র ছাড়া গতি নেই।'

'কে হবে সেই একনায়ক?' শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল

খুবেস্পিয়া। 'তুমি, না আমি?'

'একনায়কতন্ত্র?' দাঁতমুখ খিঁচাল দান্তঁ। 'চেষ্টা করেই দেখো! আমি হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব না।'

'শান্ত হও, আমি কারও একার রাজত্বের কথা বলিনি,' তাকে উদ্দেশ করে বলল মাহা। 'আমার কথার মর্ম হচ্ছে, ঐক্য স্থাপনের জন্য শাসনব্যবস্থাকে কেন্দ্রীভূত করে ফেলা দরকার। আজই প্যারিস বিপ্লবী সরকার গঠন করা উচিত। আর একটি ঘণ্টাও নষ্ট করা ঠিক হবে না। এভাবে কমিউন আর কনভেনশনের দ্বৈত শাসন চলতে পারে না। শাসনব্যবস্থা একটাই হবে, আর বিপ্লবের প্রতিনিধি হিসেবে সেটা চালাব আমরা তিনজন। এটাই যুক্তিসঙ্গত। কারণ আমরা নরকের প্রহরী কুকুর সার্বেরাসের তিন মাথা। যেটা কথা বেশি বলে, সেটা খুবেস্পিয়া; যেটা গর্জন করে, সেটা দান্তঁ...'

'...আর যেটা কামড়ায়, সেটা কি তুমি?' বাঁকা সুরে মাহাকে বলল দান্তঁ।

'কামড় আমরা তিনজনেই দেব,' খোঁচাটা গায়ে মাখল না মাহা।

খুবেস্পিয়া জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি দেশের শাসন ভাগাভাগির চুক্তি করতে চাইছ আমাদের সঙ্গে?'

'অবশ্যই!'

'হুম! কিন্তু এক বিছানায় শোয়ার আগে পরস্পরকে ভালভাবে চিনে নেয়া উচিত। গতকাল সাঁনজাসের সঙ্গে কী কথা হয়েছে আমার, তা কীভাবে জেনেছ তুমি?'

'ওটা তোমার না জানলেও চলবে।'

'আমাকে জানতেই হবে, মাহা!'

'শুধু এটুকু জেনো... কোথায় কী ঘটছে, কে কী বলছে,

সে-সবের খবর রাখা আমার কাজ।'

'তা-ই? তুমি সব জানো?'

'হ্যাঁ। সাঁনজাস আর তোমার আলাপের খবর যেমন আমি জানি, তেমনি জানি দান্তঁ আর লাখোঁয়া-র আলাপ। থেটিনের ঘাটে আর লাব্রিফের বাড়িতে কী ঘটে, তাও আমি জানি। সুন্দরীদের হাট বসে ওখানে, আর তোমাদের একজন সপ্তাহে একবার তাতে যোগ দিতে যায়।'

শেষ কথাটা দান্তঁ-র দিকে তাকিয়ে বলা। দাঁত কিড়মিড় করে সে বলল, 'এখুনি তোমার ঘাড় মটকে দেয়া দরকার আমার।'

একটু হাসল মাহ্য। 'খুবেস্পিয়া, তুমিও ধোয়া তুলসীপাতা নও। টেম্পল টাওয়ারে বন্দি রাজাকে কতভাবে সেবা করেছ তুমি, তার সবই আমি জানি। রাক্ষসের মত খেতে দিয়েছ তাদের, অথচ তখন সারা ফ্রান্সের জনগণ দুর্ভিক্ষে মরছিল। আমি জানি, রোলাঁকে রু দু লা হার্পের একটা বাড়িতে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল; ডিউক অভ অর্লিয়ঁ-র কামার ছয়শো বর্শা বানিয়ে সরবরাহ করেছিল বিদ্রোহীদের; সাঁতিলে-র বাড়িতে কী হয়, তাও আমার জানা। সে-বাড়িতে সাতাশে জুলাই কার সঙ্গে সেলেদাঁ মধ্যাহ্নভোজ করেছিল, জানো? তোমার বন্ধু লাসুখ্স-এর সঙ্গে!'

'এগুলো সব অবান্তর অভিযোগ,' শুকনো গলায় বলল খুবেস্পিয়া। 'তা ছাড়া লাসুখ্স আমার বন্ধু নয়।'

'ও কিন্তু উল্টো কথা বলে,' মুখের হাসি বিস্তৃত হলো মাহার। 'আমার কাছে কোনও কিছু গোপন করে লাভ নেই, খুবেস্পিয়া। তোমার হবু ভ্রাতৃবধূ এলিজাবেথ ডুপ্লে-র বাড়িতে দাওয়াত খেতে গিয়ে লুবাঁ কী বলেছিল, তা আমি জানি। আমি হচ্ছি ফ্রান্সের

জনগণের সদাজাগ্রত চক্ষু—গুহার ভিতর থেকেও সজাগ দৃষ্টি রেখে চলি। সবকিছুই দেখি ও শুনি। অথচ তোমরা ছোটখাট জিনিস নিয়ে সন্তুষ্ট থাকো। মাদাম দু শালাব-এর পাণিপ্রার্থনা করছ তুমি, খুবেস্পিয়া... কিন্তু এ-কথা কি জানো, ওর বাবা মাহ্‌খি দু শালাব রাজা পঞ্চদশ লুইয়ের সঙ্গে তাস খেলত? বন্ধু, বোকার স্বর্গে বাস করছ তুমি। ভাবছ ইতিহাসে তোমার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে? ঘরে ঘরে টাঙানো থাকবে তোমার ছবি? কেন... কীসের জন্য?'

এবার খুবেস্পিয়াও খেপে গেল। বলল, 'আমার ছবি না টাঙাক ওরা, কিন্তু তোমার ছবি ঠিকই টাঙাবে! টাঙাবে পায়খানায়! অভিজাতদের পা-চাটা কুকুর হিসেবে!'

বেধে গেল ঝগড়া।

মাহা বলল, 'আমি অভিজাতদের পা-চাটা কুকুর? তা হলে তুমি কী? তুমি তো প্রকাশ্যে একবার ঘোষণা দিয়েছিলে, যারা রাজতন্ত্রের অবসান চায়, তারা মানবজাতির কলঙ্ক!'

খুবেস্পিয়া সমান তেজে বলল, 'তুমিও তোমার পত্রিকায় একবার বলেছিলে, ডিউক পদবীর উচ্ছেদ চলবে না।'

'সাতই ডিসেম্বরের অধিবেশনে ভিয়া-র বিরুদ্ধে তুমি রোলাঁ-র বউকে সমর্থন দিয়েছিলে।'

'ঠিক যেভাবে আমার ভাই তোমাকে জ্যাকোবিনদের আক্রমণ থেকে বাঁচিয়েছিল। তাতে কী প্রমাণ হয়? কিছুই না।'

'অস্বীকার করতে পারো, তুলেরির সভায় গ্যাহা-কে তুমি বলেছিলে, বিপ্লব নিয়ে বিরক্ত হয়ে উঠেছ?'

'আর তুমিও, মাহা, এই শুঁড়িখানায় একদিন বারবাহুকে আলিঙ্গন করেছিলে...'

অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগের ঝড় বয়ে গেল। অসহনীয় হয়ে

উঠল ছোট্ট কামরাটার পরিবেশ। উপায়ান্তর না দেখে ওদেরকে থামাবার চেষ্টা করল দান্তঁ। বলল, 'খুবেস্পিয়া, মাহা, শান্ত হও!'

ঝট্ করে তার দিকে ফিরল মাহা। 'তুমি আমাদের মাঝে নাক গলাবার কে?'

'নাক গলাতে বাধ্য হচ্ছি, কারণ আমি ভ্রাতৃহত্যা চাই না,' বলল দান্তঁ। 'তোমাদের মত দু'জন দেশসেবকের মাঝে ঝগড়া-বিবাদ শোভা পায় না। আমি বিদেশি যুদ্ধ যেমন চাই না, তেমনি চাই না গৃহযুদ্ধ। এই বিপ্লবের জন্য অনেক রক্ত আর ঘাম ঝরিয়েছি আমি... এখন ব্যক্তিগত রেষারেষির কারণে সেটাকে ব্যর্থ হয়ে যেতে দেব না।'

'রক্ত আর ঘাম?' মুখ বাঁকাল মাহা। 'এবার দেখছি তোমার হিসাব দিতে হবে!'

'আমার হিসাব?' থমথমে হয়ে উঠল দান্তঁ-র মুখ। 'আমার হিসাব নিতে চাও তো আহ্গোনের যুদ্ধে কী করেছি তার খবর নাও... বেলজিয়াম দখলের সময় কী করেছি তার খবর নাও... খবর নাও কীভাবে শত্রুর গুলির সামনে বুক পেতে দিয়েছিলাম আমি। বধ্যভূমি আর গিলোটিনের দর্শকদের জিজ্ঞেস করো...'

'গিলোটিন?' তাকে বাধা দিল মাহা। 'ওখানে কাউকে পাঠানোর মধ্যে কী এমন কৃতিত্ব আছে, বলো? ওটা আমরা যে-কেউই করতে পারি।'

'কিন্তু আমি যত লোককে গিলোটিনে পাঠিয়েছি, তার চার ভাগের এক ভাগও তোমরা পাঠাওনি।'

'বেশ, এখান থেকে ফিরে নাহয় হিসেব করে দেখব।'

মাহা-র টিটকিরি মাখা কথায় মাথায় যেন আগুন ধরে গেল দান্তঁ-র। কড়া গলায় সে বলল, 'মাহা, তুমি হলে এমন এক মানুষ, যে লুকিয়ে থাকতে পছন্দ করে। কিন্তু আমি ঘুরে বেড়াই

খোলা হাওয়ায়। সরীসৃপের জীবনকে ঘৃণা করি আমি—সাপ বা কেঁচোর মত গর্তে বাস করি না। কথা বলি সবার সঙ্গে। আমার সঙ্গে নিজের তুলনা করতে যেয়ো না।'

'তা আমি করতে চাইও না,' বলল মাহা। 'আমি শুধু হিসাব চাই—শ্যাতেলেতে সলিসিটারের পদ গ্রহণ করবার জন্য মুমুঁহা তোমাকে রাজার নামে তেত্রিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিল। কোথায় গেল ওগুলো?'

উদ্ধতভাবে দান্তঁ বলল, 'সে-হিসাব আমি ১৪ই জুলাইয়ে দিয়েছি।'

'বিচার মন্ত্রণালয়ের এক লক্ষ লিভাখের গোপন ফাণ্ড ছিল, তার কী হলো?'

'তা দিয়ে আমি দশই আগস্টের বিপ্লব ঘটিয়েছি।'

'রাজমুকুটের হিরে?'

'ওগুলো অক্টোবরের বিপ্লবের খরচ জুগিয়েছে।'

'বেলজিয়ামে লুটপাট চালিয়েও তো অনেক টাকা পেয়েছ।'

'সবই গেছে বিপ্লবের পিছনে।'

'তা-ই? রাজ্যসভার বিশ লাখ লিভাখের খরচ থেকেও তো চার ভাগের এক ভাগ হাতিয়েছ তুমি। কই, বিপ্লবের ফাণ্ডে তো সে-টাকা জমা দাওনি।'

'সব টাকাই যুদ্ধের পিছনে খরচ হয়েছে। ভুলে যেয়ো না, এক হাতে শত্রুদের আগ্রাসন ঠেকিয়েছি আমি। রাজা যাতে অন্য দেশের সঙ্গে সন্ধি করতে না পারে, তার সব পথও আমাকেই বন্ধ করতে হয়েছে।'

'মিথ্যেবাদী!' গাল দিয়ে উঠল মাহা।

জ্বলে উঠল দান্তঁ-র দু'চোখ। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'বেশ, নিজেকে বিক্রি করেছি আমি। কিন্তু তার বিনিময়ে দেশকেও

বাঁচিয়েছি।'

খুবেস্পিয়া কিছু বলল না। চুপ করে বসে আছে সে।

দাঁন্ত ভাষণ দেয়ার সুরে বলল, 'আমি হচ্ছি সমুদ্রের মত। জোয়ার-ভাটা দুটোই আছে আমার। জোয়ারের সময় আমার বুকে দেখতে পাবে অজস্র ঢেউ, আর ভাটার সময় বেরিয়ে পড়বে তলানি।'

'তোমার মধ্যে ফেনা ছাড়া আর কিছু নেই,' বিরক্ত গলায় বলল মাহা।

'তুমি আমার ঝড় দেখোনি, মাহা!'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মাহা। হতাশ গলায় বলল, 'হায় খুবেস্পিয়া, হায় দান্তঁ, তোমরা কেউ আমার কথা শুনছ না! আমি বলে দিচ্ছি, তোমরা দু'জনেই ব্যর্থ। তোমরা এমন নীতি গ্রহণ করেছ, যার কারণে কিছুতেই এগোতে পারবে না। পরিত্রাণের কোনও পথ নেই তোমাদের। একমাত্র কবরে যাওয়া ছাড়া আর সব দরজাই বন্ধ তোমাদের জন্য।'

'এখানেই আমাদের মহত্ত্ব,' গোঁয়ারের মত বলল দান্তঁ।

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল সে।

মাহা বলল, 'এখনও সময় আছে, দান্তঁ, সাবধান! মনে রেখো, এক সময় ভার্নিউ-ও বড় বড় কথা বলে বেড়াত, তাই বলে একত্রিশে মে-র ঘটনা সে প্রতিহত করতে পারেনি। আমার কথা না শুনলে তোমার পরিণতিও একই হতে পারে।' খুবেস্পিয়ার দিকে ফিরল। 'আর তুমি, খুবেস্পিয়া, মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে চাইছ। কিন্তু তাতে কোনও লাভ হবে না। যাও, ভালভাবে চুল আঁচড়ে পরিষ্কার পোশাক পরে ঘুরে বেড়াও গে। যত যা-ই করো, বধ্যভূমিতে যাওয়া ঠেকাতে পারবে না। রাজার হত্যাকারী হিসেবে চরম শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে—জার্মানরা

তেমন ঘোষণা দিয়ে রেখেছে।'

ফোঁস ফোঁস করে উঠল খুবেস্পিয়া। 'তুমি বিরুদ্ধবাদীদের মত কথা বলছ!'

'আমি সবার মনের কথা বলছি!' বলল মাহা। 'বয়স কম বলে তা বুঝতে পারছ না। তোমার বয়স কত, দান্তঁ? চৌত্রিশ। তোমার বয়স কত, খুবেস্পিয়া? তেত্রিশ। আর আমি? আমি ছয় হাজার বছরের পুরনো মানবতার মুখপাত্র। আমি সুপ্রাচীন দুঃখকষ্টের মূর্ত প্রতীক!'

'না!' প্রতিবাদ করল দান্তঁ। 'তুমি হচ্ছ ভ্রাতৃহত্যার বিষ... অন্তর্ঘাতী শত্রু। আড়াল সরে যেতেই এখন ছোবল মারতে এসেছ!'

'কী বললে?'

'ঠিকই বলছি,' খ্যাপাটে গলায় বলল দান্তঁ। 'মুখে একনায়কতন্ত্র আর ঐক্যের কথা বলছ বটে, কিন্তু আসলে তুমি আমাদের ভিতরে বিভেদ আর হিংসা জাগিয়ে তুলতে চাইছ।'

'আমি একমত,' সায় দিল খুবেস্পিয়া। 'একনায়কতন্ত্র যদি আসেও, আমি মাহা বা রোলাঁ কাউকেই চাই না।'

'আমিও বলব,' একগুঁয়ের মত বলল মাহা, 'আমি খুবেস্পিয়া বা দান্তঁকে চাই না।'

'তুমি কী চাও না চাও, তাতে কী এসে-যায়?' মুখ বাঁকাল দান্তঁ।

'তোমাকে একটা পরামর্শ দিই, দান্তঁ,' বলল মাহা। 'তুমি প্রেমে পড়েছ, আবার বিয়ে করবার কথা ভাবছ... এ-মুহূর্তে রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। মাথা খাটিয়ে কাজ করো।' কয়েক পা পিছিয়ে গেল সে। 'আপাতত তোমাদের সঙ্গে এ-নিয়ে আর কথা বলে লাভ হবে না, বন্ধুরা। কাজেই... বিদায়!'

ঘুরতে গেল সে, আর তখুনি দরজা থেকে ভেসে এল নতুন একটা কণ্ঠস্বর।

'আপনি ভুল করছেন, মাহা!'

চমকে উঠে সে-দিকে তাকাল তিন নেতা। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটি আর কেউ নয়। সিমুর্দা!

নয়

ক্ষণিকের জন্য চুপ হয়ে গেল সবাই। তারপর মাহা-ই চমকটা প্রথম সামলে নিল। গলা খাঁকারি দিয়ে সে বলল, 'আরে, সিমুর্দা! আপনি? আসুন, আসুন। শুভ সন্ধ্যা।'

নড়ল না সিমুর্দা। আবার বলল, 'আপনি ভুল করছেন, মাহা।'

চেহারা ম্লান হয়ে গেল মাহার। বলল, 'কী ভুল করছি?'

'প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আপনাকে যত না প্রয়োজন, তার চেয়ে খুবেস্পিয়া বা দান্তঁ-র প্রয়োজন কোনও অংশে কম নয়। কেন ওঁদেরকে ভয় দেখাচ্ছেন? আপনারা মিলেমিশে চলুন। জনগণ এখন ঐক্য চায়।'

তিন নেতার উত্তাপ আর উত্তেজনার মধ্যে কেউ যেন এক বালতি পানি ঢেলে দিয়েছে। একটু লজ্জিতই হয়ে উঠল ওরা।

টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল সিমুর্দা। দাঁন্ত আর খুবেস্পিয়া

তাকে ভাল করেই চেনে। কনভেনশনের সভায় প্রায়ই উঠে আসে তার নাম। ওরা জানে, জনসাধারণ এই অদ্ভুত লোকটাকে কী এক অজানা কারণে অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা করে।

'আপনি ভিতরে ঢুকলেন কী করে?' জিজ্ঞেস করল খুবেস্পিয়া।

'উনি ইভেশির সদস্য,' জানাল মাহা। গলার স্বর নরম হয়ে এসেছে। কমিউনকে চালায় সে, কনভেনশনের উপরে মাতবরি ফলায়... কিন্তু ইভেশিকে বেশ ভয় করে।

সিমুর্দাকে দেখে খুশি হয়ে উঠল দান্তঁ। এবার মাহাকে যদি একটু টাইট দেয়া যায়। হাসিমুখে বলল, 'আপনাকে আমাদের মাঝে পেয়ে ধন্য হলাম, সিমুর্দা।'

করমর্দনের জন্য ডান হাত বাড়িয়ে দিল সে। দায়সারা ভঙ্গিতে হাত মেলাল সিমুর্দা। বলল, 'এখানে এত হৈচৈ কীসের, জানতে পারি? কী নিয়ে এত ঝগড়া করছেন আপনারা?'

'ভঁদি,' সংক্ষেপে বলল খুবেস্পিয়া।

'ভঁদি?' ভুরু কোঁচকাল সিমুর্দা। 'বিপদটা ওখানেই। বিপ্লব যদি ব্যর্থ হয়, তা হলে ভঁদির জন্যই হবে। এই একটা ভঁদি দশটা জার্মানির চেয়ে বিপজ্জনক। ফ্রান্সকে বাঁচাতে হলে আগে ভঁদিকে ধ্বংস করতে হবে।'

কথাটা শুনে খুশি হয়ে উঠল খুবেস্পিয়া। তার কথাগুলোই বেরুচ্ছে সিমুর্দার মুখ দিয়ে।

'ওখানকার পরিস্থিতি জানেন?' প্রশ্ন করল সে।

'না। কেন, কী হয়েছে?'

'নতুন এক নেতার আর্বিভাব ঘটেছে ওখানে। এই নেতা যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিচ্ছে।'

'কী নাম তার?'

'মাহ্খি দু লঁতেনাক। ব্রিটানির যুবরাজ বলে নিজেকে দাবি করে সে।'

নড়েচড়ে বসল সিমুর্দা। 'আমি তাকে চিনি। এক সময় তার বাড়ির যাজক ছিলাম আমি। সত্যিকার বীরপুরুষ। নেতা হিসেবে ভয়ঙ্কর।'

'ঠিক তাই। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিচ্ছে। কাউকে বন্দি করছে না। আত্মসমর্পণ করলেও আমাদের লোককে গুলি করছে সে। তার রোষ থেকে রেহাই পাচ্ছে না আহত... এমনকী মহিলারাও!'

'মহিলা!' বিস্মিত হলো সিমুর্দা।

'হ্যাঁ। রীতিমত নিষ্ঠুর এক লোক। এক মহিলাকে গুলি করে তার তিনটে বাচ্চাকে উঠিয়ে নিয়ে গেছে। বাচ্চাগুলোর কপালে কী ঘটেছে, এখন পর্যন্ত জানা যায়নি। নিষ্ঠুরতাই একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। মূল সমস্যা হলো, সে একজন জাত-যোদ্ধা। যুদ্ধটা খুব ভাল বোঝে। জানে কীভাবে কী করলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হবে আমাদের।'

'অবাক হচ্ছি না। হ্যানোভারের সঙ্গে যুদ্ধে ছিল সে। সৈনিকরা বলত, উপরে রিশেলু, আর নীচে লঁতেনাক... এমনই তার গুণ। সত্যিকার জেনারেল!'

'এই লোকটাই এখন ভঁদিতে আস্তানা গেড়েছে।'

'কবে থেকে?'

'তিন সপ্তাহ।'

'তাকে দেশদ্রোহী দস্যু বলে ঘোষণা করা উচিত।'

'করা হয়েছে।'

'ওর মাথার উপর পুরস্কার ঘোষণা করা উচিত।'

'তা-ও করা হয়েছে।'

'কাগজের নোট নয়, পুরস্কারটা দিতে হবে স্বর্ণমুদ্রায়।'

'ওভাবেই বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়েছে।'

'তারপরেও ধরা পড়েনি?'

'না। যদ্দূর বুঝতে পারছি, এখান থেকেই কাউকে পাঠাতে হবে ওকে ধরে আনার জন্য। লঁতেনাককে জনসমক্ষে গিলোটিনে চড়াতে পারলে পরিস্থিতি আমাদের অনুকূলে ফিরে আসবে। লোকে আবার আস্থা রাখতে শুরু করবে আমাদের উপর।'

'কিন্তু কে যাবে?'

শান্ত চোখে সিমুর্দাকে জরিপ করল খুবেস্পিয়া। লোক চেনে সে—কাকে কোন্ কাজ দিলে সেটা সফল হবে, বোঝে। বলল, 'আপনাকেই পাঠাতে চাই আমি, সিমুর্দা।'

'আমি?'

'হ্যাঁ। আপনার সুনাম আছে এ-ধরনের কাজের ব্যাপারে। আপনাকে ছাড়া আর কাউকে দিয়ে কাজটা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।'

'যদি তা-ই হয়, তা হলে দায়িত্বটা আমি সানন্দে গ্রহণ করব।'

এক টুকরো সাদা কাগজ নিয়ে তাতে খসখস করে একটা সনদ লিখল খুবেস্পিয়া। বলল, 'নাগরিক নিরাপত্তা পরিষদের প্রতিনিধি হিসেবে যাবেন আপনি। এই কাগজটা দেখালেই আমাদের ফৌজ সব ধরনের সাহায্য করবে আপনাকে।'

'কীভাবে কী করবেন, কিছু ভাবছেন?' জিজ্ঞেস করল মারা।

মাথা ঝাঁকাল সিমুর্দা। 'নিষ্ঠুরতার জবাব নিষ্ঠুরতা দিয়েই দিতে হবে। লঁতেনাক যতটা হিংস্র, আমি তার চেয়েও বেশি হিংস্র হব। শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে আমি লড়াই করব তার সঙ্গে। ঈশ্বর যদি দয়া করেন, তা হলে নিশ্চয়ই প্রজাতন্ত্রকে

বাঁচাতে পারব তার হাত থেকে।'

'আপনি এখনও ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন?' অবাক হলো দান্তঁ। 'ঈশ্বর তো এখন অচল!'

'তবু আমার বিশ্বাস মরেনি,' বলল সিমুর্দা। 'সবকিছুর পরেও আমি একজন যাজক।'

তার এই কথার পিঠে আর কোনও কথা খুঁজে পেল না তিন নেতা।

সিমুর্দা জিজ্ঞেস করল, 'ভঁদিতে কার সঙ্গে যোগাযোগ করব আমি?'

'লঁতেনাকের বিরুদ্ধে যে-বাহিনী কাজ করছে, তাদের সঙ্গে,' বলল খুবেস্পিয়া। 'একটা কথা বলে দেয়া ভাল, বাহিনী-প্রধান কিন্তু অভিজাত বংশীয়!'

'তাতে কিছু যায়-আসে না,' বলল দান্তঁ। 'যাজক আর অভিজাতের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? কাজেই মানুষের সত্যিকার পরিচয়। সামন্ত শ্রেণীর আভিজাত্য আমাদের একটা সংস্কার মাত্র। অন্যান্য শ্রেণীর চেয়ে তাদেরকে আলাদা করে দেখার কোনও যুক্তি নেই। খুবেস্পিয়া, সাঁনজাস-ও তো অভিজাত বংশীয়। অ্যানাকার্সিস ক্লুটও একজন ব্যারন। আমাদের বন্ধু চার্লস হেসি... যিনি কখ্‌দেলিয়ে সভার নিয়মিত সদস্য... তিনিও তো একজন রাজকুমার। মাহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু মন্তু-ও একজন মাহ্‌খি। বিপ্লবী বিচারসভার একজন সদস্য যাজক, তাঁর নাম ভিলাত। আরেকজন বিচারক... লুহোয়া... তিনি একজন মাহ্‌খি। এঁরা দুজনেই পরীক্ষিত প্রজাতন্ত্রী।'

'আরেকজনের কথা বলতে ভুলে গেছ,' বলল খুবেস্পিয়া। 'তিনি বিপ্লবী জুরির প্রধান সদস্য।'

'অঁতোনেল?'

'মাহ্খি অঁতোনেল।'

মাথা ঝাঁকাল দান্তঁ। 'প্রজাতন্ত্রের জন্য কোন্দির সামনে প্রাণ দিয়েছিলেন সামন্ত দম্পিয়ের। বুঁহোপিয়া-ও ছিলেন অভিজাত পরিবারের সন্তান, যিনি ভাঁদুর গেটে প্রুশীয়দের বাধা দিতে গিয়ে খুন হয়ে গিয়েছিলেন।'

'তাই বলে সব অভিজাতকে এক কাতারে ফেলা ঠিক হবে না,' দ্বিমত পোষণ করল মাহা। 'ওদের ভিতরে আমাদের বিরুদ্ধবাদীও প্রচুর আছে।'

'আপনাদের কথায় যুক্তি আছে,' স্বীকার করল সিমুর্দা। 'ওদের উপরে পুরোপুরি বিশ্বাস স্থাপন করাটা ঠিক নয়। সাধারণ জনতা অভিজাতদের পছন্দ করে না। আমাকে যদি কোনও অভিজাত ভদ্রলোকের সঙ্গে কাজ করতে হয়, আমি যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করব।'

'আমিও আপনাকে সেই পরামর্শই দিতে চাইছিলাম,' বলল খুবেস্পিয়া। 'কারণ আপনাকে যার কাছে পাঠাচ্ছি, সে নিতান্তই যুবক... আপনার অর্ধেক বয়সী। কাজেই নেতৃত্বভারটা আপনাকেই নিতে হবে, কৌশলে ওকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে হবে। এমনিতে তার যথেষ্ট সামরিক প্রতিভা রয়েছে। আর্মি অভ দ্য রাইন থেকে একটা সেনাদলকে বিচ্ছিন্ন করে তার নেতৃত্বে ভঁদিতে পাঠানো হয়েছে। সীমান্ত এলাকার যুদ্ধে যথেষ্ট সাহস এবং বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে সে। লঁতেনাকের বিরুদ্ধেও এখন পর্যন্ত ভালই কাজ করে যাচ্ছে। অনেকেই ওর প্রতি ঈর্ষান্বিত বলে খবর পেয়েছি আমরা। আমাদের অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল লিশেল-ই তাকে ঈর্ষা করে।'

'লিশেলের কথা বলে লাভ আছে?' বিরক্ত গলায় বলল দান্তঁ। 'প্রধান সেনাপতি হবার স্বপ্ন দেখছে সে। কেউ তার চেয়ে ভাল

কাজ দেখালেই তাকে ঈর্ষা করে। আমাদের তরুণ ক্যাপ্টেনের প্রতি আলাদা কোনও বিদ্বেষ আছে বলে মনে হয় না।'

'এ-ক্ষেত্রে লিশেলকে অগ্রাহ্য করবার উপায় নেই,' বলল খুবেস্পিয়া। 'লঁতেনাককে পরাস্ত করবার কৃতিত্ব সে একা ভোগ করতে চায়। এজন্যে অন্যদের কাজে বাধা দিতেও তার কুণ্ঠা নেই। সেনানায়কদের মধ্যকার এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাই হলো ভঁদির যুদ্ধের দুর্ভাগ্য। আমাদের বীর সৈনিকদের নেতৃত্ব দেবার মত উপযুক্ত লোক নেই। এখন যেটা করা দরকার—নেতৃত্বের পুরো শৃঙ্খলটাই ঢেলে সাজাতে হবে। আমাদের সৈন্যরা বিক্ষিপ্ত ও ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে। ওদেরকে একাট্টা করতে হবে... ঠিক যেভাবে নিজেদের একাট্টা করেছে রাজতন্ত্রীরা। ত্রিগিয়ে আর দিনোর মাঝখানে ছোট ছোট দলে বিভক্ত অন্তত একশোটা সেনাদল আছে। ওদেরকে একত্র করতে পারলে পুরো উপকূল পাহারা দেয়া সম্ভব। অথচ লিশেল দক্ষিণ উপকূলে সৈন্য সমাবেশ করিয়ে উত্তর দিকটাকে অরক্ষিত করে ফেলেছে। সুবিধে করে দিচ্ছে ইংরেজদের সৈন্য অবতরণের। এসব ইংরেজ সৈন্য আর পাঁচ লক্ষ স্থানীয় বিদ্রোহীদের সাহায্যে কার্যসিদ্ধি করতে চাইছে লঁতেনাক। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে একাকী লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে আমাদের যুবক ক্যাপ্টেন, লিশেলের অনুমতি ছাড়াই যুদ্ধ করছে লঁতেনাকের বিরুদ্ধে। এ-কারণে লিশেল বেশ ক্ষিপ্ত।'

'যদ্দূর বুঝতে পারছি, এই ক্যাপ্টেনের অনেক গুণ আছে,' মন্তব্য করল সিমুর্দা।

'গুণ যতই থাক, ওর মস্ত বড় একটা দোষও আছে,' বলল মাহা।

'কী দোষ?'

‘মায়া-মমতা। যুদ্ধের ময়দানে যতটা কঠোর, যুদ্ধের পরে ঠিক ততটাই ক্ষমাশীল হয়ে পড়ে ও। ধর্মীয় লোকদের ক্ষমা করে ছেড়ে দেয়। অভিজাত সম্প্রদায়ের নারীদের রক্ষা করে চলে। বহু বন্দিকেও মুক্তি দেয়।’

‘এটাকে দোষ বলছেন?’

‘শুধু দোষ নয়, এটা রীতিমত অপরাধ!’

‘কিন্তু ও তো বিদেশি শত্রুদের দয়া দেখাচ্ছে না। দেখাচ্ছে নিজের দেশের মানুষকে।’

‘তা-ই? দয়াটা যে আচমকা ওই রাজতন্ত্রী সেনাপতি লঁতেনাকের জন্য জেগে উঠবে না, তার নিশ্চয়তা কী? অমন কিছু ঘটলে আপনি কী করবেন?’

‘তা হলে লিশেলের সঙ্গে একমত হয়ে ওকে শাস্তি দেবার কথা বলব আমি। মৃত্যুদণ্ডের সুপারিশ করব।’

‘গুলি, নাকি গিলোটিন?’

‘সেটা দণ্ডপ্রাপ্তের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া উচিত বলে মনে করি।’

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল তিন নেতা। সিমুর্দার জবাব তাদের পছন্দ হয়েছে। মাহা বলল, ‘নাহ্, আমার আর কোনও আপত্তি নেই। নাগরিক নিরাপত্তা পরিষদের প্রতিনিধি হিসেবে তুমি ঠিক লোককেই বেছেছ, খুবেস্পিয়া।’

মাথা ঝাঁকিয়ে সদ্য লেখা সনদটায় সই করল খুবেস্পিয়া। তারপর দুই সঙ্গীর দিকে বাড়িয়ে দিল তাদের সইয়ের জন্য।

দান্তঁ বলল, ‘চোখ-কান খোলা রাখবেন, সিমুর্দা। আমাদের সেনাপতি যদি উল্টোপাল্টা কিছু করতে যায়, সেটা ঠেকানো আপনার দায়িত্ব।’

‘কিচ্ছু ভাববেন না,’ কথা দিল সিমুর্দা। ‘ও যদি কোনও ভুল

পথ বেছে নেয়, আমি নিজ হাতে হত্যা করব ওকে।'

সই হয়ে গেছে, সনদটা তার হাতে তুলে দিল খুবেস্পিয়া। 'এই নিন,' বলল সে। 'আমাদের সই করা সনদপত্র। যে সেনাপতির সঙ্গে আপনি কাজ করবেন, তার নাম গুভাঁ।'

থমকে গেল সিমুর্দা। অস্ফুট গলায় বলল, 'ভাইকাউন্ট গুঁভা?'

'হ্যাঁ। কেন... কোনও সমস্যা?'

মাথা নাড়ল সিমুর্দা। তাকাল সনদের দিকে। ওতে লেখা:

<u>ফরাসি প্রজাতন্ত্র: এক ও অভিন্ন</u>

উপকূলে নিয়োজিত গণফৌজের অধিনায়ক গুভাঁ-র কাছে নাগরিক নিরাপত্তা পরিষদের প্রতিনিধি হিসেবে সিমুর্দাকে পাঠানো হলো এবং এ-ব্যাপারে তাকে পূর্ণ কর্তৃত্ব ও সর্বময় ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

আদেশক্রমে,
খুবেস্পিয়া-দান্তঁ-মাহা।
তারিখ: ২৮ জুন, ১৭৯৩।

পড়া শেষ করে তিন নেতার দিকে তাকাল সিমুর্দা। বলল, 'কনভেনশনের নিয়ম অনুসারে এই সনদপত্রকে লিখিতভাবে অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে। নইলে এটার কোনও বৈধতা নেই।'

'অসুবিধে নেই। আগামীকালই অনুমোদন করিয়ে নেব আমরা,' বলল খুবেস্পিয়া। 'আপনি থাকেন কোথায়?'

'কোর্ট অভ কমার্সে।'

'আরে, আমিও তো ওখানেই থাকি,' বলল দান্তঁ। 'আপনি দেখছি আমার প্রতিবেশী, সিমুর্দা!'

'এখন আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই,' বলল খুবেস্পিয়া। 'সনদটা আপাতত প্রাথমিক অনুমোদন হিসেবে সঙ্গে রাখুন আপনি। আগামীকাল কমিটির সব সদস্যের সই করা পাকা নিয়োগপত্র পাবেন। আশা করি তারপর আর কোনও অসুবিধে হবে না আপনার। আপনি সৌভাগ্যবান, সিমুর্দা। অসীম ক্ষমতা নিয়ে উপকূলে যাবেন আপনি। গুভাঁকে চাইলে সেনাপতি রাখতে পারবেন, কিংবা ওকে পাঠাতে পারবেন বধ্যভূমিতে! সব নির্ভর করবে আপনার ইচ্ছের উপর। যা হোক, আগামীকাল তিনটায় যোগাযোগ করবেন আমাদের সঙ্গে... নিয়োগপত্রের জন্য।'

'তা হলে আমি চারটার সময়ই রওনা হয়ে যাব উপকূলের উদ্দেশে,' বলল সিমুর্দা।

'খুব ভাল। এখন তা হলে ওঠা যাক।'

সভা ভেঙে গেল।

দশ

এবার আমরা কনভেনশনের দিকে নজর দেব।

হিমালয়ের মত পাহাড় যেমন একটাই আছে, তেমনি কনভেনশনের মত সংস্থাও দুনিয়ায় একটাই। যতদিন ওটার অস্তিত্ব ছিল, কেউ তার মর্ম বোঝেনি। কারণ যা কিছু বিরাট... যা কিছু বড়... তাকে আমরা ভয় করি, তাকে বোঝার চেষ্টা করি

না। উঁচু পাহাড়ে উঠতে চাই না আমরা, কারণ পা হড়কালে পতনটা হবে নিশ্চিত মৃত্যুর শামিল। পাহাড়ের উচ্চতা বা মহত্ত্ব চোখে পড়ে না আমাদের, তার বদলে মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে তলদেশে পতনের আশঙ্কা। কনভেনশনের বেলাতেও প্রথমে এমনই এক ভয় জেগেছিল মানুষের মনে।

তারপরেও... ফরাসি বিপ্লবের পটভূমিতে কনভেনশনের অভ্রভেদী ভূমিকা সম্পর্কে না বললেই নয়।

১৭৮৯-এর ১৪ই জুলাই ও ১৭৯২-এর ১০ই আগস্টের বিক্ষোভ আর অশান্তির পর ৯২-এর ২১শে সেপ্টেম্বরে এল জলবিষুব-সংক্রান্তির মত এক ভারসাম্য। সাম্য আর ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে সেদিনই ঘোষণা করা হলো ফরাসি প্রজাতন্ত্রের। দেশের জনগণ তা সাদরে বরণ করে নিল।

প্রজাতন্ত্রের বাস্তব রূপায়নের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় কনভেনশন। শুরুতে এক রাইডিং স্কুলের হলঘরে বসত এর অধিবেশন। ১৭৯৩-পর ১০ই মে তা স্থানান্তর করা হয় তুলেরি রাজপ্রাসাদে। রাজার রঙ্গশালার বিশাল হলঘরটা হয়ে ওঠে ফ্রান্সের নীতি-নির্ধারণের কেন্দ্রস্থল। ওখানে ঢোকার মুখে, বড় বড় দুটো জানালার মাঝখানে স্থাপন করা হয়েছিল স্বাধীনতার দেবীর বিশাল এক মূর্তি। হলঘরটা বিশাল—চল্লিশ মিটার দীর্ঘ, দশ মিটার চওড়া, এগারো মিটার উঁচু। অধিবেশন অনুষ্ঠানের জন্য মানানসই। প্রায় দু'হাজার লোকের জায়গা হতো ওখানে। অধিবেশন বসত দিনে দু'বার—দিনে ও রাতে।

হলঘরের মাথায়, ঠিক মাঝ বরাবর বসতেন কনভেশনের প্রেসিডেন্ট। তাঁর চেয়ার ছিল গদিমোড়া, ফ্রেমটা গিল্টি করা। সামনের টেবিলটার পায়া ছিল না। তার বদলে ছিল দাঁড়ানো চার ডানাঅলা একটা দৈত্যের মূর্তি—বিপ্লবের প্রতিচ্ছবি ছিল যেন

ওটা। টেবিলের উপরে থাকত একটা ঘণ্টা, তামার দোয়াত আর দরকারি কাগজপত্রের মোটাসোটা একটা ফাইল। একপাশে ছিল উঁচু বক্তৃতামঞ্চ। সিঁড়ির নয়টা ধাপ বেয়ে উঠতে হতো ওখানে। মঞ্চের দু'পাশে ছিল বারো ফুট উঁচু দুটো বাতিদান, তাতে লাগানো থাকত চার জোড়া বাতি।

বক্তৃতামঞ্চের দু'দিকে বসানো হয়েছিল অনেকগুলো বেঞ্চ—প্রজাতন্ত্রের প্রতিনিধিদের বসবার জন্য। হলঘরের ভিতরে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কাজকর্মের নীতি-নির্ধারণ করা হতো তিনটি কমিটির মাধ্যমে। এসব কমিটির সভা বসত তিনটি প্যাভিলিয়ন, বা চত্বরে। প্যাভিলিয়ন অভ ইকুয়ালিটি, বা সাম্যের চত্বরে চলত আইন, কৃষি আর বাণিজ্যসংক্রান্ত কাজকর্ম; প্যাভিলিয়ন অভ লিবার্টি, বা স্বাধীনতার চত্বরে চলত নৌ, উপনিবেশ, অর্থ আর জন-নিরাপত্তা বিষয়ক কাজ; আর প্যাভিলিয়ন অভ ইউনিটি, বা ঐক্যের চত্বরে কাজ হতো যুদ্ধ আর সেনাবিভাগ নিয়ে।

দিনের বেলায় জানালাগুলো দিয়ে যতটুকু আলো ঢুকত হলঘরে, তাতে ভিতরটা ঠিকমত আলোকিত হতো না। রাতের বেলাতেও বাতির সংখ্যা ছিল অপ্রতুল। ফলে ছায়া ছায়া একটা পরিবেশ বিরাজ করত সবসময়। প্রতিনিধিরা ঠিকমত পরস্পরের চেহারা দেখতে পেত না। ফলে এক ধরনের গুমোট ও রহস্যময় পরিবেশে অনুষ্ঠিত হতো অধিবেশন।

দুনিয়ার যে-কোনও বিপ্লবের সঙ্গেই বর্বরোচিত উচ্ছ্বাস আর আতিশয্য মিশে থাকে... জড়িয়ে থাকে। তবে কনভেশনের এই হলঘরের ভিতরে সেই উচ্ছ্বসিত বর্বরতার সঙ্গে মিশে ছিল এক অদ্ভুত শৃঙ্খলাবোধ। ওখানে ঢুকলে সবকিছু ভুলে যেত সবাই। ভুলে যেত যে, কামরাটা এককালে রাজার রঙ্গশালা ছিল... ছিল

তাঁর আমোদ-প্রমোদের স্থান। অমন একটা ঘৃণ্য জায়গা শুধুমাত্র কনভেশনের বদৌলতে পেতে শুরু করেছিল পরম সম্মান। নানা গোত্রের, নানা পেশার, নানা স্বভাবের মানুষের এক আশ্চর্য মিলনমেলা হয়ে উঠত জায়গাটা।

অধিবেশনের বামদিকে বসত দৈহিক শক্তিতে বলীয়ান ও ক্ষমতাশালীরা। ডানে বসত চিন্তাবিদ ও তাত্ত্বিকেরা। একদিকে বসত বুইসো, বারবাহু, কাহ্‌ভেলেগ, জাখ্‌সোনি, সাল, সিলেহি, লস-দুপেহে আর রাবুঁ সাঁতিয়েনের মত বীর যোদ্ধারা; অন্যদিকে ছিল ফ্লহেল দু সাঁনজাস, মেহ্‌লান দু থুয়েনভিল, মেহ্‌লান দু দুয়ে, সুবহোনি, বিউভাহেন আর বেন্তাবোলের মত নামকরা দার্শনিকেরা।

এই দুই দলের মাঝখানে বসত খুবেস্পিয়া, মাহা, দান্তঁ, লুকোয়া পিহাভু, খুবার লান্দে, তাঁইয়া, ক্যাম্বাসেহেস, বুহ্‌দোন দো লয়েস আর ভার্জিনোর মত নেতারা। সবকিছুর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নির্ভর করত ওদের উপরে। স্বভাবে বড়ই স্বার্থপর ও সন্দেহপ্রবণ ছিল এরা। একদিকে যেমন বিপ্লবের সেবা করত, অন্যদিকে তেমনি এক গোপন অবিশ্বাস ও সন্দেহে ভুগত। রাজা ষোড়শ লুইকে এরা প্রথমে ভার্জিনোর হাতে তুলে দেয়, ভার্জিনো আবার তাকে তুলে দেয় দান্তঁ-র হাতে। তার কাছ থেকে তাঁইয়া... সবশেষে খুবেস্পিয়া পায় রাজার দায়িত্ব। খুবেস্পিয়াই শেষ পর্যন্ত তাঁকে গিলোটিনে চড়ায়।

কনভেনশনের ইতিহাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, রাজার বিচার। সংক্ষিপ্ত সেই বিচার শেষে ১৭৯৩-এর ২১ জানুয়ারি হত্যা করা হয় ষোড়শ লুইকে। রাজতন্ত্রের যে-মশালটি আঠারোশ' বছর ধরে ফ্রান্সের বুকের উপর অনির্বাণভাবে জ্বলে আসছিল, সেটাকে এক ফুঁৎকারে নিভিয়ে দেয় কনভেনশনের

প্রতিনিধিরা। একজন রাজাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে অতীতের সমস্ত রাজার বিচার করে ওরা। সকল রাজার পুঞ্জীভূত শাস্তির বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয় একজন রাজার উপরে।

ভাগ্যের নির্মম পরিহাস এ-ই যে, ষোড়শ লুইকে যারা গিলোটিনে চড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল, তারা নিজেরাও অল্প সময়ের ব্যবধানে একই পরিণতি বরণ করতে বাধ্য হয়। খুবেস্পিয়াকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় তার আঠারো মাস পরে, দান্তঁকে পনেরো মাস, আর ভার্জিনোকে মাত্র ন'মাস পরে। মাহা আততায়ীর হাতে খুন হয় রাজার মৃত্যুর মাত্র পাঁচ মাস পরে।

বিপ্লব শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল, কিন্তু কনভেনশন তার স্বল্প স্থায়িত্বকালে বেশ কিছু ভাল কাজও করেছিল। আসলে... কনভেনশনটা ছিল যেন এক জ্বলন্ত চুলোর উপরে উত্তপ্ত কড়াই। সেই তাপে ফরাসি জনগণের মাঝে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বেশ কিছু লুপ্তপ্রায় গুণ—ন্যায় বিচার, সহিষ্ণুতা, সদাশয়তা, স্বাধিকারবোধ, সত্য আর প্রেম।

স্বতঃসিদ্ধ সত্যের মত একটা কথা ঘোষণা করত কনভেনশন। তা হলো... প্রতিটি নাগরিকের ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিসীমা ততটুকুই, যেখান থেকে আরেকজনের ব্যক্তি স্বাধীনতা শুরু হচ্ছে। এই সীমারেখার মাঝেই লুকিয়ে আছে সামাজিক আইনতত্ত্বের মূল তাৎপর্য। কনভেনশন যেসব আইন পাশ করত, তাতে দারিদ্র্য আর পঙ্গুত্বকে পবিত্র বলে গণ্য করা হতো। বলে দেয়া হতো, কেউ যেন দরিদ্র, অন্ধ, বধির বা মূক ব্যক্তিকে ঘৃণা বা অসম্মান না করে। কুমারী মাতাদের সমাজচ্যুত না করবার ব্যাপারেও আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল। অনাথ শিশুদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল রাষ্ট্রকে। কনভেনশন দাস ব্যবসাকে নিষিদ্ধ করে দেয়, এবং ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদ করে। দেশের বড় বড়

শহরগুলোয় সরকারি স্কুল স্থাপন করা হয়। অঙ্কশাস্ত্রে দশমিক প্রথার প্রচলন করা হয়। স্থাপন করা হয় বহু সঙ্গীত অ্যাকাডেমি ও মিউজিয়াম। চাঙ্গা করে তোলা হয় অর্থনীতিকে। রাজতন্ত্রের আমলে দেশের কোষাগার ছিল শূন্য, কিন্তু বিপ্লবীরা সেই কোষাগার আবার ভরিয়ে তোলে। সাধারণ জনগণকে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ দেয়ার নিয়মও চালু করে ওরা। বিজ্ঞানের উন্নতির জন্যও গঠন করা হয় বেশ কিছু সংস্থা।

কনভেনশন তার আয়ুষ্কালের মধ্যে মোট এগারো হাজার দুইশ' দশটি আইনের বিধান রচনা করে। এর মধ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বেশ কিছু আইন থাকলেও অধিকাংশই ছিল মানুষের মঙ্গল সাধনের জন্য। বিশ্বজনীন এক নীতিবোধকে সমাজের ভিত্তি আর বিবেকবুদ্ধিকে আইনের ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে ওরা। সব ধরনের দাসত্বের উচ্ছেদ ঘটানো হয়, বিশ্বভ্রাতৃত্বের ঘোষণা দেয়া হয়, সুরক্ষিত করা হয় মানবতা আর মানবাধিকারকে। প্রতিষ্ঠা করা হয় শ্রমিকের অধিকার আর শ্রমের মর্যাদা। জাতীয় সম্পদ ও শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়। ব্যবস্থা করা হয় শিশুশিক্ষার। উন্নতিসাধন করা হয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচারব্যবস্থার। সোজা কথায়, কনভেনশন এমন সব নীতি গ্রহণ করে, যার ফলে সব শ্রেণীর মানুষের দুঃখ-দুর্দশার লাঘব হয়।

এ-সবই নির্ধারিত হতো অদ্ভুত সেই মিলনমেলায়। মানবিক, অমানবিক আর অতি-মানবিক পরস্পরবিরুদ্ধ শক্তির এক আশ্চর্য সমন্বয় হতো কনভেনশনে। প্রতিটা অধিবেশনে চলত কথা কাটাকাটি আর ঝগড়া। বক্তার সংখ্যা বেশি থাকায় একের পর এক জ্বালাময়ী বক্তৃতায় উত্তপ্ত হয়ে উঠত সভাগৃহ। ধৈর্য হারিয়ে পরস্পরকে ভীতি প্রদর্শন যেন একটা সাধারণ রীতি হয়ে

দাঁড়িয়েছিল কনভেনশনের সদস্যদের মাঝে। দর্শকদেরও সুযোগ ছিল আলোচনায় অংশগ্রহণের, সেই স্বাধীনতা তারা ব্যবহার করত পুরোপুরিভাবে।

আসলে... কনভেনশনের সদস্য মানেই যেন সমুদ্রের এক একটা ঢেউ। এক অদম্য অপরিমেয় ভাবধারার প্রচণ্ড ঝড় আকাশ থেকে নেমে এসে সমুদ্রতরঙ্গের মতই তাদেরকে উত্তাল করে তুলেছিল। এই ঝড় বিপ্লবের ঝড়। তার দাপটে তারা একে অন্যের উপর আছড়ে পড়ত ঢেউয়েরই মত। ঝড়টা তাদেরকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তা বুঝত না কেউ... কেবলই ঘুরপাক খেত ঝড়ের প্রকোপে। গোটা বিপ্লবের দশাই ছিল ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সাগরের মত।

বিপ্লবের শক্তি সামুদ্রিক ঝড়ের মতই অজ্ঞাত। সে শক্তি ভাল হোক, বা মন্দ... তার সামনে আত্মসমর্পণ না করে পারে না মানুষ। বিপ্লবের সময় যে-সব ঘটনা ঘটে, তা মানুষই ঘটায় বটে... কিন্তু সে-সব মানুষ পরিচালিত হয় ঘটনাপ্রবাহে। ঘটনার স্রোতই মানুষকে চালিয়ে নিয়ে যায় নিষ্ঠুরভাবে। সেই স্রোত তাণ্ডব ঘটায়, ভাঙচুর করে, ধ্বংস করে দেয় সামনে যা পড়ে। কারও কিছু করার থাকে না।

বিপ্লবের এই প্রচণ্ড ঝড় যখন মানবসভ্যতাকে একদিক থেকে ভেঙে আরেকদিক থেকে গড়ে, তখন তার ভালমন্দ কেউ বিচার করতে পারে না। এ-কারণেই বিপ্লবীদের প্রশংসা বা নিন্দা করবার কোনও মানে হয় না। যা ঘটবার তা ঘটবেই, যে-ঝড় বইবার তা বইবেই। তবে সব ঝড়-ঝঞ্ঝার উপরে তারাখচিত আকাশ যেমন অটল অনন্ত প্রশান্তি নিয়ে বিরাজ করে, তেমনি সমস্ত বিপ্লব আর বিদ্রোহের বহু ঊর্ধ্বে অক্ষয়ভাবে বিরাজ করে সত্য আর ন্যায়। যা-ই করুক মানুষ, কোনোদিন তার পতন হয়

না।

কনভেনশন ছিল বিপ্লবের এমনই এক অদ্ভুত ফসল—অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ে শান্তি আর মুক্তির কাণ্ডারী। যত সব অন্ধকারের জীবেরা, যত সব অশুভ শক্তি সবদিক থেকে হামলা চালাত এর উপরে। কিন্তু সব আক্রমণ প্রতিহত করে, সব ষড়যন্ত্র ছিন্ন করে সংস্থাটা তার কাজ চালিয়ে গেছে। আর তা সম্ভব হয়েছিল দৃঢ়চিত্ত সদস্যদের কারণে... সেইসঙ্গে সাধারণ জনতার সমর্থনে।

কনভেনশন যে আশ্চর্য বাতাসের বেগে নিয়ন্ত্রিত হতো, তা জনতার মুখ থেকে বইলেও আসলে ওটা ছিল ঈশ্বরের নিঃশ্বাস। আজও যদি কেউ গভীরভাবে কনভেনশনের কথা ভাবেন, তা হলে তার সামনে দিয়ে অসংখ্য মানুষের এক দীর্ঘ ছায়ামিছিল চলে যাবে... তাকে ভাবিয়ে তুলবে তীব্রভাবে, তার অন্তরকে আলোড়িত করে তুলবে প্রচণ্ডভাবে।

এবার আমরা ফিরে যাব আমাদের কাহিনিতে।

এগারো

রু দু পঁ-তে নেয়া সিদ্ধান্ত অনুসারে পরদিন কনভেনশনে হাজির হলো মাহা।

তুলেরি রাজপ্রাসাদে ঢুকতেই দেখা হয়ে গেল লুই দু মন্ত

আর শ্যাবু নামে দুই সদস্যের সঙ্গে। কনভেনশনের চিরাচরিত নিয়মে ঝগড়ায় লিপ্ত তারা।

'তুমি একজন সিদ্‌ভঁ*!' রাগী গলায় বলে উঠল শ্যাবু।

'আমি সামন্ত?' খেপে উঠল মন্তু। 'কেন বললে এমন কথা?'

'কারণ তুমি তা-ই।'

'আমি?'

'হ্যাঁ। আগে তুমি মাহ্‌খি ছিলে।'

'কক্ষনো না।'

'মিথ্যে কথা।'

'মিথ্যে বলছি না। আমার বাবা ছিলেন সৈনিক, আর আমার দাদা ছিলেন তাঁতী।'

'ওসব আষাঢ়ে গল্প অন্য কোথাও শোনাও, মন্তু।'

'আমার নাম এখন আর মন্তু নয়।'

'তা হলে কী তোমার নাম?'

'এখন আমি নিজেকে মাহিবুঁ বলে পরিচয় দিই।'

'নাম বদলালে অতীত বদলায় না। কোনও মাহ্‌খির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নেই।'

বারান্দার বাঁ দিকে থমকে দাঁড়িয়ে মন্তু আর শ্যাবু-র দিকে একটু তাকাল মাহা। তারপর আবার পা বাড়াল।

ও সভাকক্ষে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে একটা চাপা গুঞ্জন উঠল। তবে ওর সঙ্গে কথা বলবার জন্য এগিয়ে এল না কেউ, ও-ও কারও সঙ্গে কথা বলল না, কারও কথায় কান দিল না। কে কী বলছে না বলছে, তাতে কিছু যায় আসে না।

'দেখো, দেখো! মাহা এসেছে!' বলতে শোনা গেল

সিদ্‌ভঁ (Ci-devant)—প্রাক্তন সাঁমন্ত, বা অভিজাত বংশীয় ভদ্রলোক; বিপ্লবের ফলে যিনি স্বীয় অবস্থানচ্যুত হয়েছেন।

একজনকে।

'ও তা হলে অসুস্থ নয়?'

'অসুস্থই মনে হচ্ছে। দেখছ না, ড্রেসিং গাউন পরে চলে এসেছে?'

'ড্রেসিং গাউন!'

'হ্যাঁ।'

'এমন একটা পোশাক পরে কনভেনশনে আসার সাহস হলো ওর! এর তো দেখছি অবাধ স্বাধীনতা!'

'এ আর এমন কী? আগে একদিন মাথায় পাতার মুকুট পরে এসেছিল। তখন যেহেতু কিছু বলা হয়নি, আজ তো ড্রেসিং গাউন পরবেই!'

'গাউনটা নতুন মনে হচ্ছে।'

'হুঁ।'

'কী দিয়ে তৈরি গাউনটা?'

'সূতি। তবে যথেষ্ট দামি।'

'আবার লম্বা ডোরা কাটা।'

'সামনের ল্যাপেলটা দেখো।'

'চামড়ার নাকি? বাঘের চামড়া?'

'নাহ্। অন্য কোনও জানোয়ার।'

'মোজাটা দেখেছ?'

'একদমই ভাল দেখাচ্ছে না।'

'রূপার বকলেস-অলা জুতোও পরেছে! গাউনের সঙ্গে মোটেই মানাচ্ছে না।'

'ঠিক বলেছ। কীসের সঙ্গে কী যায়, সে-ব্যাপারে ওর কোনও ধারণাই নেই।'

হলঘরের অনেকে অবশ্য না দেখার ভান করল মাহাকে।

তারা অন্য আলোচনায় ব্যস্ত। যেমন সন্তুনাক আর দুঁসো নামে দুই সদস্য... তারা গল্প করছিল আরেকটা ব্যাপার নিয়ে।

সন্তুনাক বলছিল, 'শুনেছ নাকি, দুঁসো?'

'কী?' পাল্টা প্রশ্ন করল দুঁসো।

'কাউন্ট দু ব্রিয়েনের খবর?'

'যিনি ডিউক দু ভিলেহুয়া-র সঙ্গে সৈন্যবিভাগে কাজ করতেন?'

'হ্যাঁ।'

'দু'জনকেই চিনি। কী হয়েছে ওদের?'

'ভীরুর দল... কারও মাথায় লাল টুপি দেখলেই সালাম ঠুকত। শুনেছি কিছুদিন আগে একবার তাস খেলতেও অস্বীকৃতি জানিয়েছিল, কারণ কার্ডে রাজা-রানির ছবি ছিল।'

'হুম। তারপর?'

'গতকাল গিলোটিনে চড়ানো হয়েছে ওদের।'

'তাই নাকি? দুজনকেই?'

'হ্যাঁ।'

'কারাগারে ছিল নিশ্চয়ই? কেমন আচরণ করেছে ওখানে?'

'কাপুরুষের মত।'

'আর বধ্যভূমিতে?'

'ওখানে অবশ্য যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়েছে। কারও কাছে ক্ষমা চায়নি, প্রাণভিক্ষাও চায়নি।'

'নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিল, ওভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মরা ভাল।'

বাহের নামে এক সদস্য তখন অধিবেশনের মাঝে একটা রিপোর্ট পড়ে শোনাচ্ছে। রিপোর্টটা ভঁদি সম্পর্কে। নান্তে শহরকে দখলমুক্ত করবার জন্য মর্বিয়ো-র নয়শো লোক কামান নিয়ে

রওনা হয়েছে। বিদ্রোহী কৃষকরা রুদোঁ আক্রমণ করতে চলেছে, ইতোমধ্যে আক্রান্ত হয়েছে পামবুফ। উপকূলে আগ্রাসন ঠেকোবার জন্য টহল দিচ্ছে ফরাসি নৌবহরের কয়েকটা জাহাজ, মারি-র দিকটায় বেশি নজর দিচ্ছে তারা। এ ছাড়া আনগ্রান্দ থেকে মাখ্ পর্যন্ত পূর্ব তীর রাজতন্ত্রী সেনাদল পাহারা দিচ্ছে। ও-পথে কাউকে ঢুকতে দেবে না তারা। ওদিকে পহ্নিক-এ মিছিল করেছে দশ হাজার কৃষকসেনা। তারা শ্লোগান দিচ্ছিল, ইংরেজরা দীর্ঘজীবী হোক। যুদ্ধের ময়দান থেকে সন্ত্যাখের পাঠানো একটা চিঠিতে রয়েছে এইসব তথ্য, ওটাই অধিবেশনে পড়ে শোনাচ্ছে বাহের।

'...সাত হাজার বিদ্রোহী *ভান* শহরে আক্রমণ চালিয়েছিল। পাল্টা আঘাত হেনে তাদেরকে হারিয়ে দিয়েছি আমরা। চারটা কামান ফেলে পালিয়ে গেছে ওরা...'

একজন সদস্য বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কতজনকে বন্দি করেছে ওরা?'

'একজনও না,' বলল বাহের। 'কাউকে জ্যান্ত রাখেনি সন্ত্যাখের সৈন্যরা। অমনটাই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।'

চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল মাহা, কিছুই যেন তার কানে যাচ্ছে না। কী যেন ভাবছে। হাতের মুঠোয় একটা কাগজ ধরে রেখেছে সে... একটা চিঠি—তার জিজ্ঞাসার জবাবে চিঠিটা পাঠিয়েছে বিপ্লবী আরেক নেতা মুমুহ। সে লিখেছে, নাগরিক নিরাপত্তা পরিষদের প্রতিনিধি হিসেবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে-সব কমিশনারকে পাঠানো হয়েছে, তাদেরকে পূর্ণ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। একেকজন কমিশনার রাজার চেয়ে বেশি ক্ষমতাবান। ইচ্ছেমাফিক যা-খুশি-তাই করতে পারবে তারা, এর জন্য কারও কাছে জবাবদিহি করতে হবে না। কমিশনারের কথায় খোদ

প্রধান সেনাপতিও চলতে বাধ্য।

খানিক পরে চিঠিটা পকেটে ভরে মন্তু আর শ্যাবুর দিকে এগিয়ে গেল মাহা। ওরা তখন নতুন আলাপ জুড়েছে।

'শোনো, মন্তু,' বলছে শ্যাবু, 'আমি এইমাত্র নাগরিক নিরাপত্তা পরিষদের সভা থেকে এলাম।'

'তা-ই? কী আলোচনা হলো আজ?' জিজ্ঞেস করল মন্তু।

'একজন যাজককে পাঠানো হচ্ছে উপকূলে... একজন সামন্তের উপরে খবরদারি রাখার জন্য।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। তোমারই মত সামন্ত।'

'আমি সামন্ত নই।

'সামন্তকে আঙুলের ডগায় নাচাবে একজন যাজক।'

'তোমার মত?'

'আমি যাজক নই।'

হাসল দু'জনেই।

মন্তু বলল, 'ব্যাপারটা খুলে বলো তো।'

'তা হলে শোনো, সিমুর্দা নামে এক যাজককে পূর্ণ ক্ষমতা দিয়ে পাঠানো হচ্ছে গুভাঁ নামে এক ভাইকাউণ্টের কাছে। এই ভাইকাউণ্ট আমাদের উপকূলে নিয়োজিত বাহিনীর অধিনায়ক।'

'আসলে কে কার উপরে নজরদারি করবে? ভাইকাউণ্টের উপরে যাজক, নাকি যাজকের উপরে ভাইকাউণ্ট? ওদের কাউকেই আমি বিশ্বাস করি না।'

'এ-ব্যাপারে একটু কথা বলতে পারি?' বলে উঠল মাহা।

ঘাড় ফেরাল শ্যাবু। 'সুপ্রভাত, মাহা। কী খবর? আজকাল তো অধিবেশনে আপনাকে পাওয়াই যায় না!'

'আমার শরীর খারাপ,' বলল মাহা। 'ডাক্তার ঘর থেকে

বেরুতে নিষেধ করেছে। চামড়ার ব্যারাম... ওষুধ মেশানো পানিতে দিনের অনেকটা সময় আমাকে শরীর ডুবিয়ে বসে থাকতে হয়।'

'বাথটাবে? সাবধান, সিনেকা কিন্তু বাথটাবে মারা গিয়েছিল!' ঠাট্টা করল মন্তু।

'তাকে খুন করেছিল নিরো,' নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল মাহা। 'এখানে তেমন কোনও নিরো নেই।'

'তা তো বটেই। নিরোর মত শয়তান যদি কেউ থাকে এ-তল্লাটে, সেটা তুমিই!'

কণ্ঠটা নতুন। সেদিকে ফিরতেই দান্তঁকে দেখতে পেল মাহা। বাঁকা একটা হাসি দিয়ে নিজের আসনের দিকে চলে গেল সে। মুখ টিপে হাসতে থাকল মন্তু আর শ্যাবু।

ওদের দিকে ফিরে বিরক্ত গলায় মাহা বলল, 'হাসি থামাবে? আমি একটা জরুরি কথা বলতে এসেছি।'

'নিশ্চয়ই,' তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিল শ্যাবু। 'বলুন কী বলবেন।'

'আজকের অধিবেশনে একটা বিল উত্থাপন করতে সাহায্য চাই তোমাদের।'

'আমার দিকে তাকাবেন না,' বলল মন্তু। 'আমার কথা শুনতে চায় না। ওরা ভাবে আমি প্রাক্তন মাহ্‌খি।'

'আমার কথাও শোনে না,' সুর মেলাল শ্যাবু। 'কারণ আমি ক্যাপুচিন।'

'আর আমি মাহা, আমার কথা না শোনার পিছনে ওটাই সবচেয়ে বড় কারণ,' বলল মাহা। 'কিন্তু তারপরেও বিলটা পাশ করানো জরুরি। আমরা তিনজনে যদি সমর্থন দিই, হয়তো কিছুটা গুরুত্ব বাড়তে পারে।'

'কীসের বিল?' জিজ্ঞেস করল শ্যাবু।

'আমি একটা নতুন আইন চাই, যাতে আমাদের কোনও সেনানায়ক শত্রুপক্ষের বন্দিকে ছেড়ে দিলে তার মৃত্যুদণ্ড হয়।'

'এ বিধান তো আছে!' বলল শ্যাবু। 'গত এপ্রিলেই এমন একটা আইন করা হয়েছে।'

'তা হলে ধরে নিতে হবে, আইনটাকে কাজে পরিণত করছে না কেউ,' বলল মাহা। 'ভঁদিতে আমাদের সেনানায়করা খেয়ালখুশিমত বন্দিকে মুক্তি দিচ্ছে... তাদের শাস্তি মওকুফ করে দিচ্ছে! এভাবে চলতে পারে না।'

'আপনি আইনটার প্রয়োগ ঘটাতে চাইছেন?'

'নিঃসন্দেহে।'

'তা হলে কনভেনশনে জ্বালাময়ী একটা বক্তৃতা দিতে হবে আপনাকে।'

'কনভেশনের কোনও প্রয়োজন নেই। নাগরিক নিরাপত্তা পরিষদকে রাজি করাতে পারলেই চলে।'

'সেক্ষেত্রে পরিষদের পক্ষ থেকে একটা আদেশ পাঠাতে হবে সব কমিউনে। যুদ্ধক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি টাঙাতে হবে। সেইসঙ্গে যদি উচ্চপদস্থ দু'চারজনকে ফাঁসিতে ঝোলাতে পারেন, উদ্দেশ্য সফল হবে আপনার।'

'সোজা কথায়, দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে আপনাকে,' যোগ করল মন্তু।

'আমি তা-ই চাই,' মাথা ঝাঁকাল মাহা।

'আপনি নিজেই কমিটির মিটিঙে গিয়ে এই কথাগুলো বলছেন না কেন?'

অস্বস্তি নিয়ে মন্তু আর শ্যাবু-র দিকে তাকাল মাহা। বলল, 'ওদের অধিবেশন বসে খুবেস্পিয়ার বাড়িতে। আমি ওখানে যাই

না।'

'হুম!' বলল শ্যাবু। 'আপনি আমাদেরকে পাঠাতে চাইছেন এ-কাজে?'

'হ্যাঁ।'

'আমি এতে কোনও অসুবিধে দেখছি না,' বলল মন্তু। 'যেতে আপত্তি নেই আমার।'

'আমারও,' বলল শ্যাবু।

'ধন্যবাদ, বন্ধুরা। বিপ্লব সফল হোক।'

পরদিন সকালেই নাগরিক নিরাপত্তা পরিষদের পক্ষ থেকে একটা আদেশ জারি করা হলো... পাঠিয়ে দেয়া হলো ভঁদির সমস্ত গ্রাম ও শহরে। তাতে বলা হলো, প্রজাতন্ত্রী কোনও সৈনিক বা যোদ্ধা যদি বিদ্রোহী কোনও বন্দিকে হাতে পেয়েও ছেড়ে দেয়, তা হলে তাকে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করতে হবে।

এ-ব্যাপারে এটা ছিল প্রথম পদক্ষেপ। এর কয়েক মাস পরে, ১৭৯৩-এর নভেম্বরে আরেকটা আদেশ জারি করা হয়। তাতে বলা হয়, কোনও গ্রাম বা শহর যদি বিদ্রোহীদের আশ্রয় দেয়, তা হলে সেই গ্রাম বা শহর একেবারে ধ্বংস করে দেয়া হবে। ফরাসি প্রজাতন্ত্রীদের এই চরম নীতির জবাবে ইয়োরোপের অন্যান্য দেশেও আইন চালু করা হয়—সশস্ত্র কোনও ফরাসি প্রজাতন্ত্রীকে দেখামাত্র গুলি করতে হবে।

বর্বরতার বিরুদ্ধে এ যেন নিষ্ঠুরতা!

বারো

সেকালে ব্রিটানিতে সাতটা কুখ্যাত অরণ্য ছিল। ভঁদির যুদ্ধে অরণ্যগুলোর ভূমিকা ছিল অসীম। খোলা ময়দানের বদলে অন্ধকারাচ্ছন্ন অরণ্যকে যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছিল বিদ্রোহীরা। সেখানে ওরা বাড়তি সুবিধা পেত।

এ-ব্যাপারে প্রথমেই বলতে হয় ফুজের অরণ্যের কথা। এর অবস্থান ছিল দোউল আর অ্যাভ্রঁশ-এর মধ্যবর্তী অঞ্চলে। এরপর আসে প্রাসিঁ অরণ্য—ষোল ক্রোশ বিস্তৃত। পাম্পোঁ-র অরণ্য ছিল গিরিখাত আর নদীতে ভরা—বিনিউমের দিক থেকে দুর্ভেদ্য, কিন্তু রাজতন্ত্রীদের শক্ত ঘাঁটি কঙ্কোনে থেকে সহজে পৌঁছুনো যেত ওখানে। এরপর আসে রেহ্ন অরণ্য—প্রজাতন্ত্রী গ্রাম আর শহরগুলোর উপর সহজে হামলা করা যায় ওখান থেকে। মাশ্কু অরণ্যে ছিল দুর্ধর্ষ বিদ্রোহী শ্যাহেত-এর আস্তানা। গাখ্নাশ অরণ্য ছিল লা ত্রেমুয়ে, গুভাঁ আর রোহানদের দখলে। দখলমুক্ত ছিল একমাত্র বুহ্সেলিয়ন অরণ্য। লোকে বলত, ওখানে ভূত-প্রেত আর পরীরা ঘুরে বেড়ায়।

ফঁতেনে-র ভাইকাউন্ট, অর্থাৎ ব্রিটানির যুবরাজ এই সাতটা অরণ্যের মালিক। স্বায়ত্ত্বশাসনের সুবিধে পান এই ভাইকাউন্ট, ফরাসি রাজার সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই। ১৭৯২ থেকে

১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অরণ্যগুলো হয়ে ওঠে সবার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু। কারণ ওখানেই তখন ফ্রান্সের ভাগ্য নির্ধারিত হচ্ছিল। দেশের নিয়তি হয়ে দেখা দিয়েছিল ভঁদির যুদ্ধ।

ভঁদির ব্যাপারটা যদি কেউ ঠিকমত বুঝতে চায়, তা হলে তাকে দুটো পক্ষের কথা চিন্তা করতে হবে। একদিকে ফরাসি বিপ্লবের সূচনাকারী প্রজাতন্ত্র, অন্যদিকে ব্রিটানির মেহনতি ও বঞ্চিত কৃষকসমাজ। অসম দুই প্রতিপক্ষের মাঝে আসলে কোনও রকমের তুলনা চলে না... অন্তত জঙ্গলের লড়াইয়ে। ব্রিটানির অধিবাসীদের জন্য অরণ্যগুলো ছিল দ্বিতীয় আবাস। খাদ্য-পানীয়ের সরবরাহ ছাড়াই ওখানে ওরা থাকতে পারত মাসের পর মাস। জঙ্গলের ফলমূল আর নদীর পানি দিয়ে তারা সহজেই মেটাতে পারত নিজেদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা। দূর থেকে যে-কোনও শব্দ শুনেই তারা বলতে পারত কীসের আওয়াজ হচ্ছে। ওখানে ওদেরকে ঘায়েল করা ছিল দুঃসাধ্য।

আসলে... ব্রিটানির বনগুলো ছিল গাছপালায় ঢাকা একেকটা দুর্গ। অবিচ্ছেদ্য লতাপাতা আর কাঁটাঝোপের মাঝে, গাছগাছালির সবুজ আড়ালে, এবং মাটির তলায় তৈরি করা হয়েছিল অসংখ্য গুপ্ত আবাস। উপর থেকে বোঝাই যেত না, ওখানে কখনও কোনও মানুষের পক্ষে বাস করা সম্ভব। অরণ্যে আশ্রয় নেবার এই অভ্যেস ব্রিটানিবাসী করে নিয়েছে সেই দ্রুইদ আর ক্রমলেক আমল থেকে। তাই ছায়াচ্ছন্ন এই অরণ্যগুলো সুদূর অতীত থেকে দেশের রাজনৈতিক উত্থানপতনের ক্ষেত্রে বড় বড় ভূমিকা পালন করে এসেছে।

ফরাসি বিপ্লবেও ওগুলোর অবদান কম নয়। ভঁদির যুদ্ধ পরিচালিত হচ্ছিল অরণ্যগুলোর তলা থেকে। ভূগর্ভস্থ গুহা আর ঘরবাড়িতে আশ্রয় নেয়া বিদ্রোহীরা দক্ষহাতে ঘটাচ্ছিল

কৃষক-বিপ্লব। শত্রুর অপেক্ষায় তাদের অদৃশ্য সেনাবাহিনী ওঁৎ পেতে বসে থাকত সবসময়। অতর্কিতে উদয় হতো ওরা, কাজ সেরে আবার মিলিয়ে যেত হাওয়ায়। এই হয়তো দেখা গেল বানের জলের মত ছুটে আসছে যোদ্ধারা, আবার পরমুহূর্তেই দেখা গেল ধুলোর মেঘের মত কোথায় উড়ে গেল। ইচ্ছেমত আত্মগোপন বা আত্মপ্রকাশ করতে পারত ওরা।

বনের ভিতরে, নিরাপদ স্থানে কুঁড়েঘর বানিয়ে বাস করত মেয়েরা, আর পুরুষেরা বাস করত মাটির তলায় পরিখা খুঁড়ে। পরিখাগুলো মাটি আর ডালপাতা দিয়ে ঢাকা থাকত, উপর থেকে বোঝা যেত না। ভিতর থেকে সেই ডালপাতা সরিয়ে বেরিয়ে আসা যেত। ঘর থেকে খাবার তৈরি করে পরিখায় পৌঁছে দিত মেয়েরা। সব মিলিয়ে একেকটা অরণ্যকে শত্রুর জন্য মৃত্যুফাঁদ করে তুলেছিল বিপ্লবীরা। নীলদলের লোকেরা... অর্থাৎ বিপ্লবী প্রজাতন্ত্রীরা জঙ্গলে ঢুকবার সাহস পেত না।

সাদা দলের বিদ্রোহী সৈন্যরা অবশ্য মাটির তলায় থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়ত মাঝে মাঝে। আলো-বাতাসহীন অন্ধকার গর্ত থেকে তারা বেরিয়ে আসতে চাইত পৃথিবীর মুক্ত প্রকৃতিতে। দিনের বেলায় সেটা বিপজ্জনক বলে রাতে বেরুত ওরা, যোগ দিত নাচগানে। মাঝে মাঝে ছদ্মবেশ নিয়েও বিভিন্ন উৎসবে যোগ দিত ওরা।

যুদ্ধের ডামাডোলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল বনের পশুপাখিরা। খাবারের জন্য শিকার করা হতো ওদের, এলোমেলো গুলিতেও নিহত হতো নিরীহ জানোয়ারগুলো। গোলাবারুদের অভাব না থাকায় লড়াইয়ের সময় একটানা গুলি ছুঁড়ত প্রজাতন্ত্রীরা। অন্যদিকে রাজতন্ত্রীরা গুলি করত বেছে বেছে, নিশ্চিত হয়ে। শেষ পর্যন্ত দেখা যেত ওরাই প্রতিপক্ষকে

পিছু হটতে বাধ্য করছে। সাদা দলের সৈন্যদের বিরুদ্ধে কখনোই খুব একটা সুবিধা করতে পারত না নীল দল। আশপাশের জনপদগুলোও সাহায্য করত না তাদের।

প্রচুর গুপ্তচর ছিল রাজতন্ত্রীদের। বাইরে থেকে অতি দক্ষতার সঙ্গে সমস্ত খবর পাচার করত তারা। জঙ্গলের ভিতরে লুকিয়ে থাকলেও বাইরে কোথায় কী হচ্ছে, সে-সংবাদ ঠিকই পৌঁছে যেত বিদ্রোহীদের কাছে। রহস্যজনকভাবে অতি দ্রুত যে-কোনও খবর পেত ওরা। আশপাশের সমস্ত সেতু ভেঙে দিয়েছিল প্রজাতন্ত্রীরা। মাঝে মাঝে খাল কেটে পথঘাট বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। অবরোধ করে রেখেছিল বিভিন্ন এলাকা। তারপরেও বিদ্রোহীদের যোগাযোগ ব্যবস্থা কিছুতেই নষ্ট করতে পারেনি ওরা।

নানা রকম খবর নিয়ে বন থেকে বনান্তরে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে লোক যাতায়াত করত। প্রায় চার হাজার লোককে বার্তাবাহক হিসেবে নিয়োগ করেছিল বিদ্রোহীরা, সংবাদবাহী এসব দূতেরা ছিল ছদ্মবেশী ও নিবেদিতপ্রাণ। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করত তারা।

রীতিমত দুর্ধর্ষ ও নিষ্ঠুর ছিল সাদা দলের সৈন্যরা। জাতযোদ্ধার মত এরা যেমন যুদ্ধ করত, তেমনিভাবে দাগী ডাকাতের মত লুটপাটও চালাতে ভালবাসত ওরা। লুটপাট মূলত চালানো হতো প্রজাতন্ত্রের সমর্থক গ্রাম ও শহরগুলোর উপরে। হামলা চালিয়ে পুরো গাঁ উজাড় করে দিত ওরা, আগুন ধরিয়ে মাটিতে মিশিয়ে দিত সব। বন্দিদেরকে কবর খুঁড়তে বাধ্য করা হতো, সেই কবরের পাশে দাঁড় করিয়েই গুলি করা হতো তাদের। অবশ্য প্রজাতন্ত্রীরাও সুযোগ পেলে রাজতন্ত্রী গ্রামগুলোর উপরে হামলা চালাত। একই কায়দায় ধ্বংস করে

দিত সব।

যুদ্ধের সময় খুব হিসেব করে গুলি খরচ করত বিদ্রোহীরা। একেকটা গুলি তাদের কাছে ছিল সোনার চেয়েও দামি। জয়ের আশা না থাকলে অযথা লড়াই চালিয়ে যেত না ওরা। আগেভাগেই কেটে পড়ত। পালানোর সময় তাদের নেতারা চিৎকার করে জানিয়ে দিত, কেউ যেন বন্দুক বা গোলাবারুদ ফেলে না যায়।

বিদ্রোহীরা সাধারণত রাতের বেলায় আক্রমণ চালাত। অতর্কিত হামলা চালিয়ে সবকিছু ধ্বংস করে দিত ওরা, তারপর আবার মিলিয়ে যেত রাতের আঁধারে। কোনও গ্রামে প্রজাতন্ত্রের পতাকা উড়তে দেখলেই তাতে আগুন ধরিয়ে দিত। চলাফেরা করত সংগোপনে, বুনো বেড়ালের মত সন্তর্পণে।

ভঁদির যুদ্ধে কৃষকসেনাদের সংখ্যা ছিল মোট পাঁচ লক্ষ—নারী ও শিশুদের সবাইকে ধরে। এসব সেনাদের আশপাশের আটটা অঞ্চল নানাভাবে সাহায্য করত। ভঁদিই ছিল যুদ্ধের কেন্দ্রস্থল। বিভিন্ন এলাকার লোকেরা বিদ্রোহের জ্বলন্ত চুল্লীটায় নানা দিক থেকে ফুঁ দিত।

সাধারণত ভঁদির প্রধান সেনাদল দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধ চালাত। বড় অংশটা যুদ্ধ করত বনের ভিতরে, আর ছোট অংশটা হামলা চালাত জঙ্গলের পার্শ্ববর্তী গ্রাম আর শহরে। এই দুই দলের নেতা ছিল শ্যাহেত আর জাঁ শুয়াঁ। শ্যাহেতকে মাহ্খি বানানো হয়েছিল, পদোন্নতি দেয়া হয়েছিল রাজার বাহিনীর লেফটেন্যান্ট জেনারেল হিসেবে। কাজের পুরস্কারস্বরূপ তাকে সেইন্ট লুইয়ের ক্রস-ও দেয়া হয়। যুদ্ধের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নেতারা হলো লেসকিউ, বুশাঁ আর দু লাখোজ্ জ্যাকলান।

তবে ভঁদিতে বিদ্রোহীদের সামরিক অভিযান ও বিজয়ের

সীমা ছিল এক এলাকাকেন্দ্রিক। তা কখনো লুয়া নদী অতিক্রম করে ওপারে যেত না। সে-চেষ্টা করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত মারা পড়ে দু লাখোজ্ জ্যাকলান। ভঁদির আসল শক্তি ছিল তার নিজের মাটিতে, সেখানে বিদ্রোহীরা ছিল অজেয়।

বলে রাখা ভাল, ভঁদির বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল। কেন হয়েছিল, সেই প্রশ্ন উঠতে পারে। সমস্যা কোথায় ছিল? শক্তিতে, মনোবলে, নাকি পরিবেশে? আসলে কোনোটাই নয়। ভঁদির বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছিল বিদ্রোহীদের মনোভাবের কারণে। আদর্শের জন্য লড়ছিল না ওরা, লড়ছিল না অধিকার আদায়ের জন্য। বরং এক অন্ধ বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে, প্রতিহিংসার নেশায় লড়াই জুড়েছিল বিদ্রোহীরা। স্বাধীনতা চায়নি ওরা, চেয়েছে বিচ্ছিন্নতা। তাই ওদের আন্দোলন সামনে এগোয়নি, বরং ঘুরপাক খেয়ে মরেছে ভঁদির অরণ্যের মাঝে।

পৃথিবীর ভূমিপ্রকৃতির মাধ্যমে মানুষের কর্ম ও চিন্তা নিয়ন্ত্রিত হয় অনেকখানি। বদ্ধ জলা, অসংখ্য ঝোপঝাড়, আকাশঢাকা গাছগাছালিতে আচ্ছন্ন বিশাল অন্ধকার বনভূমি মানুষের বিবেকবুদ্ধিকে সংকীর্ণ করে তোলে, তাতে যত সব অশুভ শক্তির অনুপ্রবেশ ঘটে অবাধে... নানা রকম কুসংস্কারের বীজ বপন হয়ে যায় মনের গভীরে। প্রকৃতির মাঝে যা কিছু বিরাট, যা কিছু বিশাল... তা শুভ আর অশুভ মনের উপরে ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব বিস্তার করে। উন্নত ও মহান হৃদয়কে প্রকৃতির বিশালত্ব এক নতুন আলোর ঝলকানিতে উদ্দীপ্ত করে তোলে। সংকীর্ণমনারা সে বিশালত্বের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করতে পারে না। যা কিছু দুর্বোধ্য, তাকেই ধ্বংস করবার জন্য উঠেপড়ে লাগে ওরা... বেছে নেয় উন্মত্ত নৃশংসতার পথ।

মুক্ত দিগন্ত এবং অবাধ দিকচক্রবাল মানুষের মনকে

প্রসারিত করে তোলে... তাকে দান করে উদারতা। কিন্তু দিগন্ত যেখানে নানা রকম বাধায় ঢাকা পড়ে গেছে, সেখানে মানুষের মন সংকীর্ণ হতে বাধ্য। আর সংকীর্ণ মন উদার মনকে ঘৃণার চোখে দেখবেই। ভঁদির যুদ্ধের মূলে ছিল সেটাই। ভঁদির যুদ্ধ ছিল সারা দেশের বিরুদ্ধে বিশেষ একটা এলাকার লড়াই... আধুনিক মন-মানসিকতার দেশপ্রেমিকদের বিরুদ্ধে সনাতনী ধ্যানধারণার গোঁড়া কৃষকদের বিদ্রোহ।

ব্রিটানি বরাবরই বিদ্রোহী। দু'হাজার বছরের ইতিহাসে বহুবার বিদ্রোহ করেছে ওরা। তবে সেগুলো ছিল ন্যায় আর সত্যের খাতিরে। কিন্তু ১৭৯৩-এর বিদ্রোহের পিছনে সত্যিকার অর্থে কোনও ন্যায়সঙ্গত কারণ ছিল না। রাজতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র... কোনোটাই আসলে ওরা চাইছিল না, ওদের স্বভাবই ছিল নিজেদের স্বায়ত্ত্বশাসন বজায় রাখার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধিতা করা। দেশের শাসনভার যে-ই তুলে নিয়েছে... হোক তা রাজতন্ত্র বা স্বাধীনতাকামী প্রজাতন্ত্র... তার বিরুদ্ধেই মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে ওরা—অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে। যেন বলতে চেয়েছে, তুমি যে-ই হও না কেন, বাপু, আমাদেরকে ঘাঁটিয়ো না। আমাদেরকে যেমন আছি তেমনই থাকতে দাও।

এভাবে অজ্ঞাত এক কৃত্রিম অন্ধত্বের আবরণে দু'চোখ বেঁধে রাখবার ফলে বার বার বিদ্রোহে ফেটে পড়েছে ব্রিটানি। চলেছে আত্মঘাতী পথে। ভঁদির যুদ্ধের মূলেও ছিল সেটাই। অশিক্ষা আর ধর্মীয় গোঁড়ামি মানুষকে কীভাবে ভুল পথে পরিচালিত করতে পারে, এ যেন ছিল তারই উদাহরণ।

তেরো

আগের বছর গ্রীষ্মকালে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু ১৭৯৩-এর গ্রীষ্মে একেবারেই বৃষ্টি হলো না। অনাবৃষ্টির কারণে রাস্তাঘাট খটখটে শুকনো, গৃহযুদ্ধের কারণে লোক চলাচলও কম, ফলে যাতায়াত বেশ সহজ হয়ে উঠেছে।

জুলাই মাসের এক সুন্দর উজ্জ্বল দিন। সারাদিন বেশ গরম পড়েছিল, কিন্তু বিকেল হতেই বইতে শুরু করেছে মৃদুমন্দ বাতাস। অ্যাভ্রঁশ থেকে পুন্তাখ্‌সুমে যাবার পথে, রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে একটি ঝকঝকে সরাইখানা। নাম *ক্রোয়া ব্রুনশার্দ।* সাইনবোর্ডের তলায় ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে বিজ্ঞাপন—*এখানে ভাল মদ বিক্রি করা হয়।*

সূর্যাস্তের এক ঘণ্টা আগে সেই সরাইখানার সামনে এসে থামল এক অশ্বারোহী। লম্বা একটা আলখাল্লা পরেছে সে, ওটার ঝুল ঢেকে দিয়েছে ঘোড়ার পিঠ। মাথায় চওড়া ব্রিমের হ্যাট, কপাল বরাবর শোভা পাচ্ছে তিন-রঙা একটা ব্যাজ। লোকটাকে সাহসী বলতে হবে, কারণ যে-এলাকা দিয়ে সে এসেছে, সেখানে এমন ব্যাজ পরে ঘোরাফেরা বিপজ্জনক... বিদ্রোহীরা যে-কোনও মুহূর্তে হামলা করতে পারত তার উপরে। হাতে দস্তানা নেই আগন্তুকের, কোমরের দু'পাশে ঝুলছে দুটো পিস্তল। এ ছাড়া

বেল্টের সঙ্গে ঝোলানো আছে একটা তলোয়ার।

আওয়াজ শুনে সরাইখানার মালিক একটা লণ্ঠন হাতে বেরিয়ে এল। গোধূলির আবছা আলোয় ভাল করে দেখল নবাগতকে। মাথার ব্যাজটা লক্ষ করে কপালে ভাঁজ পড়ল তার। নির্বিকার ভঙ্গিতে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল আগন্তুক। হ্যাটের ব্রিম স্পর্শ করে অভিবাদন জানাল, 'শুভ সন্ধ্যা।'

'শুভ সন্ধ্যা,' পাল্টা অভিবাদন জানাল সরাইমালিক। 'মসিয়ো, কামরা চাই? থাকবেন রাতে?'

'না। স্রেফ বিশ্রাম নেবার জন্য থেমেছি।'

'কোথায় যাচ্ছেন?'

'দোউল-এ।'

'সেক্ষেত্রে অ্যাভ্রঁশে ফিরে যাবার পরামর্শ দেব আপনাকে। সামনে যদি এগোতেই হয়, পুন্তাখ্সুমের বেশি যাবেন না।'

'কেন?'

'কারণ দোউলে যুদ্ধ চলছে।'

'তা-ই?' নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল আগন্তুক। নেমে এল ঘোড়ার পিঠ থেকে। 'আমার ঘোড়াটাকে একটু দানাপানি খাওয়াতে পারবে?'

'নিশ্চয়ই,' বলে চলে গেল সরাইমালিক। খানিক পরেই একটা টুকরিতে ঘোড়ার দানা নিয়ে ফিরে এল। সঙ্গে একটা বালতিতে পানি। জানোয়ারটাকে খেতে দিল। আগন্তুক ততক্ষণে ঘোড়ার পিঠ দলাই-মলাই করতে শুরু করেছে।

প্রশংসার দৃষ্টিতে তেজী ঘোড়াটাকে দেখছে সরাইমালিক। জিজ্ঞেস করল, 'মসিয়ো, ঘোড়াটা কি ভাড়া করা?'

'না।'

'আপনিই মালিক?'

'হ্যাঁ।'

'চমৎকার ঘোড়া। কোত্থেকে আসছেন আপনি?'

'প্যারিস থেকে।'

'সরাসরি আসছেন না নিশ্চয়ই?'

'না।'

'জানতাম। রাস্তাঘাট তো সব বন্ধ। তবে ডাক চলাচল করছে।'

'অ্যালোনসোঁ পর্যন্ত। আমি ওখানে একটা চিঠি পোস্ট করেছি।'

'আমার কী মনে হয়, জানেন? খুব শীঘ্রি ডাক চলাচলও বন্ধ হয়ে যাবে। ঘোড়াও পাওয়া যাবে না। যে ঘোড়ার দাম আগে তিনশো ফ্রাঁ ছিল, এখন তা ছয়শো ফ্রাঁ হয়ে গেছে। তা ছাড়া ঘোড়ার খাবারও আজকাল সহজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমি আগে পোস্টমাস্টার ছিলাম, এখন সরাইখানা চালাচ্ছি। আমার মত বহু পোস্টমাস্টারই চাকরি ছেড়ে দিয়েছে—বেতন পাচ্ছিলাম না। যাক গে... চিঠি পোস্ট করেছেন বললেন, ডাকমাশুল কি নতুন নিয়ম অনুসারে দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ। পয়লা মে-র ধারায়।'

'ক্যারিজে পাঠালে কুড়ি স্যু, ক্যাবে পাঠালে বারো, আর ওয়াগনে পাঁচ... তাই না? ঘোড়াটা কোত্থেকে কিনেছেন? অ্যালোনসোঁ থেকেই?'

'হ্যাঁ।'

'দেখে মনে হচ্ছে সারাদিন ঘোড়া চালিয়েছেন।'

'ভোর থেকে।'

'গতকাল?'

'গতকালও।'

‘দেখেই বুঝতে পারছি। দুঁমফো আর মুখ্তাঁ হয়ে আসছেন নিশ্চয়ই?’

‘আর অ্যাভ্রঁশ।’

‘তা-ই? আপনি তো তা হলে খুবই ক্লান্ত, মসিয়ো। আসুন না আমার সরাইখানায়! বিশ্রাম নিন। আপনার ঘোড়াও তো ক্লান্ত।’

‘ঘোড়া ক্লান্ত হতে পারে, কিন্তু মানুষকে ক্লান্ত হলে চলবে না।’

কথাটা বলা হলো শান্ত, অথচ দৃঢ় গলায়। কৌতূহল নিয়ে আগন্তুকের মুখের দিকে স্থির চোখে তাকাল সরাইমালিক। বয়স্ক একজন মানুষ, সৌম্য-কঠোর চেহারা। মাথায় সাদা চুল। আশপাশে নজর বুলিয়ে আর কাউকে দেখা গেল না।

‘আপনি একাকী চলাফেরা করছেন?’ একটু বিস্ময় নিয়ে জিজ্ঞেস করল সরাইমালিক।

‘আমার সঙ্গে প্রহরী আছে,’ বলল আগন্তুক।

‘কোথায় সেই প্রহরী? কাউকে তো দেখছি না।’

আলখাল্লার একটা পাশ উঁচু করে কোমরের পিস্তল আর তলোয়ার দেখাল আগন্তুক। ‘এই যে, এই অস্ত্রগুলোই আমার প্রহরী। বিপদ দেখা দিলে এরাই আমাকে রক্ষা করে।’

কথাটার কোনও জবাব খুঁজে পেল না সরাইমালিক।

আগন্তুক জিজ্ঞেস করল, ‘দোউলে যুদ্ধ চলছে বললে না? কারা যুদ্ধ করছে ওখানে?’

‘এক সিদ্ভঁ-র বিরুদ্ধে আরেক সিদ্ভঁ।’

‘সত্যি?’

‘হ্যাঁ। একজন প্রজাতন্ত্রীদের পক্ষে, অন্যজন রাজার পক্ষে যুদ্ধ করছে।’

‘কিন্তু এখন তো রাজা বেঁচে নেই।’

'তা ঠিক। আরও মজার ব্যাপার কী, জানেন? এই দুই সিদ্ভঁ পরস্পরের আত্মীয়!' হাসল সরাইমালিক। 'দূর সম্পর্কের চাচা-ভাতিজা। চাচা যোগ দিয়েছে সাদা দলে, আর ভাতিজা নীলে। আত্মীয় তো নয়, যেন জন্মের শত্রুতা! জীবনবাজি রেখে লড়ছে দু'জনেই। কেউ একজন খুন না হলে থামবে না এ-লড়াই।'

'খুন?'

'অবশ্যই! একে অপরকে কীভাবে শাসাচ্ছে ওরা, দেখতে চান? প্রকাশ্যে বিজ্ঞপ্তি লিখে টাঙিয়ে দিচ্ছে পথেঘাটে। আমার দরজাতেও লাগিয়েছে। ওই দেখুন।'

সরাইখানার দরজার দিকে এগিয়ে গেল আগন্তুক। দুই পাল্লার দরজা—দুটোতেই একটা করে কাগজ ঝোলানো আছে। প্রথমটা পড়ল সে:

মাহ্‌খি দু লঁতেনাকের পক্ষ থেকে তাঁর ভাইপো ভাইকাউণ্ট গুঁভাকে সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে, এখনও সময় আছে... ক্ষান্ত দাও। নইলে তোমাকে ধরে ফাঁসিতে ঝোলানো হবে।

'জবাবটাও পড়ুন,' বলে উঠল সরাইমালিক।

দরজার দ্বিতীয় পাল্লার উপর এবার নজর বোলাল আগন্তুক। দ্বিতীয় বিজ্ঞপ্তিটা এ-রকম:

মাহ্‌খি দু লঁতেনাককে তাঁর প্রস্তাবের জবাবে ক্যাপ্টেন গুভাঁর পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, অকারণ হুমকি না দিয়ে ভালয় ভালয় আত্মসমর্পণ করুন... দয়া দেখানো হবে আপনার প্রতি। অন্যথায় দেখামাত্র গুলি করা হবে আপনাকে।

'কখন টাঙানো হয়েছে এগুলো?' জিজ্ঞেস করল আগন্তুক।

'প্রথমটা গতকাল বিকেলে,' বলল সরাইমালিক। 'আজ সকালে টাঙানো হয়েছে দ্বিতীয়টা। দেখতেই পাচ্ছেন, জবাব দিতে দেরি করেনি ওরা।'

'এ তো গৃহযুদ্ধ নয়... পারিবারিক যুদ্ধ!' অস্ফুট গলায় বলল আগন্তুক। 'অবশ্য তাতেও কোনও ক্ষতি নেই। এ-লড়াই থেকেই শেষ পর্যন্ত নিজের অধিকার ফিরে পাবে জনগণ।' মাথা একটু নুইয়ে দ্বিতীয় বিজ্ঞপ্তিটাকে সম্মান দেখাল সে।

সরাইমালিক বলল, 'অবস্থা বুঝতে পারছেন তো? নগরবাসীরা বিপ্লব করে বেড়াচ্ছে আর গ্রামাঞ্চলের লোক তার বিরোধিতা করছে। তারমানে নগরের লোকেরা খাঁটি ফরাসি আর গ্রামের কৃষকেরা ব্রিটন হয়ে গেছে মনে-প্রাণে। ওরা আমাদেরকে বোকা বলে, আর আমরা ওদেরকে বলি অসভ্য-বর্বর। অভিজাত সম্প্রদায় আর যাজকরা যোগ দিয়েছে ওদের সঙ্গে।'

'সবাই নয়,' প্রতিবাদ করল আগন্তুক।

'তা কী করে বলি? এখানে কী ঘটছে, দেখছেন না? একজন মাহ্খির বিরুদ্ধে একজন ভাইকাউন্ট লড়াই করছে।' ভুরু কোঁচকাল সরাইমালিক। '...আর আমি যদি ভুল করে না থাকি, আপনি একজন যাজক।'

হ্যাঁ-না কিছুই বলল না আগন্তুক। জিজ্ঞেস করল, 'কে জিতছে লড়াইয়ে?'

'শুরুতে ভাইকাউন্ট গুভাঁই জিতছিল, কিন্তু ইদানীং সুবিধে করতে পারছে না। আমাদের মাহ্খি বড়ই শক্ত লোক। এঁরা দু'জনেই গুভাঁর পরিবারের লোক—এই এলাকার সামন্ত। বংশটার দুটো শাখা আছে। বড় শাখাটার প্রধান হলেন মাহ্খি দু

লঁতেনাক, আর ছোট শাখাটার প্রধান ভাইকাউন্ট গুভাঁ। আজ এই দুই শাখার মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেছে। একজন যুদ্ধ করে বনে থেকে, আরেকজন যুদ্ধ করে শহরে থেকে। মাহ্খি দু লঁতেনাক ব্রিটানিতে সর্বশক্তিমান। চাষীরা তাঁকে রাজার মত দেখে। যে-দিন তিনি উপকূলে নামেন, সেদিনই আট হাজার গ্রামবাসী তাঁর দলে যোগ দেয়। এক সপ্তাহের মধ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তিনশো গ্রাম! লঁতেনাক যদি উপকূলে দাঁড়াতে পারতেন, ইংরেজরা সেখানে নামতে পারত। কিন্তু গুভাঁ আগে থেকে উপকূল দখল করে রাখায় সেটা সম্ভব হয়নি। লঁতেনাককে সেখানে টিকতে দেয়নি সে। খেপে গিয়ে উপকূল এলাকায় নরহত্যা চালিয়েছেন মাহ্খি। দু'জন মহিলাকেও খুন করেছেন তিনি, তাদের একজনের তিনটা বাচ্চা ছিল—তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিল বুলে হুজ বাহিনীর সদস্যরা। বাচ্চা তিনটা এখন কোথায়, মাহ্খি ওদেরকে নিয়ে কী করেছেন, তা কেউ জানে না। প্রজাতন্ত্রী সৈন্যরা এ নিয়ে বড়ই খ্যাপা। দুই মহিলার হত্যার প্রতিশোধ নিতে চায় ওরা, উদ্ধার করতে চায় বাচ্চাদের। এই ব্যাপারটাই যুদ্ধটাকে আরও তীব্র করে তুলেছে। এমনিতে ভাইকাউন্ট গুভাঁ বয়সে তরুণ, মনটাও উদার। কিন্তু লঁতেনাক ভয়ঙ্কর লোক, দয়ামায়া নেই তার হৃদয়ে। বিদ্রোহী কৃষকরা বলে, এ-যুদ্ধ শয়তান বিলযিবাবের বিরুদ্ধে সেইন্ট মাইকেলের যুদ্ধ। আপনি হয়তো জানেন, সেইন্ট মাইকেল এই এলাকার দেবদূত। তাঁর নামে এখানকার একটা পর্বতেরও নামকরণ করা হয়েছে। লোকের বিশ্বাস, সেইন্ট মাইকেল এক দানবকে পরাজিত ও নিহত করে এখানকার আরেকটা পাহাড়ের নীচে কবর দিয়েছেন—পাহাড়টার নাম টুম্বিলেন।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল আগন্তুক। 'টুম্বিলেন... মানে টুম্ব অভ

বিলেনি, বা বিলেনির সমাধি। বিলেনি কথাটা এসেছে বিলযিবাব থেকে।'

'বাহ্,' প্রশংসা করল সরাইমালিক। 'আপনি তো দেখছি এ-সব ব্যাপারে ভাল জানেন!' মনে মনে নিশ্চিত হয়ে গেল, লোকটা যাজক না হয়েই যায় না।

ওর কথার উত্তরে কিছু বলল না আগন্তুক।

সরাইমালিক এবার বলল, 'বিদ্রোহী কৃষকরা মনে করে, মাহ্খি লঁতেনাক তাদের দেবদূত, আর ভাইকাউণ্ট গুভাঁ হলো শয়তান বিলযিবাব। তবে আমি ঠিক উল্টো ধারণা পোষণ করি। যা ঘটিয়ে বেড়াচ্ছেন লঁতেনাক, তাতে তাঁকেই শয়তান বলতে হয়। গুভাঁ অনেক ভাল। যাক গে... আপনার নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে? কিছু খেতে দেব?'

'ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই, আমার সঙ্গে রুটি আর মদ আছে,' বলল আগন্তুক। 'বরং এদিককার যুদ্ধের খুঁটিনাটি খুলে বলো আমাকে।'

'উপকূলে মোতায়েন করা বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছে গুভাঁ। লঁতেনাক চেয়েছিলেন ওই অঞ্চলের সমস্ত লোককে বিদ্রোহী করে তুলতে, তা হলে ব্রিটানির পুরো নিম্নাঞ্চল তাঁর হাতের মুঠোয় চলে আসত, ইংরেজ ফৌজকে সহজেই নামাতে পারতেন ফ্রান্সের মাটিতে। বিশ হাজার ইংরেজ সৈন্য আর ব্রিটানির দু'লাখ কৃষক মিলে অপরাজেয় একটা বাহিনী তৈরি হতো তাঁর। কিন্তু উপকূলের দখল ধরে রেখে তাঁর সে-পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিয়েছে গুভাঁ। ইংরেজদের অবতরণ করতে দিচ্ছে না। লঁতেনাকের কাছ থেকে প্লুয়োবুঁ শহর উদ্ধার করেছে সে, তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছে অ্যাভ্রঁশ থেকে, গ্র্যানভিলেও পৌঁছুতে দেয়নি। লঁতেনাককে এখন ফুজের অরণ্যে কোণঠাসা করতে চাইছে গুভাঁ,

গতকাল পর্যন্ত সেই মোতাবেক কাজও করছিল। হঠাৎ খবর এল মাহ্‌খি দোউল আক্রমণ করেছেন। ওই জায়গা দখল করতে পারলে পাহাড়ের উপর কামান বসাতে পারবেন তিনি। ইংরেজদের নামার মত জায়গারও দখল নিয়ে নিতে পারবেন। সেটা ঠেকানোর জন্য তড়িঘড়ি করে ছুটে গেছে গুভাঁ, উপর থেকে আদেশ-নির্দেশ পাবার অপেক্ষা করেনি। সন্দেহ নেই, দোউলেই মুখোমুখি হবে এই দুই নেতা... হেস্তনেস্ত করে ছাড়বে লড়াইটার।'

'দোউলে যেতে কত সময় লাগে?'

'সৈন্য আর কামান নিয়ে তিন ঘণ্টার মত। এতক্ষণে পৌঁছে গেছে ওরা।'

বাতাসে কান পাতল আগন্তুক। 'হ্যাঁ, কামান দাগার আবছা আওয়াজ যেন শুনতে পাচ্ছি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওখানে যাওয়া দরকার আমার।'

'মসিয়ো, রাতটা এখানে কাটিয়ে গেলে ভাল করতেন,' বলল সরাইমালিক। 'অন্ধকারে পথ চলা বিপজ্জনক।'

'কিন্তু আমার যে দেরি করা চলবে না।'

'খুব তাড়া দেখছি! এত অস্থির হচ্ছেন কেন? কী আছে ওখানে? বিশেষ কোনও কাজ, নাকি বিশেষ কোনও প্রিয়জন...'

'প্রিয়জনই বলতে পারো।'

'আপনার ছেলে বা ওই ধরনের কেউ?'

'অনেকটা সে-রকমই।'

অবাক হতে গিয়েও হলো না সরাইমালিক। যাজকদেরও স্ত্রী-সন্তান থাকে।

'টুকরি আর বালতি সরাও,' তাকে বলল আগন্তুক। 'ঘোড়ার খাবারের জন্য কত দিতে হবে?'

'বেশি না, দুই ফ্রাঁ দিলেই চলবে।'

দাম মিটিয়ে দিল আগন্তুক। তারপর চড়ে বসল ঘোড়ার পিঠে।

সরাইমালিক বলল, 'যাবেনই যখন, আমার কথা শুনুন। পরিষ্কার বুঝতে পারছি, আপনি সাঁমালুতে যেতে চাইছেন। দুটো রাস্তা আছে ওখানে পৌঁছুবার। একটা দোউলের ভিতর দিয়ে গেছে, অন্যটা গেছে সাগরের পার ঘেঁষে। সামনে যেখানে রাস্তা দু'ভাগ হয়েছে, সেখানে ডানের রাস্তা ধরবেন। ঠিক আছে? বাঁয়ের রাস্তা ধরলে আপনি একেবারে যুদ্ধের ময়দানের মাঝখানে গিয়ে পড়বেন।'

'ধন্যবাদ।' বলে ঘোড়া ছোটাল আগন্তুক।

যতক্ষণ তাকে দেখা গেল, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সরাইমালিক। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে সরাইখানায় ঢুকে গেল।

ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে খুব শীঘ্রি দুই রাস্তার সংযোগস্থলে পৌঁছুল আগন্তুক। সরাইমালিকের সতর্কবাণী ভোলেনি—ডানের রাস্তায় যেতে হবে বিপদ এড়াতে চাইলে। কথাটা গ্রাহ্য করল না, ঘোড়াকে নিয়ে গেল সে বাঁয়ের রাস্তায়।

চোদ্দ

দোউল হচ্ছে ব্রিটানির অন্তর্গত এক স্প্যানিশ জনপদ। শহর

বলতে বড় একটা রাস্তার দু'ধারে সারবন্দি কিছু বাড়ি। রাস্তাটা চওড়া। মাঝে মাঝে তার থেকে কিছু গলি বেরিয়ে গেছে। রাস্তার ধারের বাড়িগুলো যেন এক একটা দুর্গ।

ক্রোয়া ব্রুনশার্দ সরাইখানার মালিক ভুল বলেনি, সত্যিই ভয়ানক যুদ্ধ চলছে ওখানে। রাতভর গুলি বিনিময় করেছে দুই পক্ষ, ছুঁড়েছে কামানের গোলা। সকালে সাদা দলের লোকেরা হামলা করেছিল, বিকালে হামলা করেছে নীল দলের লোকেরা। সৈন্যসংখ্যার দিক থেকে সমতা নেই দুই পক্ষের। সাদা বাহিনীতে রয়েছে ছ'হাজার লোক, নীল বাহিনীতে মাত্র পনেরো শ'। কিন্তু ক্রোধ আর প্রতিহিংসার দিক থেকে দু'দলই সমানে সমান। ক্রোধ আর প্রতিহিংসাই নীল দলকে উদ্বুদ্ধ করেছে সাদা দলের বিশাল বাহিনীকে আক্রমণ করতে।

একদিকে উন্মত্ত কৃষকদল, অন্যদিকে সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী। কৃষকদের গায়ে জরাজীর্ণ পোশাক, বাহন বলতে স্রেফ নিজের দু'পা, এমনকী কামানও টানে তারা দড়ি বেঁধে। সুসংগঠিত বলা যাবে না তাদের, রয়েছে অস্ত্রশস্ত্রের স্বল্পতা। কিন্তু প্রজাতন্ত্রী সৈন্যদের গায়ে ঝকঝকে ইউনিফর্ম, প্রত্যেকের হাতে সঙ্গীন-অলা বন্দুক। তারা সুশিক্ষিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ। এরা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ স্বেচ্ছাসেবীর দল।

বিপ্লবীদের আর সব নেতার মত গুভাঁও যুবক। মাত্র ত্রিশ বছর বয়স তার। লম্বা-চওড়া সুগঠিত দেহ, চোখে দূরদৃষ্টি আর মুখে শিশুসুলভ হাসি। ধূমপান করে না, মদও খায় না। কখনও গালিগালাজ করে না কাউকে, মিষ্টি কথায় মন ভোলাতে পারে মানুষের। সঙ্গে সাজ-পোশাকের একটা বাক্স রাখে সবসময়। যত্ন নেয় নখ, দাঁত, চুল... সবকিছুর। মাথাভর্তি ঝাঁকড়া কালো চুল। সুযোগ পেলেই গায়ের কোট থেকে ধুলো ঝাড়ে, নোংরা

থাকে না কখনও। লড়াইয়ের সময় সবার আগে ছুটে যাওয়া তার স্বভাব, কিন্তু আজ পর্যন্ত আহত হয়নি। সত্যিকার বীর নেতা। এমনিতে নম্র স্বভাবের হলেও যুদ্ধের সময় ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে জানে। তবে শুধু যোদ্ধা নয় সে, একই সঙ্গে চিন্তাশীল ও দার্শনিক। অন্ধবিশ্বাসে কাজ করে না, যে-কোনও সিদ্ধান্ত নেয় ভেবেচিন্তে... মাথা খাটিয়ে।

লঁতেনাকও যোদ্ধা... আরও কুশলী যোদ্ধা। আরও বিচক্ষণ ও শক্ত। বয়স্ক বীরদের সংকল্প যুবক বীরদের চেয়ে দৃঢ় হয়ে থাকে। মৃত্যুর কাছাকাছি থাকে বলে তারা আরও উদ্ধত ও বেপরোয়া। অভিজ্ঞতার কারণে সমরকৌশলের দিক থেকেও যথেষ্ট এগিয়ে রয়েছেন তিনি। তবে একটা দুর্বলতা রয়েছে তাঁর—আবেগের বশে কিছুটা পরিচালিত হচ্ছেন মাহ্খি। যুক্তির পথে যেভাবে কাজ করা উচিত, তা পুরোপুরি করতে পারছেন না। অবশ্য এ-কারণে তাঁকে দোষারোপও করা যায় না। আত্মীয় হয়ে গুভাঁ তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। চাচা-ভাইপোর সম্পর্কের মর্যাদা রাখছে না, যোগ দিয়েছে প্রজাতন্ত্রীদের দলে। একে বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া কী বলা যায়? লঁতেনাকের কপালে কলঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে এই যুবক, তাকে যে-করে হোক, শাস্তি দেবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছেন তিনি। নইলে যে মান থাকে না! লড়াইটাকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিয়ে গেছেন মাহ্খি।

লঁতেনাক উপকূলে অবতরণ করবার সঙ্গে সঙ্গে আগুনের মত এক জ্বলন্ত প্রেরণা ছড়িয়ে পড়েছে বিদ্রোহীদের মাঝে। বনে-জঙ্গলে ছন্নছাড়ার মত যারা যুদ্ধ করছিল, তারা সবাই তাঁর ডাকে একজোট হয়েছে। দলত্যাগী মাত্র একজন—গ্যাভা। শুরুতে লঁতেনাকের সঙ্গে থাকলেও পরে মত পাল্টেছে সে। বৃদ্ধ জেনারেলের যুদ্ধকৌশলের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেনি,

পালিয়ে গিয়ে যোগ দিয়েছে বুশাঁ-র দলে।

যোদ্ধা হিসেবে লঁতেনাক রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডারিখের শিষ্য। দু'জন ডেপুটি রয়েছে তাঁর—দু লাখোজ্ জ্যাকলান আর জাঁ শুয়াঁ। লাখোজ্ জ্যাকলান উন্মুক্ত প্রান্তরে যুদ্ধ করতে পছন্দ করে, আর জাঁ শুয়াঁ পছন্দ করে বন-বাদাড়। যথেষ্ট লোক জোগাড় করেছে ওরা, কিন্তু তাদের নিয়ে নির্ভরযোগ্য সেনাদল তৈরি করা সম্ভব নয়। একেবারে গেঁয়ো-অশিক্ষিত লোক সবাই, সৈনিকদের শৃঙ্খলা নেই ওদের মাঝে। ইংল্যাণ্ড থেকে সৈন্য পাবার আশা করেছিলেন লঁতেনাক, কিন্তু সে-আশায় পানি ঢেলে দিয়েছে গুভাঁ। উপকূলের মাটি কামড়ে পড়ে আছে তার বাহিনী, কিছুতেই পিছু হটছে না। শেষ ভরসা হিসেবে দোউলে এসেছেন মাহ্‌খি। শহরের দখল নিতে পারলে পিছনের পাহাড়ে কামান বসাতে পারবেন, সেগুলোর সাহায্যে উপকূলের বড় একটা অংশ থেকে হটাতে পারবেন রাজতন্ত্রীদের, যাতে অবতরণ করবার মত একটা জায়গা পায় তাঁর ইংরেজ বন্ধুরা।

পরিকল্পনা মোতাবেক ছয় হাজার লোক, দশটা বড় কামান আর অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দোউল আক্রমণ করেছেন লঁতেনাক। কোনও বাধাই পেতে হয়নি। সাদা দলের নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে জানে শহরের লোকেরা, প্রতিরোধ গড়তে গিয়ে মরতে চায়নি। আত্মসমর্পণ করেছে দেরি না করে। খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠেছিলেন লঁতেনাক। গুঁজ লু ব্রুঁয়ো নামে এক সহকারীর হাতে শহরের দায়িত্ব দিয়ে পাহাড়ের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন কামান বসানোর জায়গা খুঁজতে। কত বড় ভুল যে আসলে করে বসেছেন, সেটা বুঝতে পারেননি তখন।

গুঁজ লু ব্রুয়োঁ সাদা দলের ফিল্ড সার্জেন্ট, কিন্তু সত্যিকার অর্থে নেতৃত্বের যোগ্যতা নেই তার। সমরকৌশলের ব্যাপারেও

একেবারেই অজ্ঞ। তার মাশুলও দিতে হলো তাকে।

লঁতেনাক চলে যাবার পর কৃষকসেনারা এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়াতে শুরু করল শহরে। তাদের ভিতরে কোনও শৃঙ্খলা ছিল না, ছিল না অধিকৃত শহরটাকে রক্ষা করবার কোনও তাগিদ। বরং আনন্দ-উল্লাসে মত্ত হয়ে পড়ল তারা। ক্লান্ত হয়ে গেল খুব শীঘ্রি। সন্ধ্যা হতে না হতে ঘুমিয়ে পড়ল যে-যেখানে পারে। রাস্তার উপরেও শুয়ে পড়ল অনেকে। চরম বিশৃঙ্খলা আর কাকে বলে! ওদের দেখে মোটেই যোদ্ধাদল মনে হচ্ছিল না, বরং মনে হচ্ছিল একদল ক্লান্ত তীর্থযাত্রী। সেটাই হলো কাল।

রাত একটু বাড়তেই শোরগোল শুনে জেগে উঠল কিছু কৃষক। বিস্মিত হয়ে লক্ষ করল, শহরের প্রবেশপথে কামান বসাচ্ছে কারা যেন। খানিক পরেই টের পেল, ওগুলো নীল দলের কামান। ওদের অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে শহরে পৌঁছে গেছে গুভাঁ ও তার বাহিনী।

এ-পরিস্থিতিতে রক্ষণাত্মক কৌশল অবলম্বন করতে হয়। তা না করে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল কৃষকরা। জবাবে কামান দাগল নীল দল। ব্যস, শুরু হয়ে গেল তাণ্ডব। রাতের শান্ত পরিবেশ বিদীর্ণ হলো গোলাগুলির আওয়াজে। পুরো শহর ঢাকা পড়ে গেল কামানের ধোঁয়ায়। আতঙ্কে ছোটাছুটি করতে লাগল কৃষকসেনারা। গুলির আঘাতে লুটিয়ে পড়ল অনেকে। নারী ও শিশুরা ভয়ে চিৎকার করতে শুরু করল। ধাবমান জনতার পায়ের তলায় পড়ে অক্কাও পেল অনেকে। ধোঁয়ার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল বিভ্রান্তি, কৃষকসেনারা চিনতে না পেরে নিজের দলের লোককেই আক্রমণ করে বসল।

তবে একসময় প্রাথমিক বিশৃঙ্খলা কাটিয়ে উঠল সাদারা। অস্ত্র আর গোলাবারুদ নিয়ে শহরের প্রধান চত্বরে একত্র হলো

ওরা। ব্যারিকেড দিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলল। ওরা কামান দাগছে না দেখে অবাক হলো গুভাঁ। আসলে কামান দাগার মত কোনও লোক ছিল না ওখানে—হয় তারা মারা পড়েছে, নয়তো লঁতেনাকের সঙ্গে চলে গেছে পাহাড়ে। ঝটিতি আক্রমণে প্রতিরোধ গুঁড়িয়ে দিতে চাইল গুভাঁ, তবে সেটা সম্ভব হলো না। গোলাগুলির তোড়ে বার বার পিছু হটতে হলো ওকে। এরই মধ্যে লঁতেনাক ফিরে এলেন পাহাড় থেকে। শহরের পিছন দিক থেকে চত্বরে প্রবেশ করলেন তিনি, ব্যারিকেডের পিছনে এসে ঘোড়া থেকে নামলেন।

'হচ্ছেটা কী এখানে?' বজ্রকণ্ঠে গর্জে উঠলেন মাহ্খি।

'আমরা আক্রান্ত হয়েছি, জেনারেল,' কাঁপতে কাঁপতে জবাব দিল গুঁজ লু ব্রুয়োঁ।

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি! কিন্তু কে আক্রমণ করল? কীভাবেই বা করল? ওরা শহরে ঢোকার আগেই তোমরা বাধা দাওনি কেন?'

'ইয়ে... আমরা একটু অসতর্ক হয়ে পড়েছিলাম।'

'অসতর্ক মানে?'

'পাহারাদারেরা ঘুমিয়ে পড়েছিল, জেনারেল।'

'কী! ঝামেলাটা শেষ হতে দাও। তারপর ওদের নাম-ধাম চাই আমি। সবাইকে কঠিন শাস্তি পেতে হবে।'

'জী, জেনারেল।'

'এখন বলো, কারা আক্রমণ করেছে আমাদের? লিশেলের বাহিনী?'

'আ... আমি জানি না, জেনারেল।'

'তা হলে জানোটা কী?' আড়াল থেকে মুখ বের করে চত্বরের উল্টোদিকে জড়ো হওয়া শত্রুদের দিকে নজর দিলেন লঁতেনাক।

ঘোড়ার পিঠে বসা এক দীর্ঘদেহী যুবক নেতৃত্ব দিচ্ছে তাদের।

'গুভাঁ!' দাঁতে দাঁত পিষে বললেন তিনি।

'ওরা আমাদেরকে কোণঠাসা করে ফেলেছে, সার,' বলল গুঁজ লু ব্রুয়োঁ। 'এখানে বসে থাকলে ফাঁদে পড়ে যাব। আমি ইতিমধ্যে পিছু হটতে বলে দিয়েছি সবাইকে।'

'দিনানের রাস্তাটা খোলা আছে?' জিজ্ঞেস করলেন লঁতেনাক।

'আছে, সার।'

'বেশ, তা হলে ধীরেসুস্থে ওই পথে যেতে বলো সবাইকে। তাড়াহুড়োর প্রয়োজন নেই। আমরা এদিক থেকে ব্যস্ত রাখব শত্রুকে। কামান আছে না তোমার সঙ্গে?'

'জী, আছে।'

'ওগুলো আগেই ব্যবহার করোনি কেন?'

'চালাবার মত লোক ছিল না, সার।'

'এখন তো আছে! চালাও কামান। ওই যে, ওই যুবককে লক্ষ্য করে গোলা ছুঁড়বে। ও-ই গুভাঁ। আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু।'

গর্জে উঠল সাদা দলের কামান। পর পর তিনটা গোলা ছুটে গেল গুভাঁর উদ্দেশে। সৌভাগ্যক্রমে আহত হলো না সে, তাড়াতাড়ি সরে গেল আড়ালে। হতাশায় ঠোঁট কামড়ালেন লঁতেনাক। একটুর জন্য ঘায়েল হলো না বেঈমানটা।

পিছন থেকে এগিয়ে এল গুঁজ লু ব্রুয়োঁ। বলল, 'জেনারেল, আমি ফুজেরের দিকে আমাদের মালপত্র আর মহিলাদের রওনা করিয়ে দিয়েছি। যে-তিনটা বাচ্চাকে আটক করা হয়েছিল, তাদের নিয়ে কী করব?'

'লিখ্-বন-পাই থেকে যাদেরকে এনেছিলাম?'

'জী।'

'ওরা আমাদের জিম্মি। ওদেরকে লা তুয়োগ দুর্গে পাঠিয়ে দাও।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল গুঁজ লু ব্রুয়োঁ। লঁতেনাক ব্যস্ত হয়ে পড়লেন যুদ্ধ পরিচালনায়।

মুশকিলে পড়ে গেছে গুভাঁ। কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। সামনের চত্বরে সত্যিই শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে সাদারা। ওখানে আহত, নিহতদের বাদ দিয়ে অন্তত পাঁচ হাজার কৃষকসেনা অবস্থান নিয়েছে। অথচ ওর দলে টিকে আছে মাত্র বারো শ' সৈন্য। শত্রুরা ব্যাপারটা টের পেলেই সর্বনাশ। হামলা করলে স্রেফ সংখ্যার জোরে পরাস্ত করতে পারবে ওদেরকে। তার উপর এখন কামান ব্যবহার করছে ওরা। এ-পরিস্থিতিতে হামলা চালানো বোকামি, আবার অপেক্ষা করলেও বিপদে পড়বার সম্ভাবনা রয়েছে।

ভাল করে পরিস্থিতি বিচার করল গুভাঁ। একটা সুবিধে রয়েছে তার। দোউলে এর আগে বেশ কয়েকবার এসেছে ও, শহরের সমস্ত অলি-গলি চেনে। সেই জ্ঞানই কাজে লাগাবে বলে ঠিক করল। গলিপথে চত্বরের পিছনে চলে যাবে, ওখান থেকে চালাবে আক্রমণ।

সহকারী গিশঁমকে ডাকল গুভাঁ। নিজের পরিকল্পনা খুলে বলল। শেষে যোগ করল, 'এখানকার সৈন্য-পরিচালনার ভার তোমার উপরে রইল, গিশঁম। কামানের গোলা ছুঁড়ে ওদেরকে ব্যতিব্যস্ত করে রেখো।'

'ঠিক আছে, ক্যাপ্টেন।'

'আমাদের সঙ্গে ক'জন ভেরিবাদক আছে?'

'ন'জন, ক্যাপ্টেন।'

'সাতজনকে আমি চাই।'

'আর সৈন্য?'

দলের দিকে ফিরে চড়া গলায় ডাকল গুভাঁ, 'বুলে হুজ ব্যাটালিয়নের কারা আছ এখানে? বেরিয়ে এসো।'

সব মিলিয়ে বারোজন এগিয়ে এল। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে সার্জেন্ট রাদু—লা সুদ্রের অরণ্যে সে-ই উদ্ধার করেছিল মিশেল ফ্লেশা ও তার তিন সন্তানকে।

'এত কম লোক কেন তোমাদের?' জিজ্ঞেস করল গুভাঁ।

'বাকিরা লিখ্-বন-প্লাই খামারে মারা গেছে, সার,' বলল রাদু। 'আমরা এ-ক'জনই শুধু প্রাণ নিয়ে পালাতে পেরেছিলাম।'

কাঁধ ঝাঁকাল গুভাঁ। 'বেশ, তা হলে তোমাদেরকে দিয়েই কাজ চালাতে হবে আমার।' কাছেই দাঁড়িয়ে আছে একটা অস্ত্রবাহী ওয়াগন, ওটার দিকে ইশারা করল। 'অস্ত্র নাও ওখান থেকে। বন্দুকগুলো দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ো, যাতে হাঁটার সময় বাড়ি খেয়ে খটমট আওয়াজ না করে।'

দ্রুত অস্ত্র সংগ্রহ করল সৈন্যরা।

গুভাঁ নির্দেশ দিল, 'কারও পায়ে জুতো থাকলে খুলে ফেলো।'

'জুতো নেই, সার,' জানাল রাদু।

'খুব ভাল।'

বারো সৈনিক আর সাত ভেরিবাদককে একত্র করল গুভাঁ। বলল, 'আমার পিছু পিছু এসো তোমরা।'

বিশজনের ছোট্ট দলটা চত্বরের পাশের একটা গলিতে ঢুকে পড়ল। হাঁটতে শুরু করল নিঃশব্দে। ইতস্তত গোলাগুলি ছাড়া সারা শহর তখন মৃত্যুপুরীর মত নিস্তব্ধ। শহরবাসীরা যার যার

বাড়িতে দরজা-জানালা আটকে বসে আছে। ভয়ে কোনও শব্দ করছে না কেউ। আলোও নেই কোথাও। চাঁদের আভায় পথ চলতে থাকল ওরা।

আঁকাবাঁকা গলিপথে বিশ মিনিট এগোবার পর দাঁড়িয়ে গেল দলটা। চত্বরের পিছনদিকে পৌঁছে গেছে। আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে পরিস্থিতি যাচাই করে নিল গুভাঁ। যা ভেবেছে তা-ই, চত্বরের সামনের দিকে ব্যারিকেড থাকলেও পিছনটা একেবারে ফাঁকা। এদিকে কোনও পাহারাদারও বসায়নি বিদ্রোহীরা। সার্জেন্ট রাদু ও তার সঙ্গীদের এক সারিতে পজিশন নেয়াল ক্যাপ্টেন। ভেরিবাদকরা রইল তাদের পিছনে—ঢোলের উপরে লাঠি তুলে অপেক্ষা করছে।

'ফায়ার!' চেঁচিয়ে উঠল গুভাঁ।

একযোগে গর্জে উঠল বন্দুক আর ঢোলগুলো। বিকট আওয়াজে প্রকম্পিত হলো চারদিক। চমকে উঠে উল্টো ঘুরল বিদ্রোহীরা। চত্বরের পিছন দিক থেকে এভাবে আক্রমণ আসতে পারে, তা ওরা কল্পনাই করতে পারেনি। কিন্তু কিছু বুঝে ওঠার আগেই গুভাঁর দলের গুলিতে খতম হয়ে গেল অনেকে।

ছড়িয়ে পড়ল বিভ্রান্তি আর বিশৃঙ্খলা। বিপদের মুখে হতবুদ্ধি হয়ে গেল কৃষকরা। পিছনের দলটা কত বড়, তা বোঝার চেষ্টা করল না। ভয় পেয়ে পড়িমরি করে ছুটে পালাতে শুরু করল, অপেক্ষা করল না কারও নির্দেশের।

'থামো!' চেঁচিয়ে ওদেরকে নিরস্ত করবার ব্যর্থ চেষ্টা চালাল গুঁজ লু ক্রুয়োঁ। কিন্তু কে শোনে কার কথা। কৃষকরা তখন পিঠটান দেয়ায় ব্যস্ত।

রাগের মাথায় গুলি করে কয়েকজনকে খুন করল গুঁজ লু ক্রুয়োঁ। তাতে যেন আগুনে আরও ঘি ঢালা হলো। ছোটাছুটি

বেড়ে গেল কৃষকদের। চোখের পলকে খালি হয়ে গেল পুরো চত্বর।

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন লঁতেনাক। তাঁর দিকে ছুটে গেল গুঁজ লু ব্রুয়োঁ। বলল, 'সার, এখানে বসে থাকলে মরতে হবে!'

দাঁতে দাঁত পিষলেন লঁতেনাক। 'চাষাভুষোদের নিয়ে যুদ্ধ চলবে না। এজন্যেই ইংরেজ সৈন্য দরকার আমার।'

'সার! কী করব এখন?'

'পালাও। আর তো কিছু করার নেই।'

এক লাফে ঘোড়ায় চড়ে বসলেন মাহ্খি। নির্মম ভঙ্গিতে চাবুক মারলেন ওটার পাছায়। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট লাগাল ঘোড়া। তাঁকে লক্ষ্য করে কয়েকটা গুলি ছুঁড়ল গুভাঁ। কিন্তু আলোকস্বল্পতার কারণে লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ হলো। চোখের পলকে হারিয়ে গেলেন লঁতেনাক।

হতাশ হতে গিয়েও হলো না গুভাঁ। নাটের গুরু পালিয়ে গেলেও জয় ওদেরই হয়েছে। সঙ্গীদের দিকে ফিরল ও। প্রশংসার সুরে বলল, 'দারুণ দেখিয়েছ, তোমাদের নিয়ে আমি গর্বিত। তোমরা মাত্র বারোজনই এক হাজার সৈনিকের সমান।'

'প্রজাতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক!' স্লোগান দিল বুলে হুজের সৈন্যরা।

গলা চড়িয়ে ব্যারিকেডের ওপাশে থাকা সঙ্গীদের ডাকল গুভাঁ। কয়েক মিনিটের ভিতরে ওরা ঢুকে পড়ল চত্বরে। কিছু লোকসহ গিশঁমকে পাহাড়ের দিকে পাঠিয়ে দিল ও, পলাতক বিদ্রোহীদের ধরে আনবে। বাকিদের লাগিয়ে দিল চত্বরের ভিতরে। কয়েকজন বিদ্রোহী পালাতে পারেনি। চত্বরের এক কোণে আশ্রয় নিয়ে এলোমেলো গুলি ছুঁড়ছে তারা, তাদেরকে

ঘায়েল করবার জন্য একযোগে এগিয়ে গেল সবাই।

খুব শীঘ্রি আহত বা নিহত হলো লোকগুলো। চত্বরের কিনারের একটা থামের পিছনে রয়ে গেল শুধু একজন। সে-ই এতক্ষণ বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল। গুলিতে আহত হয়ে ক্ষান্ত দিয়েছে লড়াইয়ে। তার দিকে এগিয়ে গেল গুভাঁ।

মানুষটা তরুণ, পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশি হবে না বয়স। সারা শরীর রক্তে মাখামাখি। বাম হাতে পিস্তল, আর ডান হাতে একটা ছোরা নিয়ে বসে আছে। হাঁপাচ্ছে ভীষণভাবে। তার বুকের দিকে তলোয়ার তাক করল গুভাঁ।

'আত্মসমর্পণ করো।'

কিছু বলল না যুবক। যেমন ছিল, তেমনই বসে রইল। রাগী চোখে শুধু তাকাল ক্যাপ্টেনের দিকে।

'কী নাম তোমার?' জিজ্ঞেস করল গুভাঁ।

'দস্সেলুম,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল যুবক।

'তুমি খুব সাহসী, দস্সেলুম,' বলল গুভাঁ। 'একাকী লড়াই করে যাচ্ছ, অন্যদের মত পালাওনি। এমন সাহসের কদর করি আমি। আত্মসমর্পণ করো, তোমাকে দয়া প্রদর্শন করা হবে।'

এক তাল থুতু ফেলল দস্সেলুম। 'নিকুচি করি তোর দয়ার!' খেঁকিয়ে উঠল সে। 'রাজা দীর্ঘজীবী হোন!'

চিৎকারটা দিয়েই গুভাঁকে লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল সে। শূন্যে থাকতেই পিস্তল নিয়ে এল ক্যাপ্টেনের দিকে, নির্দ্বিধায় ট্রিগার চাপল।

খুন হয়ে যেত গুভাঁ নিঃসন্দেহে, হলো না স্রেফ আরেকজনের দুঃসাহসের কারণে। এরই মধ্যে ঘোড়া ছুটিয়ে চত্বরে প্রবেশ করেছে এক লোক, চলে এসেছে তরুণ ক্যাপ্টেনের পিছনে। দস্সেলুমের সঙ্গে সঙ্গে সে-ও ঝাঁপ দিল ঘোড়ার পিঠ থেকে, এক

ধাক্কায় গুভাঁকে সরিয়ে দিল পিস্তলের সামনে থেকে। লক্ষ্যভ্রষ্ট গুলিটা লাগল আগন্তুকের ঘোড়ার গায়ে। লুটিয়ে পড়ল ওটা।

মাটিতে ধপাস করে পড়ল গুভাঁ। এক গড়ান দিয়ে সোজা হতেই দেখতে পেল পাকা চুলঅলা অচেনা একজন মানুষকে, ওকে না পেয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে দঙ্গেলুম। থাবড়া দিয়ে তার হাত থেকে পিস্তলটা ফেলে দিল লোকটা। পরক্ষণে ছুরি চালাল দঙ্গেলুম। আগন্তুকের মুখে লাগল আঁচড়, কাতরে উঠে মাটিতে পড়ে গেল সে। তার উপর মরণ আঘাত হানতে গেল দঙ্গেলুম, দেরি না করে পিস্তল তুলে গুলি করল গুভাঁ। ছিটকে কয়েক হাত দূরে গিয়ে পড়ল আত্মঘাতী রাজভক্ত। তবে গুরুতর আহত হয়নি সে, মাটিতে পড়েই এক লাফে উঠে দাঁড়াল, খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটল একদিকে। ঢুকে পড়ল একটা গলির ভিতরে।

'ধরো ওকে!' চেঁচিয়ে উঠল গুভাঁ। 'জ্যান্ত ধরা চাই!'

রৈ রৈ করে দঙ্গেলুমের পিছু পিছু ছুটল কয়েকজন সৈনিক।

হাঁচড়ে-পাঁচড়ে আগন্তুকের পাশে চলে গেল গুভাঁ। অজ্ঞান হয়ে গেছে লোকটা। মুখে বড়-সড় একটা আঁচড়, অঝোর রক্তে ভিজে গেছে মুখ। চেহারা চেনা যাচ্ছে না। এমন পাকা চুলঅলা কোনও লোক ওর বাহিনীতেও নেই।

'কে আপনি?' বিস্ময়ে বিড়বিড় করল গুভাঁ।

চারপাশে ভিড় জমে গেছে। ছুটে এসেছে ওর দলের লোকেরা। তাদের দিকে ফিরে গুভাঁ বলল, 'এই লোকটা আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে। তোমরা কেউ ওকে চেনো?'

একজন সৈনিক বলল, 'সার, ভদ্রলোক খানিক আগে পুন্তাখ্‌সুমের রাস্তা দিয়ে শহরে ঢুকেছেন। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলেন। আমরা খুব ব্যস্ত ছিলাম, নাম-ধাম জিজ্ঞেস

করবার সময় পাইনি।'

'পরিচয় নিয়ে তা হলে পরে মাথা ঘামাব,' বলল গুভাঁ। 'আমাদের ডাক্তার কোথায়? জলদি আসতে বলো তাকে।'

কয়েক মিনিটের ভিতরেই ডাক্তারি ব্যাগ নিয়ে ছুটে এল একজন। তাড়াতাড়ি পরীক্ষা করল আগন্তুককে। তারপর বলল, 'আঘাতটা মারাত্মক নয়। ক্ষতটা সেলাই করে দিচ্ছি। বিশ্রাম পেলে সপ্তাখানেকের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠবে।'

'লোকটার সঙ্গে কোনও কাগজপত্র আছে কি না দেখো তো,' নির্দেশ দিল ও।

আগন্তুকের আলখাল্লার পকেট হাতড়ে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করল ডাক্তার, তুলে দিল ক্যাপ্টেনের হাতে। ওটা পড়ল গুভাঁ:

<u>ফরাসি প্রজাতন্ত্র: এক ও অভিন্ন</u>

উপকূলে নিয়োজিত গণফৌজের অধিনায়ক গুভাঁ-র কাছে নাগরিক নিরাপত্তা পরিষদের প্রতিনিধি হিসেবে সিমুর্দাকে পাঠানো হলো এবং এ-ব্যাপারে তাকে পূর্ণ কর্তৃত্ব ও সর্বময় ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

আদেশক্রমে,
খুবেস্পিয়া-দান্তঁ-মাহা।
তারিখ: ২৮ জুন, ১৭৯৩।

চমকে উঠল গুভাঁ। দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেল ওর।

'সিমুর্দা!'

ধীরে ধীরে এবার চোখ খুলল আহত যাজক। আশ্চর্য এক আনন্দে ভরে গেল তার বুক। হালকা হাসি ফুটল তার ঠোঁটে।

জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছ তুমি, গুভাঁ?'

'সিমুর্দা, আপনি এখানে?' হাঁটু গেড়ে তার পাশে বসে পড়ল তরুণ ক্যাপ্টেন। 'এই নিয়ে দ্বিতীয়বার আমার জীবন বাঁচালেন আপনি।'

'আপনি চেনেন এঁকে?' জিজ্ঞেস করল ডাক্তার।

'অবশ্যই! উনি আমার গুরু।' সিমুর্দার পা স্পর্শ করল গুভাঁ। 'এক হিসেবে... উনি আমার পিতাও!'

একটা ঠেলাগাড়িতে তুলে শহরের টাউন-হলে নিয়ে যাওয়া হলো সিমুর্দাকে। মুখ ধুইয়ে তার ক্ষতস্থান সেলাই করে দিল ডাক্তার। তারপর বলল, 'এখন ঘুম দরকার ওঁর। বিশ্রাম দরকার। কেউ যেন বিরক্ত না করে।'

ডাক্তারের নির্দেশ মেনে নিল গুভাঁ, গুরুর পাশে থাকার অদম্য ইচ্ছেকে বহু কষ্টে চাপা দিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল অন্যান্য কাজ নিয়ে। যুদ্ধজয়ের পরেও সেনাপতিকে অনেক দায়িত্ব পালন করতে হয়। ডাক্তার নিষেধ না করলেও গুরুকে সময় দেয়া সম্ভব ছিল না ওর পক্ষে।

টাউন-হলে একাকী শুয়ে রইল সিমুর্দা, কিছুতেই ঘুম এল না তার চোখে। আঘাত আর আনন্দ... এই দুটো পরস্পরবিরোধী অনুভূতি কিছুতেই শান্ত হতে দিচ্ছে না তার স্নায়ুকে। তবে কি সফল হলো তার স্বপ্ন? এই স্বপ্ন কোনোদিন বাস্তবে পরিণত হবে বলে ভাবেনি... ভাবেনি ফের দেখা পাবে পুত্রসম গুভাঁর। ওকেই ছোটবেলা থেকে কোলেপিঠে মানুষ করেছে সে, ওকেই হারিয়ে জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল তার

মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাল সিমুর্দা—আজকের এই দিনটা দেখবার জন্য তাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন বলে। যখন

বিচ্ছেদ ঘটেছিল, তখন গুঁভা ছিল সদ্য কৈশোর পেরুনো এক তরুণ... আজ সে পরিপূর্ণ যুবক। শুধু তা-ই নয়, দুর্ধর্ষ এক সেনানায়কও বটে। ওর চোখের সামনে অসম এক লড়াইয়ে জয় ছিনিয়ে এনেছে ছেলেটা। জনগণের জন্য লড়ছে সে, ভঁদির যুদ্ধে তাদের আশা-ভরসার শেষ স্তম্ভ গুভাঁ... সিমুর্দার ছাত্র। গর্বে বুক ফুলে উঠছে তার।

দিব্যচোখে ছাত্রের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছে সিমুর্দা। প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্বের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি লঁতেনাক। তারই বিরুদ্ধে লড়াই করছে গুভাঁ। আজ যা দেখলেন, তাতে আশা করতে দোষ নেই যে, দেশদ্রোহী শয়তানটাকে শেষ পর্যন্ত পরাস্ত করতে সক্ষম হবে ও। রক্ষা করবে দেশকে। সন্দেহ নেই, তখন ফ্রান্সের সবচেয়ে বড় বীর হিসেবে স্বীকৃতি পাবে ও। শিষ্য হিসেবে এমন কাউকে পাওয়া তো সৌভাগ্যের ব্যাপার।

আপন চিন্তায় বিভোর হয়ে গিয়েছিল সিমুর্দা, সংবিৎ ফিরে পেল পাশের ঘর থেকে আওয়াজ ভেসে আসায়। কাকে যেন ওখানে নিয়ে এসেছে সৈনিকরা। ওদের কথোপকথন থেকে বোঝা গেল, মানুষটা দস্গেলুম নামের সেই যুবক, যে হামলা করেছিল ওদের ক্যাপ্টেনের উপর।

কান পেতে রইল সিমুর্দা। খানিক পর শুনতে পেল গুভাঁর কণ্ঠ।

'এত সময় লাগল কেন ওকে ধরতে?'

'একটা বাড়িতে ঢুকে ঘাপটি মেরেছিল, সার,' জবাব দিল এক সৈনিক। 'তল্লাশি করে খুঁজে বের করতে হয়েছে।'

'হুম! তুমি তো দেখছি আহত, দস্গেলুম।'

'কেন, সুস্থ থাকলে গুলি করে মারতে বেশি সুবিধে হতো?' ঝাঁঝের সঙ্গে বলল দস্গেলুম।

'কে বলল আমি তোমাকে গুলি করতে চাই?'

'কী করবে তা হলে? ফাঁসি দেবে? নাকি গিলোটিনে চড়াবে?'

'কোনোটাই না,' বলল গুভাঁ। সৈনিকদের বলল, 'ওকে একটা বিছানায় শুইয়ে দাও। তারপর ডাক্তারকে ডাকো। আমি চাই ওকে সুস্থ করে তোলা হোক।'

'আমি সুস্থ হতে চাই না,' চেঁচিয়ে উঠল দঙ্গেলুম। 'আমি মরতে চাই।'

'না, তোমাকে বাঁচতে হবে,' বলল গুভাঁ। 'আমাকে তুমি রাজার নামে গুলি করেছিলে। আমি তোমাকে প্রজাতন্ত্রের নামে ক্ষমা করতে চাই।'

বিষাদের একটা ছায়া নেমে এল সিমুর্দার চেহারায়। এ কী করছে তার ছাত্র! ক্ষমা করছে শত্রুকে? জানে না, এর কারণে কত বড় শাস্তি হতে পারে ওর?

কী করবে এখন সিমুর্দা? বাধা দেবে? নিজের ক্ষমতা জাহির করে মৃত্যুদণ্ড দেবে ওই রাজভক্তকে? ব্যবস্থা নেবে গুভাঁর বিরুদ্ধে?

সিদ্ধান্ত নিতে না পেরে বিছানায় ছটফট করতে লাগল সে।

পনেরো

টানা কয়েক সপ্তাহ জীবন-মরণের সীমারেখায় ঝুলে থেকেছে

মিশেল ফ্লেশা। দুটো গুলি লেগেছিল ওর গায়ে—একটা কাঁধের কাছে, ওটা কলার বোন দু'টুকরো করে দিয়েছে; দ্বিতীয়টা বুকের সামান্য উপরে, অল্পের জন্য ফুসফুস ফুটো করে দেয়নি। উদ্ধার পাবার আগে প্রচুর রক্তক্ষরণও হয়েছিল ওর। সব মিলিয়ে একেবারে মৃত্যুর দুয়ারে চলে গিয়েছিল ও। স্রেফ তেলমাখ্‌শের অক্লান্ত সেবা-যত্ন আর ভেষজ চিকিৎসার জোরে যমের মুখ থেকে ফিরে এসেছে ও।

এই কয়েক সপ্তাহ তেলমাখ্‌শের কুটিরেই পড়ে ছিল মিশেল। নড়তে-চড়তে পারেনি। একটা ঘোরের মধ্যে কেটেছে সময়। তবে বৃদ্ধ ভিখিরির জড়িবুটি আর গাছগাছড়ার ওষুধ ধীরে ধীরে সারিয়ে তুলেছে তার ক্ষতগুলো। খাওয়াদাওয়া শুরু করায় আস্তে আস্তে শক্তিও ফিরতে শুরু করেছে শরীরে। তেলমাখ্‌শের গায়ে ভর দিয়ে হাঁটাচলা করতে পারছে।

অবশেষে একদিন পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেছে ও। কারও সাহায্য ছাড়াই বেরিয়ে এসেছে কুটির থেকে। একটা গাছের তলায় বসে উদাস নয়নে তাকিয়ে রয়েছে প্রকৃতির দিকে। ঠোঁট কামড়ে চাপা দিতে চাইছে উদ্গত আবেগ।

মিশেলের দুঃখভরা জীবনের কাহিনির কিছুই জানে না তেলমাখ্‌শ, জানার চেষ্টাও করেনি। যখন ও অসুস্থ অবস্থায় বিছানায় পড়ে ছিল, তখন কথা বলা সম্ভব ছিল না। মিশেল কখনও চেষ্টা করলেও তাকে থামিয়ে দিয়েছে সে। আজ ও সুস্থ বলে তেলমাখ্‌শ নিজেই এগিয়ে এল।

'সুপ্রভাত,' বলল সে। 'তোমাকে একদম সুস্থ মনে হচ্ছে, মেয়ে। হাঁটাচলা করতে পারছ, ক্ষতগুলোও শুকিয়ে গেছে।'

'শুধু শরীরেরগুলো,' বলল মিশেল। 'আমার মনের ক্ষত এখনও সারেনি, মসিয়ো।'

‘কীসের ক্ষত?’

‘আমার সন্তানদের হারানোর ক্ষত। ওরা কোথায়, তা কি আপনি জানেন?’

‘সন্তান?’

‘হ্যাঁ। তিনটা বাচ্চা আছে আমার। আপনি জানতেন না?’

‘জ্বরের ঘোরে তোমাকে প্রলাপ বকতে শুনেছি। সত্যি-মিথ্যে যাচাই করবার অবস্থা ছিল না।’

‘আপনি আমার জীবন বাঁচিয়েছেন, সে-কারণে আমি ঋণী,’ বলল মিশেল। ‘কিন্তু নিঃসঙ্গ এই জীবন নিয়ে কী করব আমি? স্বামীকে হারিয়েছি বেশ কিছুদিন আগে... এখন যদি বাচ্চাদেরও হারাই...’ ফুঁপিয়ে উঠল ও, ‘...দয়া করুন, ওদের খোঁজ এনে দিন আমায়!’

কী বলবে ভেবে পেল না তেলমাখ্‌শ। কী আশ্বাস দেবে... ওর ক্ষমতাই বা কতখানি? কানাঘুষো শুনেছে সে—লঁতেনাক নাকি তিনটা বাচ্চাকে তুলে নিয়ে গেছে। কিন্তু কী ঘটেছে ওদের ভাগ্যে, তা জানে না কেউ। বাচ্চাগুলো আদৌ বেঁচে আছে কি না... থাকলে এ-মুহূর্তে কোথায় আছে... তা কী করে বলবে সে? কাউকে জিজ্ঞেস করেও লাভ হবে না। ওকে এড়িয়ে চলে সবাই, পাগল ভাবে। কথাই বলতে চায় না। তা ছাড়া লঁতেনাক বহুদিন আগেই এলাকা ছেড়ে চলে গেছে। কোন্ ময়দানে, বা কোন্ জঙ্গলে লোকটা যুদ্ধ করে বেড়াচ্ছে, কে জানে! কীভাবে তার নাগাল পাবে তেলমাখ্‌শ?

দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে চলেছে মিশেল। অপরাধবোধে ছেয়ে গেল তেলমাখ্‌শের হৃদয়। তার কারণেই এমন দশা বেচারির। লঁতেনাককে বাঁচিয়ে মস্ত ভুল করেছে সে। বেঁচে গিয়ে কী করেছে লোকটা? জ্বালিয়ে দিয়েছে পুরো গ্রাম, খুন করেছে

নিরীহ মানুষকে... এমনকী অপহরণ করেছে মিশেলের তিনটা নিষ্পাপ সন্তানকে। এমন অমানুষকে কেন বাঁচাল ও? মানবতার খাতিরে? লঁতেনাকের মত লোক মানবতার কী বোঝে? এখন হয়তো তেলমাখ্‌শের কথা ভুলেই গেছে, দেখা হলে চিনতেও পারবে না। মিশেলকে বাঁচিয়ে নিজের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছিল, কিন্তু এখন বুঝতে পারছে তাতে ও সফল হয়নি।

কিছুক্ষণ কান্নার পর মুখ তুলে তাকাল মিশেল। দৃষ্টিতে বাসা বেঁধেছে ক্ষোভ আর ক্রোধ। রাগী গলায় বলল, 'কেন আমাকে বাঁচালেন আপনি?'

'শান্ত হও,' নরম গলায় বলল তেলমাখ্‌শ।

'না, শান্ত হব না আমি! এভাবে কেন বাঁচিয়ে তুললেন আমাকে? মরতে দিলেন না কেন? আর কিছু না হোক, সন্তান হারাবার ব্যথা তো সইতে হতো না! মৃত্যুর ওপার থেকে হয়তো দেখতে পেতাম ওদেরকে।'

'চুপ করো, মেয়ে। এখনও তুমি দুর্বল। চিৎকার-চেঁচামেচি করলে ফের অসুস্থ হয়ে পড়বে।'

'আমি পরোয়া করি না!'

'তা হলে কী চাও তুমি?'

'আমার সন্তানদের খুঁজে বের করতে। কখন এখান থেকে চলে যেতে পারব আমি?'

'চলে যাবে?'

'অবশ্যই। এভাবে বসে থাকতে পারব না আমি।'

'পাগলামি করে কোনও লাভ নেই, মেয়ে। দুর্বল শরীরে কোথায় যাবে তুমি? কোথায় খুঁজবে ওদেরকে?'

'যেখানে পারি!'

'সেটা পণ্ডশ্রম হবে। চলে যাবার কথা যদি বলো, তা হলে

দু'একদিনের মধ্যেই হয়তো রওনা হতে পারবে... কিন্তু বাচ্চাদের খুঁজে পেতে চাইলে শরীরে শুধু শক্তি আর মনোবল থাকলে চলবে না। আরও কিছু চাই।'

'কী সেটা?'

'ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস।'

'ঈশ্বর?' মুখ ঝামটা দিল মিশেল। 'এতদিন তিনি কোথায় ছিলেন?'

'ঈশ্বরকে দোষারোপ কোরো না, মেয়ে,' বলল তেলমাখ্‌শ। 'তাতে তোমার ক্ষতি বৈ লাভ হবে না।'

'লাভ-ক্ষতির আপনি কী বোঝেন? আপনার তো ছেলেমেয়ে নেই। সন্তান না হারালে সন্তান হারাবার ব্যথা বুঝবেন কী করে?'

'অস্বীকার করছি না সেটা। কিন্তু তারপরেও...'

'কীসের তারপর? আমি জানতে চাই আমার বাচ্চারা কোথায়। কেন এসব ঘটছে, কে এসব ঘটাচ্ছে... তাও জানতে চাই আমি। ওরা আমার স্বামীকে খুন করেছে, আমার বাচ্চাদের চুরি করেছে, আমাকে গুলি করেছে... অথচ কেন এসব করেছে তার কিছুই আমি জানি না। এভাবে আর চলতে পারে না।'

মিশেলের বাহু স্পর্শ করল তেলমাখ্‌শ। 'আর কথা বোলো না। তোমার জ্বর আসছে।'

আর কিছু না বলে চুপ হয়ে গেল মিশেল।

সেদিনের পর থেকে কেমন যেন বোবা হয়ে গেল মেয়েটা। প্রয়োজন ছাড়া একটা শব্দও উচ্চারণ করে না। তেলমাখ্‌শের অবাধ্য অবশ্য হয় না, ঠিকমত ওষুধ-পথ্য খায়, খাওয়া-দাওয়াও করে; কিন্তু ওর দিন কাটে কুটিরের বাইরে গাছের তলায়। চুপচাপ বসে বসে কী যেন ভাবে সারাক্ষণ। চেহারায় ফুটে থাকে

বিষাদ।

নিবিড় সহানুভূতি দিয়ে তাকে বোঝার চেষ্টা করে বৃদ্ধ ভিখিরি। মনে মনে মিশেলের জায়গায় বসায় নিজেকে। নাড়িছেঁড়া সন্তানদের হারাবার ব্যথা অনুভব করতে চায় ও-ও। কিন্তু পারে না। সে-ব্যথা এক মা ছাড়া আর কারও পক্ষে অনুভব করা সম্ভব নয়। তেলমাখ্‌শ শুধু এটুকু বোঝে—মাতৃত্ব চিরকালই অবুঝ, অবোধ... তাকে কোনও যুক্তি দিয়ে সান্ত্বনা দেয়া সম্ভব নয়।

তারপরেও চেষ্টা করে সে। একদিন মিশেলকে বলল, 'সম্ভব হলে আমিই তোমাকে নিয়ে যেতাম, মেয়ে। কিন্তু আমি তো বুড়ো হয়ে গেছি। হাঁটতে পারি না। একটু হাঁটলেই ক্লান্ত হয়ে যাই। এ-অবস্থায় যদি তোমার বাচ্চাদের খোঁজে বেরোই, নিজেই একটা বোঝা হয়ে পড়ব। তা ছাড়া আমাদেরকে কেউ সাহায্য করবে না। নীল-সাদা... দু'দলের লোকই আমাকে সন্দেহের চোখে দেখে। গাঁয়ের লোকেরা ভাবে আমি জাদুকর।'

কথাটার জবাবে মিশেল শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকেছিল তার দিকে, কিন্তু কোনও কথা বলেনি।

তেলমাখ্‌শ খেয়াল করেছে, দিনে দিনে এক নীরব নিঃসঙ্গ চিন্তার গভীরে তলিয়ে যাচ্ছে মেয়েটা। যেন নেশার ঘোরে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে সে। এ থেকে ওকে বের করে আনার জন্য কিছু সেলাইয়ের কাজ দিল তেলমাখ্‌শ। কোনও আপত্তি করল না মিশেল—সুঁই-সুতো দিয়ে নিপুণ হাতে আশ্রয়দাতার পুরনো পোশাকগুলো সেলাই আর রিফু করে দিল, কিন্তু কাজের সময়ও তার মন পড়ে রইল অন্যদিকে। চোখে টলটল করতে থাকল পানি।

উপায়ান্তর না দেখে হাল ছেড়ে দিল তেলমাখ্‌শ। মিশেলকে

সান্ত্বনা দেবার... ওকে স্বাভাবিক করে তোলার ব্যর্থ চেষ্টায় ক্ষান্ত দিল। এর ক'দিন পরেই, এক ভোরে ঘুম ভাঙতেই সে লক্ষ করল, জামাকাপড় পরে বাইরে যাবার জন্য তৈরি হয়েছে মেয়েটা। সঙ্গে একটা পোঁটলায় বেঁধে নিয়েছে টুকটাক জিনিসপত্র আর কিছু শুকনো খাবার।

'কোথায় যাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল বৃদ্ধ ভিখিরি।

'আমার বাচ্চাদের খুঁজতে,' সংক্ষেপে বলল মিশেল। বেরিয়ে গেল কুটির থেকে।

তাকে আর বাধা দিল না তেলমাখ্‌শ।

কয়েক সপ্তাহে গৃহযুদ্ধের নাটকীয় উত্থানপতন দেখেছে উপকূলের অধিবাসীরা। বিদ্রোহীদের একাট্টা করে অপ্রতিরোধ্য এক বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন মাহ্‌খি দু লঁতেনাক, দখল করে নিচ্ছিলেন একের পর এক শহর ও গ্রাম। মনে হচ্ছিল রাজতন্ত্রীদের চূড়ান্ত বিজয় স্রেফ সময়ের ব্যাপার। কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে গুভাঁ আর সিমুর্দার আবির্ভাবে খর্ব হয়েছে তাঁর আধিপত্য। কঠিন দুই প্রতিপক্ষ হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে তারা।

ভঁদির যুদ্ধ এখনও চলছে, কিন্তু তাতে এখন পিছু হটার পর্ব চলছে বিদ্রোহীদের। দোউলের পরে আরও কয়েক জায়গায় নিজের সাফল্য দেখিয়েছে গুভাঁ, বিদ্রোহটা পুরোপুরি নির্মূল করতে না পারলেও শত্রুকে অনেকখানিই দুর্বল বানিয়ে ফেলেছে সে। দুর্বল প্রজাতন্ত্রীরাও হয়েছে—তবে সেটা নিজেদের মধ্যকার মতপার্থক্যের কারণে। একটা পক্ষ নিষ্ঠুরতা ও বিভীষিকার তাণ্ডব চালিয়ে যুদ্ধজয় করতে চায়, অন্যপক্ষ চায় যথাসম্ভব মানবতা বজায় রেখে একই কাজ করতে। বলা বাহুল্য, এই দুটো পক্ষের পরস্পরবিরুদ্ধ ভাবধারা তাদের দুই নেতাকে কেন্দ্র করে মূর্ত

হয়ে উঠেছে। দুজনেই যার যার ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভুত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী। শেষ পর্যন্ত কার জয় হবে, কার কর্মপদ্ধতি প্রাধান্য পাবে... সেটাই আসল কথা।

দোটানায় পড়ে গেছে সিমুর্দা। তার কাছে স্পষ্ট নির্দেশ আছে, শত্রুকে কোনও ধরনের ক্ষমা বা মার্জনা দেখানো চলবে না। কনভেনশনের কড়া হুকুম নিয়ে এসেছে সে—বন্দি বিদ্রোহীদের প্রতি কেউ কোনও ধরনের দুর্বলতা প্রদর্শন করলেই তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। অথচ প্রজাতন্ত্রের এই আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলেছে গুভাঁ। এক হাতে সে যেমন শত্রুদের পরাস্ত করে চলেছে, অন্য হাতে ঠিক তেমনি পরাজিত বন্দিদের ক্ষমাও করে চলেছে। ওর ধারণা এবং বিশ্বাস—বিজেতা হিসেবে বিজিতদের ক্ষমা করবার অধিকার ওর আছে। নাগরিক নিরাপত্তা পরিষদের প্রতিনিধি হিসেবে ওর অধিনায়কত্ব কেড়ে নিতে পারে সিমুর্দা, ওকে দাঁড় করাতে পারে বিচারের কাঠগড়ায়... কিন্তু গুভাঁর প্রতি ভালবাসার কারণে বার বার থমকে যেতে হচ্ছে তাকে। শ্রদ্ধাশীল থাকতে পারছে না আইনের প্রতি।

দুই নেতা যেন জীবন আর মৃত্যুর দুটো মূর্ত প্রতীক। একজনের নীতি ধ্বংসের, অন্যজনের নীতির শান্তির। তবু তারা দু'জন দু'জনকে ভালবাসে। অথচ ভালবাসার আড়ালে ধীরে ধীরে সৃষ্টি হচ্ছে গোপন দ্বন্দ্ব। এ এক আশ্চর্য সমস্যা।

সমস্যাটা শেষ পর্যন্ত চরম আকার ধারণ করেই ছাড়ল। অঘোষিত দ্বন্দ্বটা একদিন বিস্ফোরিত হলো, প্রকাশ পেয়ে গেল সবার সামনে। সেদিন সকালে গুভাঁর মুখোমুখি হলো সিমুর্দা। রিপোর্ট চাইবার ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, 'যুদ্ধের খবর বলো, গুভাঁ।'

শুরু থেকেই সিমুর্দার খবরদারিতে অতিষ্ঠ হয়ে আছে গুভাঁ,

আজ তা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল। ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, 'সে-খবর কি আপনি জানেন না? লঁতেনাকের বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছি আমরা। তার সঙ্গে এখন আর বেশি লোক নেই। ফুজেরের জঙ্গলে আত্মগোপন করেছে সে। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে পুরো জঙ্গল ঘিরে ফেলব আমরা। চারদিক থেকে চিরুনি-তল্লাশি চালাব। আশা করছি পনেরো দিনের মধ্যেই গ্রেফতার করতে পারব লোকটাকে।'

'তা তো বুঝলাম। গ্রেফতারের পর কী করবে ওকে?'

'আপনি আমার বিজ্ঞপ্তি দেখেননি?'

'দেখেছি।'

'তা হলে আবার জিজ্ঞেস করছেন কেন? ওখানে তো লিখেই দিয়েছি, ওকে গুলি করা হবে।'

'গুলি? সে তো বড়ই সহজ মৃত্যু। দয়া দেখাতে চাইছ তুমি ওকে।'

'আপনি অন্য কিছু চান?'

'অবশ্যই। গিলোটিনে চড়িয়ে ওর মাথাটা কেটে নেয়া দরকার... আর সেটা জনসমক্ষে।'

'আমি সামরিক মৃত্যুদণ্ডে বিশ্বাস করি।'

'আর আমি বিশ্বাস করি বিপ্লবের মৃত্যুদণ্ডে।'

'তা হলে বলব, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে অনেক ফারাক রয়েছে, গুরু।'

'তা তো বটেই,' একদৃষ্টে গুভাঁর দিকে তাকাল সিমুর্দা। 'সেইণ্ট মার্ক কনভেণ্টের সন্ন্যাসিনীদের তুমি ছেড়ে দিলে কেন?'

'কারণ আমি নারীদের সঙ্গে যুদ্ধ করি না।'

'কিন্তু ওই নারীরা বিপ্লবীদের ঘৃণা করে। এ-ধরনের মেয়েরা দশটা পুরুষের চেয়ে ভয়ঙ্কর। তাও নাহয় মানা গেল,

লুভিনিয়ে-র ব্যাপারটায় এসো। ওখানকার উগ্রবাদী যাজকদের তুমি বিপ্লবী কাউন্সিলের আদালতে বিচারের জন্য পাঠাওনি কেন?'

'একদল বুড়ো যাজক... ঠিকমত হাঁটতে-চলতেই পারে না। কীসের জন্য বিচার করব ওদের? আমি বৃদ্ধদের সঙ্গেও যুদ্ধ করি না!'

'একজন যুবক যোদ্ধার চেয়ে একজন বুড়ো যাজক বেশি বিপজ্জনক। ওদের কথাবার্তায় সাধারণ মানুষ বেশি প্রভাবিত হয়। দয়ার সাগর খুলে বসেছ তুমি, গুভাঁ। ভুল পথে হাঁটছ। কী করা উচিত তোমার, সেটা বুঝতে চাইলে টেম্পল কারাগারের* দিকে নজর দাও।'

'ওখানকার কথাই যদি বলেন, আমি বলব রাজপুত্রকে মুক্তি দেয়া উচিত। উনি নিতান্ত শিশু... আমরা শিশুদের সঙ্গেও যুদ্ধ করছি না।'

ধৈর্য হারাবার দশা হলো সিমুর্দার। দাঁতে দাঁত পিষে সে বলল, 'শোনো গুভাঁ... নারী, শিশু আর বৃদ্ধদের সঙ্গে যুদ্ধ করায় দোষ নেই... বিশেষ করে যদি সেই নারী ফ্রান্সের রানি মারি অঁতুয়েনেত, শিশুটি রাজপুত্র লুই ক্যাপে, আর বৃদ্ধটি পোপ ষষ্ঠ পায়াস হয়!'

'আপনি রাজনীতির কথা বলছেন, গুরু,' নির্বিকার কণ্ঠে বলল গুভাঁ। 'আমি ওসব বুঝি না।'

'যুদ্ধ তো বোঝো? কসি-র অভিযানে কোণঠাসা হয়ে জাঁ ক্রুতোঁ নামে এক বিদ্রোহী একাকী তলোয়ার হাতে তোমার বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তুমি তখন সৈন্যদের সরে

**টেম্পল কারাগার—যেখানে ফরাসি বিপ্লবের সময় রাজা ষোড়শ লুই ও তাঁর পরিবারকে বন্দি করে রাখা হয়েছিল।*

গিয়ে ওকে পালাবার পথ দিতে বলেছিলে। কেন?'

'কারণ একটা লোককে মারার জন্য পনেরো শ' লোকের দরকার হয় না।'

'আস্তিয়ি-তে জোসেফ বেজিয়ে নামে এক আহত বিদ্রোহীকে হত্যা করতে গিয়েছিল তোমার সৈন্যরা, তুমি তাতে বাধা দিয়েছিলে কেন?'

'আহত এবং পরাস্ত শত্রুকে হত্যা করা যুদ্ধের নিয়মবিরুদ্ধ।'

'তুমি ভুল করেছিলে। এখন ওরা দু'জন বিদ্রোহীদের নতুন দুটো সেনাদলের নেতা। ওদেরকে বাঁচিয়ে তুমি প্রজাতন্ত্রের দু'জন শত্রু বাড়িয়েছ।'

'আমি ভেবেছিলাম ওরা প্রজাতন্ত্রের বন্ধু হয়ে দাঁড়াবে।'

'লন্দিঅঁ-তে বিজয়ের পরও তুমি তিনশো বন্দি বিদ্রোহীকে মৃত্যুদণ্ড দাওনি।'

'কারণ, বুশাঁ প্রজাতন্ত্রী বন্দিদেরকে মার্জনা করে। আমি দেখাতে চেয়েছিলাম, রাজতন্ত্রী বন্দিদের বেলাতেও আমরা তেমন মার্জনা দেখাতে জানি।'

'তারমানে কি লঁতেনাককেও মার্জনা করবে?'

'না।'

'কেন? তিনশো বিদ্রোহী যদি মুক্তি পেতে পারে, তা হলে লঁতেনাক কী দোষ করল?'

'ওরা ছিল বোকা, অশিক্ষিত কৃষক না বুঝেই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছে। কিন্তু লঁতেনাক কাজটা করছে জেনে-বুঝে।'

'ও তো তোমার আত্মীয়!'

'হ্যাঁ..., দূর সম্পর্কের চাচা। কিন্তু আমার দেশ তার চেয়ে অনেক বেশি আপন।'

'লঁতেনাক বৃদ্ধ।'

'লঁতেনাকের কোনও বয়স নেই। ইংরেজদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে সে, সর্বনাশ করতে চাইছে দেশের। এর জন্য তাকে শাস্তি পেতেই হবে।'

'কথাটা ভুলে যেয়ো না।'

'প্রশ্নই ওঠে না। লঁতেনাককে ধ্বংস করবার জন্য শপথ করেছি আমি।'

'শুনে খুশি হলাম,' বলল সিমুর্দা। 'মনে রেখো, বিপ্লবের সাফল্যের জন্য চাই কঠোর কর্মী। কুণ্ঠাগ্রস্ত ও দ্বিধাগ্রস্ত মানুষ... দায়িত্ব পালনের সময় যাদের হাত কাঁপে... তাদের দিয়ে বিপ্লব হয় না। বিপ্লব আস্থা রাখে নির্মম, নিষ্ঠুর এবং দৃঢ়চরিত্রের মানুষের উপর। আমাদের নেতাদের কথা ভাবো। দান্তঁ ভয়ঙ্কর, খুবেস্পিয়া অনমনীয়, আর মাহা অটল। সাবধান গুভাঁ, এই মানুষগুলো আমাদের সেনাবাহিনীর মত অত্যাবশ্যক। এদের নাম শুনে পুরো ইয়োরোপ ঠক ঠক করে কাঁপে।'

'তাই বলে অপ্রয়োজনীয় নিষ্ঠুরতা কি আবশ্যক?' প্রশ্ন করল গুভাঁ। 'অহেতুক রক্ত না ঝরিয়ে কি লক্ষ্য অর্জন করা যায় না? ষোড়শ লুই ছিলেন সিংহের পালের ভিতর পড়ে যাওয়া এক ভেড়া। তিনি পালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, নিজেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন... আর সে-কারণে বোকার মত কিছু কাজ করে বসেছিলেন। সেগুলোকেই অপরাধ বলে রায় দিয়ে দিলাম আমরা। নখ-দন্তহীন ভেড়াটাকে প্রজাতন্ত্রের শত্রু আখ্যা দিয়ে খেয়ে ফেলল সিংহরা। এখন আবার নিজেরা মারামারি করছে।'

'কিন্তু ভেড়াটা ছিল বর্বর।'

'আর সিংহরা কী?'

গুভাঁর এই কথাটা ভাবিয়ে তুলল সিমুর্দাকে। সে শান্ত গলায় বলল, 'এই সিংহরাই হচ্ছে বিবেকবুদ্ধি... নতুন চিন্তা আর

ভাবধারা... নতুন নীতি!'

'ওরা সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে!'

'ইতিহাস একদিন প্রমাণ করবে, এই সন্ত্রাস ছিল ন্যায়সঙ্গত।'

'উল্টোটা ঘটাও বিচিত্র নয়। ইতিহাসে বিপ্লবকে সন্ত্রাস বলেও আখ্যা দেয়া হতে পারে। মানে... আমরা যদি এখুনি সতর্ক না হই আর কী।'

'সতর্ক?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল গুভাঁ। 'স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব... এগুলো এখন গোঁড়ামিতে পরিণত হয়েছে। হয়ে উঠেছে ভয়ের বস্তু। কেন? বিশ্বব্যাপী এক প্রজাতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছি আমরা, তার জন্য মানুষকে আতঙ্কিত করে তুলবার প্রয়োজন কী? ভয় দেখিয়ে কখনও লক্ষ্যপূরণ করা যায় না। খারাপ কাজের মধ্য দিয়ে কোনও মঙ্গল আনা যায় না। সিংহাসনকে সরিয়ে সেখানে গিলোটিনের যন্ত্র দাঁড় করাবার কোনও অর্থ হয় না। বিপ্লব হচ্ছে মানুষের মিলন... ওটা ভয়ের বস্তু নয়। ক্ষমার মত সুন্দর আর কিছু নেই। একজন সৈনিক হিসেবে কীভাবে যুদ্ধ করতে হয়, তা আমি জানি। কিন্তু আমি যদি ক্ষমা বা মার্জনা করতে না পারি, তা হলে কষ্ট করে জয়লাভের কী মানে? যুদ্ধের সময় প্রতিপক্ষের ওরা আমাদের শত্রু হতে পারে, কিন্তু যুদ্ধ শেষে ওরা তো আমাদেরই ভাই!'

'এখন ও-ধরনের দয়ামায়া দেখানো মানেই এক ধরনের রাষ্ট্রদ্রোহিতা,' বলল সিমুর্দা। 'গুভাঁ, তুমি আমার ছেলের মত। তাই আবারও সাবধান করে দিচ্ছি, সাবধান... খুব সাবধান!'

তার সে-কথা কানে তুলল না গুভাঁ।

ষোলো

হারানো সন্তানদের খোঁজে অন্ধের মত ঘুরে মরছে মিশেল ফ্লেশা। বিশ্রামের সময় ছাড়া ক্রমাগত হাঁটছে ও। জীবনধারণ করছে কায়ক্লেশে। কখনও ভিক্ষা করছে, কখনও বা বুনো গাছের শিকড়-বাকড় খাচ্ছে। ঘুমাচ্ছে মাটির উপর, খোলা আকাশের নীচে। রোদে পুড়ছে, ভিজছে বৃষ্টিতে। এভাবে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাচ্ছে ও। পথেঘাটে যাকে পাচ্ছে, তার সঙ্গেই কথা বলছে—খুঁজে বেড়াচ্ছে সূত্র।

সিসকয়নিয়া ছাড়া এ-অঞ্চলের আর কোনও জায়গা চেনে না মিশেল। ঘুরে বেড়াচ্ছে উদ্‌ভ্রান্তের মত—কখনও রাস্তায়, কখনও বা গহীন জঙ্গলে। শুরুতে পায়ে জুতো ছিল, কিন্তু সেগুলো ছিঁড়ে গেছে হাঁটতে হাঁটতে। ছিঁড়ে ন্যাতা-ন্যাতা হয়ে গেছে পরনের পোশাকও। জটা ধরেছে মাথার চুলে। সারা গায়ে ময়লার আস্তর। পাগলিনীর মত দেখায় এখন ওকে, লোকজন দূরত্ব বজায় রাখে ওর সঙ্গে। লড়াইয়ের ময়দানের মাঝ দিয়েও নির্বিঘ্নে হেঁটে যেতে পারে ও, কেউ বাধা দেয় না। ও-ও পরোয়া করে না ওসবের। দেশে আইন-শৃঙ্খলা বলে কোনও কিছুর অস্তিত্ব আর নেই, নেই কোনও প্রশাসন বা কর্তৃপক্ষ... তাতে ওর কিছু

যায়-আসে না।

যার সঙ্গেই দেখা হয়, তাকেই নিজের সন্তানদের কথা জিজ্ঞেস করে মিশেল। 'তুমি আমার বাচ্চাদের দেখেছ? দুটো ছেলে আর একটা মেয়ে। ওদের নাম গুনেজাঁ, গোয়াঁইলা আর জর্জেত। বয়স চার, তিন আর দেড় বছর। আমার কাছ থেকে ওদেরকে ধরে নিয়ে গেছে সাদা দলের লোকেরা। দেখেছ ওদের?'

লোকজন ওর প্রশ্ন শুনে শুধু মাথা নাড়ে, তারপর ত্রস্ত পায়ে কেটে পড়ে ওর সামনে থেকে। হতাশায় বুক চাপড়ায় মিশেল। একদিন তার ব্যতিক্রম ঘটল। এক চাষী মন দিয়ে শুনল ওর কথা। তারপর কী যেন ভাবল।

'তিনটা বাচ্চা?' জিজ্ঞেস করল সে।

'হ্যাঁ,' বলল মিশেল।

'দুটো ছেলে?'

'আর একটা মেয়ে।'

'তুমি ওদের মা?'

'হ্যাঁ।'

'এক সেনিয়োখের গল্প শুনেছি আমি—তিনটা বাচ্চাকে ধরে নিয়ে গেছে। তাদেরকে রেখে দিয়েছে নিজের কাছে।'

'কোথায় থাকে এই সেনিয়োখ্?'

'লা তুয়োগে।'

'ওখানে গেলে ওদেরকে পাব?'

'পাওয়া তো উচিত।'

'বলছেন আপনি?'

'হ্যাঁ। লা তুয়োগে যাও।'

'ওটা কী ধরনের জায়গা? গ্রাম, না শহর? নাকি কোনও

খামার?'

'ঠিক বলতে পারব না। আমি ওখানে কখনও যাইনি।'

'জায়গাটা কি অনেক দূর?'

'খুব কাছে নয়, এটুকু বলতে পারি।'

'জায়গাটা কোথায়, তা জানেন?'

'ফুজেরের দিকে।'

'কীভাবে যেতে হয় ওখানে?'

'এ-মুহূর্তে তুমি ভনতখ্ত-এ আছ। উত্তরদিকে রওনা হয়ে যাও। এর্নি আর কুকশেল-এর মাঝখান দিয়ে সোজা চলে যাবে। এরপর লাশোঁ-র পাশ ঘেঁষে লুয়া নদী পার হতে হবে তোমাকে। নদী পার হয়ে পশ্চিমদিকে মোড় নিয়ো, তারপর সোজাপথে এগোলেই ফুজেরে পৌঁছে যাবে। এখুনি যদি রওনা দাও, তা হলে সূর্যাস্ত নাগাদ পৌঁছে যাবার কথা।'

চাষীর কথা শেষ হতেই হনহন করে হাঁটতে শুরু করল মিশেল। পিছন থেকে লোকটা চিৎকার করল, 'সাবধানে যেয়ো, পথে কিন্তু যুদ্ধ চলছে।'

কথাটা মিশেল শুনল কি শুনল না, বোঝা গেল না।

কোনও পথিক যদি লিনিয়োলে হয়ে ফুজের অরণ্যে ঢোকে, তারপর বেরিয়ে আসে পারিন্হি-র দিক দিয়ে... তা হলে ভীমদর্শন এক ইমারত দেখে থমকে দাঁড়াতে হবে তাকে। ওটাই লা তুয়োগ দুর্গ। নবম শতকে নির্মাণ শুরু হয়েছিল এই প্রাসাদ-দুর্গের, শেষ হয় দ্বাদশ শতকে—তৃতীয় ক্রুসেডের কিছুদিন পরে। পুরু পাথুরে দেয়াল, উঁচু ছাত আর উচ্চভূমিতে অবস্থান মিলিয়ে অজেয় এক ঘাঁটি ওটা।

উল্টো করে রাখা একটা ট্রাম্পেটের মত আকার

দুর্গটার—নীচদিক চওড়া, যত উপরে গেছে ততই সরু হয়ে এসেছে। ভিতরে ছোট বড় নানা আকারের কক্ষ ছাড়াও রয়েছে কামান বসানোর জায়গা। দুর্গের একেবারে উপর দিকে কিছু গুপ্তকক্ষও আছে, তবে জানা না থাকলে ওগুলোর হদিস পাওয়া কঠিন। দরজাগুলো পাথরের দেয়ালের গায়ে একেবারে মিশিয়ে রাখা হয়েছে। এ ছাড়া মাটির তলায় রয়েছে ডানজন, সেখানকার বন্দিশালায় রয়েছে অপরাধীদের উপর নির্যাতন চালাবার মত নানা ধরনের যন্ত্র। বলা হয়ে থাকে, লা তুয়োগের কারাগারে ঢুকলে কেউ জীবন নিয়ে ফিরে আসতে পারে না।

সব মিলিয়ে বাস্তিলের মতই জমজমাট এক দুর্গ লা তুয়োগ, গড়ে উঠেছে ছোট একটা পাহাড়ের উপরে। পাহাড়কে ঘিরে বয়ে গেছে একটা নদী। নদীটা জানুয়ারি মাসে কানায় কানায় ভরা থাকে, আর জুন মাসে শুকিয়ে মরে যায় একেবারে। চারদিকে ঘন অরণ্য আর নদী মিলিয়ে জায়গাটা একেবারে দুর্ভেদ্য ও দুর্গম। শুরুতে নদী পার হবার জন্য একটা ড্র-ব্রিজ ছাড়া আর কিছু ছিল না, তবে গুভাঁর পরিবার ভাইকাউন্ট থেকে মাহ্খি হবার পরে, যখন রাজদরবারে নিয়মিত যাতায়াতের প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন তৈরি করা হয় স্থায়ী সেতু।

দুর্গের পশ্চিম দিকে একটা উঁচু মালভূমি আছে, তার তলায় রয়েছে সমতল প্রান্তর। দুর্গ আর মালভূমির মাঝখানে রয়েছে একটা গিরিখাত। সেই গিরিখাতের উপরে তৈরি করা হয়েছে সেতু। সেতুটা তিনতলা। নীচতলা দিয়ে যাওয়া-আসা করে মানুষ আর যানবাহন, দোতলায় রয়েছে লাইব্রেরি, আর তিনতলায় শস্য-ভাণ্ডার।

যুদ্ধকৌশলের দিক থেকে সেতুটা লা তুয়োগের মস্ত বড় এক দুর্বলতা। মালভূমি অতিক্রম করতে পারলে শত্রুরা সহজেই

দখল করতে পারবে এই সেতু, আগুন ধরিয়ে দিতে পারবে তাতে। লাইব্রেরি আর শস্যভাণ্ডারে রাখা সবকিছুই অতি-দাহ্য, ফলে আগুনটা খুব সহজে ছড়িয়ে পড়বে দুর্গের মূল সীমানার ভিতরে। এ-ধরনের বিপদ ঠেকানোর জন্য সেতুর মুখে একটা লোহার দরজা লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। ওটা সবসময় তালাবদ্ধ থাকে, আর চাবিটা থাকে দুর্গ-প্রধানের কাছে। দরজাটা যথেষ্ট মজবুত—ভাঙা তো সম্ভবই নয়, এমনকী কামানের গোলার আঘাতও সহ্য করতে পারবে ওটা।

ইতোমধ্যে জুলাই পেরিয়ে আগস্ট মাস শুরু হয়েছে। সংঘাত আর যুদ্ধের আগুন আরও তীব্র হয়ে উঠেছে ফ্রান্সের বুকে। আততায়ীর ছুরিকাঘাতে খুন হয়েছে মাহা, গিলোটিনে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে তার হত্যাকারিণী শার্লট কর্ডে-কে।

ভঁদির যুদ্ধ অব্যাহত রয়েছে। তবে বড় আকারের লড়াই এড়িয়ে খণ্ডযুদ্ধের কৌশল বেছে নিয়েছে বিদ্রোহীরা। তাদের আট হাজার সৈন্যের বিশাল এক ফৌজ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে উসেনিতে, শাতিঅঁ-তেও খেতে হয়েছে প্রচণ্ড মার। পালাতে হয়েছে অধিকৃত পার্থেনে, ফঁতেনে, পার্নিক, সেইবলস্, আর লুযোঁ-সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে। ধীরে ধীরে কোণঠাসা হয়ে পড়ছে তারা, সাহায্য পাচ্ছে না কোনও জায়গা থেকে। ইংরেজরা জাহাজ আর সৈন্যসামন্ত নিয়ে আটকা পড়ে আছে সাগরে, ডাঙায় নামবার উপায় নেই তাদের। অগত্যা পশ্চাদপসরণ করতে করতে ফুজের অরণ্যে পৌঁছে গেছে বিদ্রোহীরা, আশ্রয় নিয়েছে লা তুয়োগে। আগস্টের শেষদিকে দুর্গটা অবরোধ করে ফেলল প্রজাতন্ত্রী বাহিনী।

অবরোধ শুরু হবার কয়েকদিন পরের এক সন্ধ্যা। আকাশে ধীরে

ধীরে ফুটতে শুরু করেছে রাতের তারা। বাতাস স্থির, নিস্তরঙ্গ। গাছের একটা পাতাও নড়ছে না। চারদিক নীরব, নিস্তব্ধ। হঠাৎ সেই নীরবতা খান খান করে দিয়ে বেজে উঠল একটা শিঙা। আওয়াজটা এসেছে দুর্গের ভিতর থেকে। ওটা আসলে এক ধরনের সঙ্কেত, এক পক্ষ আরেক পক্ষের সঙ্গে কথা বলতে চায়।

গুভাঁর নির্দেশে প্রজাতন্ত্রী শিবির থেকে একই ভঙ্গিতে শিঙা বাজানো হলো, সম্মতি দেয়া হলো আলোচনায়।

প্রতিপক্ষের কাছ থেকে অনুকূল সাড়া পেয়ে দুর্গের দিক থেকে উদাত্ত গলায় কথা বলতে শুরু করল একজন।

'অবরোধকারীদের উদ্দেশে বলছি, আমি গুঁজ লু ব্রুয়োঁ—ব্রিসব্লু এবং লিমানুস নামেও অনেকে ডাকে আমাকে। আমার মালিক... ফঁতেনের ভাইকাউন্ট, সাত অরণ্যের অধিপতি... মাহ্খি দু লঁতেনাকের পক্ষ থেকে তোমাদের জানিয়ে দিতে চাই, দুর্গ জয়ের অবান্তর আশা ত্যাগ করে ঘরে ফিরে যাও। যা তোমরা করতে চাইছ, তা কখনোই সম্ভব হবে না। পতন ঘটবে না এই দুর্গের। তা ছাড়া এখানে আশ্রয় নেবার আগেই আমাদের মাহ্খি তাঁর বিশ্বস্ত ছ'জন অনুচরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে দেশের ছয় জায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। কাজেই তাঁকে আটক বা হত্যা করে রাজভক্তদের প্রতিবিপ্লব বন্ধ করতে পারবে না তোমরা। মাহ্খির অনুচরেরা তাঁর কাজ চালিয়ে যাবে।

'তোমাদের মনে করিয়ে দেয়া প্রয়োজন, আমাদের বিরুদ্ধে যে-যুদ্ধে তোমরা নেমেছ, তা অন্যায় যুদ্ধ। আমরা এ-দেশেরই মানুষ, এ-দেশেই বাস করি, এখানকার মাটিতে আমাদের অধিকার তোমাদের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। শিশিরসিক্ত ঘাসের মতই আমরা সরল ও বিশুদ্ধ প্রকৃতির ঈশ্বরভক্ত মানুষ।

প্রজাতন্ত্রের নামে তোমরা আমাদেরকে আক্রমণ করেছ। পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছ আমাদের ঘরবাড়ি, নষ্ট করে দিয়েছ আমাদের খেত-খামার আর ফসল, আমাদেরকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছ বনে-জঙ্গলে!

'এখন তোমরা আমাদের দুর্গ ঘিরে ফেলেছ। আমাদের বহু অনুগামীকে তোমরা হত্যা করেছ। তোমাদের কাছে কামান আছে, সৈন্য আছে... কিন্তু আমাদের হাতে কিছুই নেই। এ-অবস্থায় আমাদের উপর চূড়ান্ত হামলা চালাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছ তোমরা। ভেবো না আমরা চুপচাপ সহ্য করব এই আক্রমণ। অস্ত্র বা লোকবল নেই তো কী হয়েছে, আমাদের হাতে তিনটা বাচ্চা আছে... তোমাদের খুব প্রিয় তিনটা বাচ্চা। যদ্দূর জানি, এই বাচ্চাদেরকে তোমাদেরই একটা সেনাদল লালন-পালন করছিল, ওদের উদ্ধারের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছ তোমরা। ওরা এখন আমাদের হাতে। যদি সুস্থ অবস্থায় ওদেরকে ফিরে পেতে চাও, তা হলে আমাদের একটা প্রস্তাব মেনে নিতে হবে তোমাদেরকে। অবরোধ তুলে নিতে হবে, আমাদেরকে চলে যেতে দিতে হবে বিনা বাধায়।'

'আর আমরা যদি প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করি?' প্রজাতন্ত্রীদের পক্ষ থেকে হেঁড়ে গলায় প্রশ্ন করা হলো।

'তা হলে মস্ত ভুল করবে,' বলল গুঁজ লু ব্রুয়োঁ। 'গিরিখাতের উপরের সেতুটা তো দেখেছ। দোতলায় বইয়ে ঠাসা লাইব্রেরি আর তিনতলায় শুকনো খড়ে ভর্তি শস্য-ভাণ্ডার আছে ওটার। নীচতলায় আলকাতরার অনেকগুলো পিপেও রেখেছি আমরা। বাচ্চাদেরকে রাখা হয়েছে দোতলায়। তোমরা যদি এদিক দিয়ে হামলা চালাও, তা হলে আগুন ধরে যাবে সেতুতে। অন্যদিক থেকে হামলা করলে আগুনটা আমরাই ধরাব। বাচ্চারা পুড়ে

মরবে। এখন ভেবে দেখো কী করবে।'

'ভাবাভাবির কিছু নেই,' নতুন একটা কণ্ঠ ভেসে এল প্রজাতন্ত্রীদের শিবির থেকে। 'তিনটা বাচ্চার জন্য প্রজাতন্ত্রের সবচেয়ে বড় শত্রুকে ছেড়ে দেব না আমরা। গুঁজ লু ব্রুয়োঁ, তোমার মালিককে জানিয়ে দাও, আত্মসমর্পণের জন্য চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিচ্ছি আমরা। এরপর হামলা করা হবে তোমাদের উপর। লঁতেনাকের সাধের দুর্গ চুরমার করে দেব আমরা, তোমাদের সবাইকে মিশিয়ে দেব মাটির সঙ্গে।'

গলাটা শুনে দুর্গের ছাতের কিনারে এসে দাঁড়ালেন লঁতেনাক। জিজ্ঞেস করলেন, 'কে কথা বলে ওখানে? সিমুর্দা, তুমি?'

'হ্যাঁ, সেনিয়োখ্। আমিই!'

'বেঈমান! যাজক হয়ে প্রজাতন্ত্রীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছ?'

'আমি ন্যায়ের পক্ষে যোগ দিয়েছি। এখানে যদি কোনও বেঈমান থাকে, সেটা তুমি, লঁতেনাক! দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছ তুমি। হাত মিলিয়েছ ইংরেজদের সঙ্গে।'

সামনাসামনি হলে কথাটার উপযুক্ত জবাব দিতে পারতেন মাহ্খি। কিন্তু দূর থেকে চিৎকার করে তর্ক চালানো মুশকিল। নিষ্ফল আক্রোশে হাত মুঠো করলেন তিনি। সরে গেলেন ছাতের উপর থেকে।

লঁতেনাক বা সিমুর্দা... কেউই মিথ্যে হুমকি দিচ্ছে না। গত কয়েক সপ্তাহে নিষ্ঠুরতার প্রতিযোগিতায় যেন মেতে উঠেছে দু'জনে। বিসর্জন দিয়েছে বিবেক আর মানবতা। ওদের নামদুটো এখন সাধারণ মানুষের জন্য বিভীষিকা। জনগণের ঘৃণার পাল্লায় ওজন করলে দু'জনেই সমানে সমান। রাজনৈতিক আদর্শের পার্থক্য থাকলেও চরিত্রগত দিক থেকে অদ্ভুত মিল

রয়েছে ওদের। লক্ষ্য অর্জন আর উদ্দেশ্য পূরণের জন্য নারকীয় পথ বেছে নিয়েছে ওরা।

যা হোক, সিমুর্দার ঘোষণায় অবরুদ্ধ রাজতন্ত্রীরা চব্বিশ ঘণ্টা সময় পেল ইতিকর্তব্য নির্ধারণ ও বিশ্রাম নেবার জন্য। এই সুযোগে পরিস্থিতি বিচার করে নিলেন লঁতেনাক। প্রায় সাড়ে চার হাজার সৈন্য নিয়ে তাঁদেরকে ঘিরে ফেলেছে গুভাঁ আর সিমুর্দা। এদের মধ্যে কিছু হলো জাতীয় রক্ষীবাহিনীর লোক, আর বাকিরা নিয়মিত সেনাবাহিনী। দুর্গের সামনে-পিছনে ছ'টা করে কামান বসিয়েছে ওরা। ওগুলোর সাহায্যে দুর্গের সীমানাপ্রাচীর ভেঙে ভিতরে ঢুকে পড়তে পারবে শত্রুরা। অন্যদিকে মাহ্খির সঙ্গে আছে মাত্র উনিশ জন লোক। এদের নিয়ে আর যা-ই হোক, সাড়ে চার হাজার শত্রুকে ঠেকানো সম্ভব নয়।

বলে রাখা ভাল, লু তুয়োগ দুর্গের প্রতি আলাদা একটা দুর্বলতা আছে গুভাঁর। এটা তার পূর্বপুরুষদের আবাস, নিজেও বড় হয়েছে এখানে। এই দুর্গে জন্ম হয়েছে ওর... এখানেই কেটেছে শৈশব আর কৈশোর। দুর্গটার সঙ্গে রয়েছে তার নাড়ির টান। কিন্তু লঁতেনাকের কোনও টান নেই জায়গাটার প্রতি। সারাজীবন ভার্সাইয়ে কাটিয়েছেন তিনি, ঠেকায় পড়ে আজ আশ্রয় নিয়েছেন লা তুয়োগে, নইলে আগে কখনও আসেননি। দুর্গটাকে ধ্বংস করে দিতে কুণ্ঠাবোধ করবেন না। পরাজয় নিশ্চিত জানলে নিশ্চয়ই তা করবেন।

সে-কারণে দুর্গে হামলা চালাবার ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্বে দুলছে গুভাঁ। হামলা মানেই অগ্নিকাণ্ড। বাচ্চা তিনটের কথা যদিও বাদও দেয়, আগুনে ধ্বংস হয়ে যাবে দুর্গের লাইব্রেরি—ওখানে রক্ষিত আছে গুভাঁর পরিবারের বংশানুক্রমিক হাজারো নথিপত্র। ওগুলো কিছুতেই হারাতে চায় না ও।

সাত-পাঁচ ভেবে বিকল্প পথে আক্রমণের পরিকল্পনা সাজাল গুভাঁ। সেতু নয়, হামলাটা করা হবে দুর্গের পিছনে বনের দিক থেকে। সেতুর সামনে ছোট একটা দল রাখা হবে ও-পথে কেউ যাতে পালাতে না পারে, সেটা নিশ্চিত করবার জন্য। ওর পরিকল্পনায় বাদ সাধল না সিমুর্দা। তবে খুব একটা খুশিও হলো না। যুদ্ধের ময়দানে আবেগের কোনও স্থান নেই, অথচ সেই আবেগের সামনে মাথা নত করছে তরুণ ক্যাপ্টেন। সহজ পথে আক্রমণ না চালিয়ে বেছে নিচ্ছে কঠিন পথ। কোনও মানে হয়?

এমন নয় যে, লা তুয়োগ দুর্গের প্রতি নিজের কোনও আবেগ নেই সিমুর্দার। এককালে ও নিজেও এখানকার বাসিন্দা ছিল। যে-লাইব্রেরিকে বাঁচাতে চাইছে গুভাঁ, সেখানেই তাকে লেখাপড়া শিখিয়েছে সে। দুর্গের চার দেয়ালের ভিতরে ছেলেটাকে বড় হতে দেখেছে। সুখ-দুঃখের হাজারো স্মৃতি মিশে আছে লা তুয়োগের প্রতিটা ইঁটে। তাই বলে কাতর হয়ে পড়া সাজে না একজন সেনানায়কের। চাইলে এ-নিয়ে তর্ক করতে পারত গুভাঁর সঙ্গে, কিন্তু ইচ্ছে হয়নি। দুই নেতার মাঝে ঝগড়া-বিবাদ দেখলে মনোবল হারাবে সৈন্যরা, তাই চুপচাপ গুভাঁর পরিকল্পনা মেনে নিয়েছে সে।

রাতভর দুই পক্ষই প্রস্তুতি নিতে থাকল পরের দিনের জন্য।

সহকারী গিশঁমকে ডেকে গুভাঁ বলল, 'গিশঁম, একটা মই দরকার আমাদের।'

'মই তো নেই, সার!' জানাল গিশঁম।

'জোগাড় করো।'

'কী ধরনের মই চাইছেন? দুর্গের সীমানাপ্রাচীর টপকাবার জন্য?'

'না। সেতুর উপর থেকে বাচ্চাতিনটেকে নামিয়ে আনার জন্য।'

'তা হলে তো অনেক লম্বা মই দরকার।'

'তা তো বটেই। অন্তত তিনতলায় ওঠার মত। নইলে ওদেরকে উদ্ধার করা যাবে না।'

'বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আমাদের সঙ্গে মই নেই, সার।'

'নেই কেন?'

'এতদিন তো বনে-জঙ্গলে যুদ্ধ করেছি, মইয়ের প্রয়োজন পড়েনি। তাই সঙ্গে আনা হয়নি।'

'এখন তা হলে একটা তৈরি করে ফেলো।'

'তিনতলায় ওঠার মত মই বানানো সম্ভব নয়, সার। অত লম্বা বাঁশ-কাঠ নেই আমাদের কাছে।'

'সেক্ষেত্রে কয়েকটা ছোট মই একসঙ্গে জুড়ে দাও।'

'থাকলে তো দেব! ছোট-বড় কোনও মই-ই নেই আমাদের কাছে।'

'কোথাও থেকে জোগাড় করা যায় না?'

'না, সার। আশপাশের গ্রামে-গঞ্জে কোথাও মই নেই। চাষীরা সব নষ্ট করে দিয়েছে—ঠিক যেভাবে নষ্ট করেছে সেতু আর সাঁকো। আমাদের কাজে লাগতে পারে, এমন কোনও কিছুই আস্ত রাখেনি ওরা।'

হতাশা অনুভব করল গুভাঁ। 'কিন্তু যেভাবেই হোক, একটা মই যে আমার চাই!'

একটু ভাবল গিশঁম। তারপর বলল, 'এক কাজ করা যায়, সার। জ্যাভ্নে-তে একটা কাঠের দোকান আছে। ওখানকার মিস্ত্রীকে দিয়ে একটা মই তৈরি করিয়ে নেয়া যেতে পারে।'

'তা-ই করো... এবং তাড়াতাড়ি! আমাদের হাতে একদম

সময় নেই।'

'মইটা কখন চাই?'

'আগামীকাল এই সময়ে।'

'তা হলে এখুনি একজনকে জ্যাভ্নে-তে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ওখানে আমাদের একটা অশ্বারোহী দল আছে। কাজটা ওদেরকেই দেব। কাল সকালেই একটা মই পাঠাতে বলব ওদেরকে।'

'পাঠাও। আমি লিখিত আদেশ দিয়ে দিচ্ছি।'

দশ মিনিট পরেই রওনা হয়ে গেল প্রজাতন্ত্রীদের বার্তাবাহক।

মালভূমির উপরে উঠল গুভাঁ। নজর বোলাল গিরিখাতের ওপাশে। ঠায় দাঁড়িয়ে আছে পাথরে গড়া ত্রিতল সেতু। ওটা দখল করলেই সমস্যার সমাধান হবে না ওর। ড্র-ব্রিজ তুলে রাখা হয়েছে দুর্গের; কাজেই নদী পার হতে হবে ওখানে পৌঁছুতে চাইলে। ওরা যখন পানিতে নামবে তখন আড়াল বলতে কিছু পাওয়া যাবে না। উপর থেকে গুলি ছুঁড়তে পারবে শত্রুরা। অবস্থাদৃষ্টে পিছন দিক থেকে আক্রমণ কারাই যুক্তিসঙ্গত মনে হচ্ছে তার কাছে।

সিমুর্দার নেতৃত্বে একদল সৈন্যকে সেতুর সামনে পাহারায় বসিয়ে দিল গুভাঁ। এদিক দিয়ে কাউকে পালাতে দেবে না সে। বাকি সৈন্য নিয়ে নিজে চলে গেল দুর্গের পিছনের বনে।

বাইরে যখন এভাবে আক্রমণের প্রস্তুতি চলছে, দুর্গের ভিতরে তখন চলছে প্রতিরক্ষার প্রস্তুতি। পিছন দিকের দেয়ালে বড় একটা ফাটল আছে, সেখান দিয়ে দুর্গের হলঘরে পৌঁছুনো যায়। ইঁট গেঁথে ফাটলটা বন্ধ করে দিলেন লাঁতেনাক। কাজটা সারার জন্য নিজেও হাত লাগালেন অধীনস্থদের সঙ্গে। দেয়ালে

ছোট কয়েকটা ফুটো রাখা হলো গুলি ছোঁড়ার জন্য।

মাহ্খি যখন দেয়ালের ফাটল বন্ধ করায় ব্যস্ত, গুঁজ লু ক্রুয়োঁ তখন ব্যস্ত সেতু নিয়ে। তিনজন সঙ্গী নিয়ে তিনতলা কাঠামোর পুরোটাই ঘুরে ঘুরে দেখল সে। শস্য-ভাণ্ডারে শুকনো খড়ের অভাব নেই, নীচতলায় আলকাতরার পিপেও রাখা হয়েছে, লাইব্রেরিতে রয়েছে কয়েক হাজার বই-সহ অন্যান্য কাগজপত্র। গন্ধক-মাখানো দড়ি বিছানো হলো প্রতিটি তলায়, বাইরে থেকে ওগুলোর সাহায্যে খুব সহজে আগুন ধরিয়ে দেয়া যাবে পুরো সেতুতে।

কাজ শেষ হলে দোলনার মত তিনটা ঝুড়িতে ঘুমন্ত তিন শিশুকে দোতলায় নিয়ে গেল ওরা। ঝুড়িগুলো এমনভাবে বয়ে আনল, যাতে ওদের ঘুম না ভাঙে। বেশ গরম পড়েছে, লাইব্রেরির জানালাগুলো তাই খুলে দেয়া হলো, যাতে বায়ু-চলাচল করতে পারে। বাচ্চাদের ঘুম যেন আরামের হয়। এরপর সেতুর মূল দরজায় বাড়তি তালা লাগানো হলো। সন্তুষ্ট হয়ে দুর্গে ফিরে গেল গুঁজ লু ক্রুয়ো। ছাতে উঠে বসে পড়ল পাহারায়।

ধীরে ধীরে রাত কেটে গিয়ে সকাল হলো। ছাত থেকে গুঁজ লু ক্রুয়ো দেখল, বনের ধারে জমায়েত হয়েছে শত্রুসেনারা—হাতে তলোয়ার, কাঁধে বন্দুক, আর পিঠে গুলির বাক্স। দুর্গের ভিতরেও তখন যথাসামান্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হামলা ঠেকাবার জন্য তৈরি হয়ে গেছে উনিশজন বিদ্রোহী।

এসবের কিছুই টের পেল না অবুঝ তিন শিশু। সেতুর দোতলায় মড়ার মত ঘুমাচ্ছে ওরা।

সতেরো

বেলা একটু বাড়লে ধীরে ধীরে ঘুম থেকে জেগে উঠল বাচ্চারা। প্রথমে চোখ মেলল জর্জেত। বিশ মাস বয়সী মেয়েটি তার ছোট্ট মাথাটা তুলে আস্তে আস্তে উঠে বসল দোলনায়। মনে হলো, যেন একটা ফুল তার পাপড়িগুলো মেলে দিল।

গুনেজাঁ আর গোয়াঁইলা তখনও ঘুমোচ্ছে। একজন উপুড় হয়ে, অন্যজন চিত হয়ে। পরনের ছিন্নভিন্ন পোশাক। অপহৃত হবার পর নতুন কোনও পোশাক দেয়া হয়নি ওদের। খাবার দেয়া ছাড়া আর কোনও যত্নও পাচ্ছে না ওরা। কিন্তু এতসব দুঃখ-দুর্দশার মাঝেও চেহারার দেবজ্যোতি হারিয়ে যায়নি ওদের।

সোজা হয়ে বসে গুন গুন করে কী যেন বলতে শুরু করল জর্জেত। ঠিক যেন কোনও পাখি গান গাইছে। বিপদের কোনও আভাস নেই তাতে, বিপদ বোঝার বয়স হয়নি ওর। সুন্দর মুখটা হাসি হাসি হয়ে আছে, শান্ত সকালকে নির্মল হাসি দিয়ে যেন বরণ করে নিচ্ছে ও।

ওর কণ্ঠ শুনেই বুঝি খানিক পরে চোখ মেলল গুনেজাঁ। উঠে বসতেই দেখল, তার ঝুড়ির পাশে সুপের একটা বাটি রেখে যাওয়া হয়েছে। খিদে পেয়েছে গুনেজাঁর। ঝুড়ি থেকে নেমে শব্দ

করে খেতে লাগল সেই সুপ। খানিক পরে গোয়াঁইলাও জাগল। ভাইয়ের দেখাদেখি সে-ও সুপের বাটি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

খানিক পরে বলে উঠল গুনেজাঁ, 'আমার খাওয়া শেষ।'

ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাল জর্জেত। এতক্ষণে ওর পেটেও খিদে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। অস্পষ্ট গলায় বলল, 'আমিও সুপ খাব!'

হামাগুড়ি দিয়ে বোনের কাছে গেল গুনেজাঁ। মেঝে থেকে তার বাটিটা তুলে নিল, সাহায্য করল জর্জেতকে সুপ খেতে।

হঠাৎ খোলা জানালা দিয়ে বাইরে থেকে ভেসে এল রণবাদ্য। তারপর শোনা গেল শিঙার আওয়াজ। চমকে উঠে ওদিকে তাকাল তিন শিশু।

বনের দিক থেকে ভেসে এল একটা কর্কশ কণ্ঠস্বর, 'সময় শেষ হয়ে আসছে, বেঈমানের দল! তোমাদের সতর্ক করে দিচ্ছি, সূর্যাস্তের আগেই যদি আত্মসমর্পণ না করো, আমরা আক্রমণ করতে বাধ্য হব!'

তার জবাবে দুর্গের ছাত থেকে ক্ষিপ্ত গলায় বলা হলো, 'করো আক্রমণ! আমরা পরোয়া করি না।'

'আক্রমণ শুরুর আধঘণ্টা আগে আমরা একবার কামান দাগব। মনে রেখো, ওটাই তোমাদের শেষ সুযোগ। এরপরে আর দয়া দেখানো হবে না।'

'যা খুশি করো। আমরা তার জন্য তৈরি আছি।'

দুই পক্ষের এই তর্জন-গর্জনের অর্থ বুঝল না বাচ্চারা। জর্জেত শুধু হাততালি দিয়ে বলে উঠল, 'বাজনা বাজছে!'

ছেলেদুটি তার কথায় কান দিল না। ওরা তখন ঘরের মেঝেতে একটা কাঠপোকার দিকে তাকিয়ে আছে।

'দেখেছ, কত্তো ছোট্ট পোকা!' ভাইয়ের উদ্দেশে বলল

গোয়াঁইলা।

হামাগুড়ি দিয়ে পোকাটার দিকে এগিয়ে গেল গুনেজাঁ।

গোয়াঁইলা বলল, ‘সাবধান! ওটা কিন্তু কামড়ায়।’

‘কামড়াতে এলেই পিষে ফেলব,’ হুমকির সুরে বলল গুনেজাঁ।

‘ঠিক বলেছ!’

ভাইয়ের দিকে তাকাল জর্জেত। কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। বলল, ‘আমিও পোকা দেখব।’

ওকে দোলনা থেকে নামতে সাহায্য করল গুনেজাঁ। নিয়ে গেল পোকার কাছে। তিনজনে ঘিরে বসল ওটাকে। বোধহয় ভয় পেয়েই ছুট লাগাল পোকাটা। অদৃশ্য হয়ে গেল ঘরের এক কোণে। হামাগুড়ি দিয়ে ওটার পিছু পিছু গেল তিন শিশু, খিলখিল করে হাসছে।

খোলা জানালা দিয়ে কয়েকটা পাখি ঢুকে পড়ল এমন সময়। ছাতের কড়িবরগার কোনায় বাসা বেঁধেছে ওগুলো। ওখানে ঢুকে সুরেলা গলায় ডেকে উঠল।

জর্জেত আঙুল তুলে বলল, ‘মুরগি!’

‘মুরগি না,’ ওকে সংশোধন করে দিল গুনেজাঁ। ‘পাখি।’

‘পাখি!’ শব্দটার পুনরাবৃত্তি করল জর্জেত।

একটু পর কতগুলো মৌমাছি ঢুকল ঘরে। ডানার গুঞ্জন তুলে উড়ে বেড়াতে শুরু করল এদিক-সেদিক। গুনেজাঁর হাত টেনে ধরল জর্জেত। মৌমাছি দেখিয়ে বিজ্ঞের মত বলল, ‘পাখি!’

‘পাখি না,’ আবার বোনকে শেখাল গুনেজাঁ। ‘মাছি।’

গোয়াঁইলা তখন ঘরের ভিতরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শেলফ থেকে নামাচ্ছে একের পর এক বই। পাতা উল্টে ছবি দেখছে। খানিক পর জর্জেত আর গুনেজাঁও যোগ দিল ওর সঙ্গে। মজার এক

খেলা পেয়ে গেছে তিন ভাইবোন, ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

বাইরের গোলমাল তখন স্তিমিত হয়ে এসেছে। খানিক পর নেমে এল নীরবতা। হঠাৎ খেলা থামিয়ে স্থির হয়ে গেল গুনেজাঁ। কী যেন মনে পড়ে গেছে। দিব্যচোখে ভেসে উঠেছে একটি মায়াময় মুখ, বহুদিন থেকে সেই মুখটা দেখছে না ওরা। সকালের শান্ত পরিবেশে মানুষটার অভাব অনুভব করল।

'মা!' ফিসফিস করে ডেকে উঠল ছেলেটা।

গোয়াঁইলাও যোগ দিল তার সঙ্গে। 'মা! আমি মায়ের কাছে যাব!' ধরা গলায় বলল সে।

জর্জেত এসবের কিছুই বুঝতে পারছে না। সে হাততালি দিয়ে উঠল, 'মায়ের কাছে যাব!'

জানালার দিকে এগিয়ে গেল গুনেজাঁ। উঁকি দিল বাইরে। পরক্ষণে পিছিয়ে এল কয়েক পা। বনের ধারে উর্দি পরা একজন সৈনিককে দেখতে পেয়েছে। লোকটা তাকিয়ে ছিল ওর দিকে। ভয় পেয়ে গেছে ও।

ভাইয়ের প্রতিক্রিয়া দেখে গোয়াঁইলা আর জর্জেত এগিয়ে এল। খানিক পরে তিনজনেই উঁকি দিল জানালা দিয়ে। এখনও আগের মত তাকিয়ে আছে সৈনিক, নড়েনি। ওদেরকে দেখতে পেয়ে হাত নাড়ল।

পিছিয়ে এল তিন ভাইবোন। জানালার কাছে গেল না আর। ব্যস্ত হয়ে পড়ল খেলায়।

একটু পরেই ঘরের কোনার জঞ্জাল থেকে ভাঙাচোরা একটা খেলনা গাড়ি বের করে আনল গোয়াঁইলা। ওটা আসলে গুভাঁর গাড়ি—ছোটবেলায় ওটা নিয়ে খেলত ও। গাড়িটা এবার নিঃসঙ্গ তিন শিশুর কাজে লাগল। জর্জেতকে ওটায় বসিয়ে ঠেলতে শুরু করল দুই ভাই।

অনেকক্ষণ খেলল ওরা। তারপর ক্লান্ত হয়ে পড়ল। খিদেও পেয়েছে। জানালার কার্নিশে বড় হয়ে উঠেছে একটা মালবেরির লতা। কার্নিশে জমে থাকা ধুলোমাটিতে উড়ে এসে পড়া বীজ থেকে জন্ম হয়েছে ওটার। লতার গায়ে ধরেছে থোকায় থোকায় ফল। তিন ভাইবোন ওটার দিকে এগিয়ে গেল। মালবেরি ছিঁড়ে খেতে শুরু করল ওরা। ফলের কালো রসে ওদের মুখগুলো ভূতের মত হয়ে উঠল, আর তা নিয়ে নিজেরাই হাসাহাসি করতে থাকল ওরা।

হঠাৎ কাঁটার খোঁচা খেলো জর্জেত। কেঁদে ফেলল সে। বলল, 'কামড়েছে... ও আমাকে কামড়েছে!'

'ওটা একটা জন্তু,' বলল গোয়াঁইলা। 'কামড়ায়।'

'জন্তু না,' ওদেরকে বলল গুনেজাঁ। 'ওটা আসলে কাঁটা।'

'কাঁটা!' শব্দটা শুনে যেন মজা পেল জর্জেত। হাসল খিল খিল করে।

মালবেরি খাওয়া হলে আবারও খেলায় মন দিল তিন ভাইবোন। শেলফ থেকে ঢাউস একটা বই নামিয়ে আনল গোয়াঁইলা। সেইন্ট বার্থোলোমিউ-র লেখা এক অমূল্য গ্রন্থ ওটা, কিন্তু সেটা তো আর সে জানে না। এতক্ষণ বইয়ের ছবি দেখেছে, এবার তার ভিতরে জাগল ধ্বংসের নেশা। বই খুলে প্রথম পাতাটাই একটানে ছিঁড়ে ফেলল সে। একজন যা করবে, বাকিদেরও তা করা চাই। ছুটে এসে গুনেজাঁ আর জর্জেতও বইয়ের পাতা ছিঁড়তে শুরু করল। মজা পেয়ে গেল কাজটাতে। অমূল্য বইটা আধঘণ্টার মধ্যেই ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলল তিনজনে। ছেঁড়া পাতাগুলো উড়িয়ে দিল খোলা জানালা দিয়ে।

দুপুরের দিকে বেড়ে গেল তাপমাত্রা। খেলতে খেলতে নেয়ে-ঘেমে ক্লান্ত হয়ে পড়ল বাচ্চারা। যে-যেখানে পারে শুয়ে

ঘুমিয়ে গেল।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল। বিকেল পাড়ি জমাল সন্ধ্যার দিকে। বাইরে শুরু হলো নীড়ে ফিরতে থাকা পাখিদের কলতান। সেই গান শুনতে শুনতে ঘুম আরও গভীর হতে থাকল বাচ্চাদের। এক স্তব্ধ প্রশান্তি বিরাজ করছে ওদের চারপাশে। পুরো বিশ্বচরাচর যেন নিবিড়ভাবে ঘিরে রেখেছে ঘুমন্ত তিন দেবশিশুকে।

একসময় দিগন্তে অস্ত যেতে শুরু করল সূর্য। আর তখুনি বনের দিক থেকে গর্জে উঠল একটা কামান। বজ্রনিনাদে কেঁপে উঠল চারপাশ। শোনা গেল চিৎকার।

'শেষ সুযোগ!'

'নিকুচি করি সুযোগের!' জবাব দেয়া হলো দুর্গের ছাত থেকে।

কামানের আওয়াজে ক্ষণিকের জন্য ঘুম ভাঙল জর্জেতের। মাথা তুলে ও বলল, 'বুম!'

আওয়াজ মিলিয়ে গেলে আবার চোখ মুদল ও। তলিয়ে গেল ঘুমের অতলে।

আঁধার নেমে এসেছে, তবু অক্লান্তভাবে হেঁটে চলেছে মিশেল ফ্লেশা। দিনভর হাঁটছে সে, বিশ্রাম নিচ্ছে না। গতকালও একইভাবে হেঁটেছে। এই দু'দিনে ও ততটুকুই খেয়েছে এবং ঘুমিয়েছে, বেঁচে থাকার জন্য যেটুকু না হলেই নয়।

ফুজের অরণ্যে গতকালই পৌঁছেছে মিশেল, এখন খুঁজে বেড়াচ্ছে লা তুয়োগ নামের দুর্গটা। গতকাল পর্যন্ত ওটা সম্পর্কে কিছুই জানত না ও, আজ সকালে একটা গ্রামে পৌঁছুনোর পর পেয়েছে বিস্তারিত তথ্য।

রাতটা একটা পরিত্যক্ত ভাঙাচোরা কুঁড়েতে কাটিয়েছিল ও। ভোরের আলো ফুটলে আবার হাঁটতে শুরু করে। ঘণ্টাখানেক চলার পরে ঢোকে ওই গ্রামটাতে। ওখানে পৌঁছেই দেখল, গাঁয়ের লোক রাস্তার ধারে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। ভিড়ের কারণও দেখতে পেল—গ্রামের উল্টো দিক থেকে পাহাড়ি পথ ধরে একটা ঘোড়ায় টানা ওয়াগন নেমে আসছে। ওটার পিছনে তেরপলে ঢেকে রাখা হয়েছে কী যেন। মূল্যবান বা গুরুত্বপূর্ণ নিঃসন্দেহে, কারণ ওয়াগনের সামনে-পিছনে রয়েছে দশজন করে অশ্বারোহী। সবার মাথায় টুপি—তাতে তিনরঙা ব্যাজ।

গ্রামের এক পাশ দিয়ে ঢুকে আরেক পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল অদ্ভুত এই কাফেলা। জটলার মাঝ থেকে একজন জিজ্ঞেস করল, 'কী নিয়ে গেল ওরা?'

একজন উত্তর দিল, 'গিলোটিন।'

'কোত্থেকে এনেছে? যাচ্ছেই বা কোথায়?'

'ফুজের থেকে এসেছে, যাচ্ছে পারিন্হি-তে।'

'যাক, এখানে তো থামেনি।'

গিলোটিনের কথা শুনেই কৌতূহলী হয়ে উঠল মিশেল। বুঝল, প্রজাতন্ত্রীদের অধিকৃত এলাকায় পৌঁছে গেছে। এখান থেকে কোনও না কোনও তথ্য পাওয়া যাবে। খোঁজাখুঁজি করে গ্রাম-প্রধানের বাড়ির সামনে গিয়ে হাজির হলো ও। ওখানেও জটলা করছে মানুষ। বাড়ির সামনে ইউনিফর্ম পরা কিছু সৈন্য দেখল, তাদের মধ্য থেকে একজন একটা বিজ্ঞপ্তি পড়ে শোনাচ্ছে সবাইকে। কী বলছে সে, জানার জন্য ভিড়ের ভিতরে ঢুকে পড়ল মিশেল।

'ফরাসি প্রজাতন্ত্র: এক ও অভিন্ন,' বলল ঘোষক। 'নাগরিক নিরাপত্তা পরিষদের পক্ষ থেকে সবার অবগতির জন্য জানানো

যাচ্ছে যে, জাতীয় কনভেনশনের প্রণীত নতুন আইন অনুসারে, যে-সব সশস্ত্র বিদ্রোহী প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, এবং পলাতক অবস্থায় লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, তাদেরকে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে গণ্য করা হবে। এসব রাষ্ট্রদ্রোহীকে কেউ যদি সাহায্য করে, তা হলে তাকে সর্বোচ্চ শাস্তি দেয়া হবে...'

'সর্বোচ্চ শাস্তিটা কী?' জানতে চাইল একজন।

'মৃত্যুদণ্ড,' বলল ঘোষক। তারপর ফিরে গেল ঘোষণায়। 'এবার আমি বিদ্রোহীদের নাম পড়ে শোনাব সবার অবগতির জন্য। প্রথমেই... মাহ্খি দু লঁতেনাক। এরপর রয়েছে গুঁজ লু ক্রুয়ো, ওরফে ব্রিসব্লু, বা লিমানুস; গ্রাঁ ফক্কেয়া...'

'উনি তো যাজক!'

'এখন বিদ্রোহী।' বলল ঘোষক। 'তারপর আছে বুয়েনোভুঁ, পিকানবুয়াঁ, উজাখ্, পানিয়ি, প্লেসনেত, গিনিয়াজু, শেতেনে, শাতোনিভেখ্, লেচেত...'

একে একে অনেকগুলো নাম পড়ল সে। সবশেষে যোগ করল, 'এরা সবাই প্রজাতন্ত্রের শত্রু। ধরা পড়ামাত্র এদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। যদি কেউ এদেরকে আশ্রয় দেয়, অথবা পালানোর কাজে সাহায্য করে... তা হলে তাকেও একই পরিণতি বরণ করতে হবে। এই বিজ্ঞপ্তি স্বাক্ষর করেছেন নাগরিক নিরাপত্তা পরিষদের প্রতিনিধি সিমুর্দা।'

'সিমুর্দা?' চাঞ্চল্য সৃষ্টি হলো ভিড়ের মাঝে। 'উনিও তো যাজক। পারিন্হি-র গির্জায় কাজ করতেন এক সময়।'

'গ্রাঁ ফক্কেয়ার মত,' বলল আরেকজন। 'পার্থক্য শুধু এই যে, একজন সাদা দলে, আর অন্যজন নীল দলে।'

'কিছু মনে করবেন না,' ভিড়ের ভিতর থেকে জিজ্ঞেস করল এক বৃদ্ধ। 'হঠাৎ এই বিজ্ঞপ্তি প্রচারের কারণ কী? বিদ্রোহীদের

ব্যাপারে কয়েক দফা বিজ্ঞপ্তি আমরা আগেও পেয়েছি। আজ একেবারে নাম-ধামসহ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করছেন... বিশেষ কিছু ঘটেছে?'

'হ্যাঁ,' বলল ঘোষক। 'উনিশজন বিদ্রোহীর নাম পড়ে শুনিয়েছি আমি। এরা সবাই এই মুহূর্তে লা তুয়োগ দুর্গে অবরুদ্ধ অবস্থায় আছে। ওদেরকে কেউ যেন সাহায্য না করে, সেটা নিশ্চিত করবার জন্য আলাদা বিজ্ঞপ্তি দেয়া হচ্ছে।'

'লা তুয়োগ?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মিশেল। 'ওটা একটা দুর্গ? কোথায়?'

একযোগে সবার দৃষ্টি ঘুরে গেল ওর দিকে। পরক্ষণে কুঁচকে গেল সবার ভুরু। আলুথালু বেশভূষায় পাগলিনীর মত দেখাচ্ছে ওকে।

'এ আবার কে?' বলে উঠল একজন। 'আমাদের গ্রামে আগে কোনোদিন দেখিনি তো!'

'বিদ্রোহীদের গুপ্তচর নয়তো?'

'আমি গুপ্তচর নই,' জোর গলায় বলল মিশেল। 'আমি শুধু লা তুয়োগের খবর জানতে চাই।'

পাশ থেকে এক কৃষাণি মেয়ে ওর জামা ধরে টান দিল। 'অ্যাই, এখানে এতকিছু বোলো না। লোকে সন্দেহ করবে।'

'কিন্তু আমি তো...'

'চুপ!' চাপা গলায় ধমকে ওকে থামিয়ে দিল কৃষাণি। এরপর অন্যদের উদ্দেশে সহজ সুরে বলল, 'একে নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু নেই। পাগলি একটা, দেখছেন না?'

মাথা ঝাঁকাল সবাই। আগ্রহ হারাল মিশেলের প্রতি। ঢাক বাজিয়ে ঘোষণার সমাপ্তি টানল ঘোষক। বিজ্ঞপ্তিটা প্ল্যাকার্ডে টাঙিয়ে চলে গেল ওখান থেকে। জটলা অবশ্য ভাঙল না।

প্ল্যাকার্ডের সামনে গিয়ে নানা ধরনের আলোচনায় মত্ত হয়ে পড়ল গ্রামবাসীরা।

'শুনলে? উনিশ জনকে অবরোধ করেছে, তা নিয়ে কত শোরগোল! অনেক বিদ্রোহী তো এখনও বনে-জঙ্গলে লুকিয়ে আছে, তাদের কী হবে?'

'ওদের নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু দেখছি না। লঁতেনাক হলো পালের গোদা... বিদ্রোহীদের আত্মা। ওকে খতম করা গেলে ভঁদির যুদ্ধও খতম হয়ে যাবে।'

'লোকটা কে?'

'ফঁতেনের ভাইকাউন্ট, একজন সেনিয়োখ্।'

'ওর হুকুমেই গুলি করা হয়েছিল আমাকে,' বলে উঠল মিশেল।

অবিশ্বাসের চোখে ওর দিকে তাকাল লোকজন। একজন বিরক্ত গলায় বলল, 'এই পাগলিটা আমাদের গাঁয়ে ঢুকল কী করে? কেউ ওকে তাড়াও তো।'

কৃষাণি মেয়েটা মিশেলের হাত ধরে টানল। 'চলে এসো, এরা তোমার কথা শুনবে না। বরং এখানে থাকলে বিপদে পড়বে তুমি।'

'কেন?' বিস্মিত গলায় বলল মিশেল। 'আমি তো কোনও অন্যায় করিনি। আমি শুধু আমার সন্তানদের খুঁজে পেতে চাইছি।'

'আমি তোমাকে সাহায্য করব। এসো।'

মিশেলকে ওখান থেকে সরিয়ে আনল মেয়েটা। একটা গাছের তলায় নিয়ে গিয়ে বসালো। বলল, 'খুব ক্ষুধার্ত মনে হচ্ছে তোমাকে। এটা খাও।' নিজের ঝোলা থেকে এক টুকরো রুটি বের করে দিল সে।

বুভুক্ষের মত রুটিটা খেলো মিশেল। খাওয়া শেষে জানতে চাইল, 'লা তুয়োগ দুর্গটা কোন্ দিকে? ওখানে যেতে হবে আমাকে। পথটা দেখিয়ে দাও।'

'অসম্ভব!' মাথা নাড়ল কৃষাণি। 'তুমি কি মরতে চাও? দেখে তো মনে হচ্ছে মাথার ঠিক নেই তোমার। ক্লান্তও দেখাচ্ছে খুব। আমার বাড়িতে চলো, বিশ্রাম নেবে।'

'আমি বিশ্রাম নিতে পারব না,' বলল মিশেল। 'আমাকে এখুনি আবার পথে নামতে হবে।'

'তোমার পা-দুটোর অবস্থা খুব খারাপ। এমন ক্ষত-বিক্ষত পা নিয়ে হাঁটা উচিত হবে না।'

'আমি নিরুপায়। ওরা আমার বাচ্চাদের চুরি করে নিয়ে গেছে। লু তুয়োগে আটকে রেখেছে ওদের। একটা মেয়ে আর দুটো ছেলে। বিশ্বাস না হলে উপকূলে খোঁজ নাও। তেলমাখ্শ নামে এক ভিখিরি, আর রাদু নামে এক সার্জেন্ট আমার হয়ে সাক্ষ্য দেবে।'

'জিভের লাগাম টানো, মেয়ে। দিনকাল খারাপ, যেখানে-সেখানে যার-তার নাম বলতে নেই। বিপদে পড়তে পারো।'

'বিপদের পরোয়া করি না আমি। যেভাবেই হোক, আমার বাচ্চাদের উদ্ধার করতে চাই। পায়ে পড়ি, আমাকে লা তুয়োগের পথটা দেখিয়ে দাও।'

'সত্যি বলতে কী... আমি চিনি না জায়গাটা। চিনলেও তোমাকে বলতাম না। দুর্গে ভীষণ যুদ্ধ চলছে বলে শুনেছি। ওখানে যাওয়া নিরাপদ নয়।'

'যেতে আমাকে হবেই,' গোঁয়ারের মত বলল মিশেল। 'তুমি আমাকে সাহায্য করো, বা না-ই করো।' রাগী ভঙ্গিতে উঠে

দাঁড়াল ও।

'দাঁড়াও,' বলল কৃষাণি। 'তোমাকে সাহায্য করব বলেছিলাম... কিছুটা হলেও করব। এই রুটিটা নাও।' ঝোলা থেকে আরেকটা রুটি বের করে দিল সে। 'পথে কাজে লাগবে।'

'ধন্যবাদ,' বলল মিশেল। রুটি নিয়ে হাঁটতে শুরু করল হনহন করে।

গাঁয়ের শেষ প্রান্তে পৌঁছুতেই গরীব তিনটা বাচ্চার দেখা পেল ও। দুটো ছেলে আর একটা মেয়ে, গায়ে শতচ্ছিন্ন পোশাক... তাকিয়ে আছে ওর হাতের রুটিটার দিকে। বুকটা হু হু করে উঠল মিশেলের। রুটিটা ওদেরকে দিয়ে দিল। তারপর চোখ মুছে পা বাড়াল বনের দিকে।

আঠারো

ঠিক সেসময়, জঙ্গলের গভীরে, জ্যাভ্‌নে থেকে পারিন্‌হি যাওয়ার রাস্তায় ঘটছে আরেক ঘটনা।

পথটা আঁকাবাঁকা, দু'পাশে গাছপালার দুর্ভেদ্য প্রাচীর। রাস্তাটা যেখানে কুয়েনু নদীর সেতু পেরিয়ে জঙ্গলে ঢুকেছে, সেখানেই ঝোপঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে আছে একদল লোক। স্থানীয় কৃষক এরা, পরনে ভেড়ার চামড়ার জ্যাকেট। সবাই সশস্ত্র—কারও হাতে বন্দুক, আবার কারও হাতে কাস্তে-ছোরা বা

কুড়াল। বন্দি বিদ্রোহীদের মৃত্যুদণ্ড দেবার জন্য এ-পথে একটা গিলোটিন নিয়ে যাওয়া হবে বলে খবর পেয়েছে ওরা, সেটাকে ঠেকবার জন্যই অপেক্ষা করছে ওরা।

'ঠিক খবর এনেছ তো?' হঠাৎ চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল একজন।

'হ্যাঁ,' বলল আরেকজন। 'গ্রাম থেকে তো তা-ই বলল।'

'গাড়িটা এ-পথেই যাবে তো?'

'এটাই সবচেয়ে সহজ রাস্তা।'

'তা হলে যেতে দেব না ওটাকে।'

'তা তো বটেই। পুড়িয়ে দেব।'

'আমরা তিন গ্রামের লোক একত্র হয়েছি সেজন্যে।'

'পাহারাদারদের ব্যাপারে কী করব?'

'ওদেরকেও মারা হবে।'

'গাড়িটা ভিত্‌রি থেকে আসছে বলে শুনেছি।'

'অনেকে আবার বলছে ফুজের থেকে।'

'যেখান থেকেই আসুক, ওটা শত্রুপক্ষীয়।'

'পারিন্‌হিতে যাবে।'

'কোথাও যাবে না। এখানেই শেষ হবে ওটার যাত্রা।'

'ঠিক।'

ভোরের আলো ইতোমধ্যে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। হঠাৎ দূর থেকে ভেসে এল চাকার আওয়াজ আর ঘোড়ার খুরের খটখটানি। বাঁক ঘুরে একটু পর বেরিয়ে এল গাড়িটা। একটা ওয়াগন, ওতে তেরপলে ঢেকে কী যেন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সামনে-পিছনে সশস্ত্র অশ্বারোহী পাহারাদার।

'ক'জন আছে ওখানে?' বিদ্রোহীদের দলনেতা জানতে চাইল।

'বারোজন,' সামনে থেকে জবাব দিল একজন।

'তবে যে শুনেছিলাম বিশজন আসছে?' বলল আরেকজন।

'আমাদের গুপ্তচর হয়তো হিসাবে ভুল করেছে। তবে বারো বা বিশ যা-ই হোক না কেন, রেহাই দেব না ওদের,' বলল দলনেতা। 'তৈরি হও সবাই।'

খানিক পরেই হামলাকারীদের কাছাকাছি চলে এল ওয়াগন। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করল দলনেতা, 'ফায়ার!'

একসঙ্গে গর্জে উঠল বিদ্রোহীদের সবক'টা বন্দুক। বজ্রপাতের মত আওয়াজে প্রকম্পিত হলো চারদিক। হুড়মুড় করে ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিটকে পড়ল সাতজন পাহারাদার। বাকিরা লাফ দিয়ে নামল মাটিতে। হৈ হৈ করে বন-বাদাড় থেকে বেরিয়ে এল আগ্রাসী বিদ্রোহীরা। তাদেরকে দেখেই সাহস হারাল বেঁচে যাওয়া পাঁচ পাহারাদার। উল্টো ঘুরে পড়িমরি করে ছুটল। ঢুকে পড়ল জঙ্গলের ভিতরে।

ওয়াগনের দিকে এগিয়ে গেল বিদ্রোহীরা। দুটো ঘোড়া আহত, চালক মারা গেছে। পিছনে গিয়ে তেরপল সরাল বিদ্রোহীদের দলনেতা। ভুরু কুঁচকে গেল তার। গিলোটিন দেখবে বলে ভেবেছিল, কিন্তু তা নয়। কাঠের একটা মই দেখা যাচ্ছে ওয়াগনের পিছনে।

তার সহকারী পাশে এসে দাঁড়াল। বিস্মিত গলায় বলল, 'মই? মইয়ের জন্য এত পাহারা? কোথায় নিচ্ছিল এই মই?'

'নিশ্চয়ই লা তুয়োগ দুর্গে,' অনুমান করল দলনেতা। 'দুর্গ আক্রমণের সময় মইয়ের প্রয়োজন হয়।'

'আমরা এখন কী করব এটা নিয়ে?'

'পুড়িয়ে দাও।'

এভাবেই... স্রেফ ঘটনাক্রমে ধ্বংস হয়ে গেল গুভাঁর

আদেশে বানানো মইটা। আর যে-গিলোটিনকে ধ্বংস করবার জন্য ফাঁদ পেতেছিল বিদ্রোহীরা... যেটাকে মিশেল ফ্লেশা গ্রামের ভিতর দিয়ে চলে যেতে দেখেছে... সেটা অন্য এক পথে তখন নিরাপদেই এগিয়ে চলেছে গন্তব্যের দিকে।

উনিশ

বনের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে মিশেল। পথ দেখাবার কেউ নেই, নিজের চেষ্টাতেই লা তুয়োগ দুর্গ খুঁজে বের করবে বলে ঠিক করেছে ও। এমনিতে যথেষ্ট ক্লান্ত এবং দুর্বল মেয়েটা, স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে এ-অবস্থায় পথচলা সম্ভব নয় কারও পক্ষে, কিন্তু হারানো সন্তানদের উদ্ধারের দৃঢ়প্রতিজ্ঞাই শক্তি জোগাচ্ছে ওকে।

সারাদিন হাঁটার পর সন্ধ্যার দিকে তীব্র হতাশায় আক্রান্ত হলো ও। গাছপালা আর ঘন ঝোপঝাড় ছাড়া কিছুই দেখেনি দিনভর, চোখে পড়েনি কোনও গ্রাম বা জনপদ। উদ্যম হারাবার সঙ্গে সঙ্গে দেহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্লান্তি, শরীরের সব শক্তি হারাল ও। মনে হলো আজই ওর জীবনের শেষ দিন। এই ঘন, অচেনা অরণ্যেই চিরশয্যা নিতে হবে ওকে। তারপরেও স্রেফ জেদের বশে পা টেনে টেনে কোনোমতে এগিয়ে চলল মেয়েটা। মরতে যদি হয়, চলতে চলতেই মরবে।

সন্ধ্যা নেমে এসেছে, বনভূমির ভিতরটা ঢাকা পড়ে গেছে গাঢ় ছায়ায়। অন্ধকারে সামনের কিছুই ঠিকমত দৃষ্টিগোচর হয় না। আর পারল না মিশেল, শরীর বিদ্রোহ করে বসল। একটা গাছের গোড়ায় বসে হাঁপাতে থাকল ও। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে ধাতস্থ হলো। তারপর নজর বোলাল চারদিকে।

অন্ধকারে অভ্যস্ত হয়ে এসেছে চোখ। গাছপালার ফাঁক দিয়ে কী যেন দেখা যাচ্ছে। টলতে টলতে ওদিকে এগোল মিশেল। একটু পরেই টের পেল, জঙ্গলের প্রান্তদেশে পৌঁছে গেছে, ওপাশে শুরু হয়েছে বিশাল এক উপত্যকা। উপত্যকার মাঝ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে একটা খরস্রোতা নদী। সেদিকে এগিয়ে গেল ও। নদীর কিনারে পৌঁছে হাঁটু গেড়ে বসল। আঁজলা ভরে খেলো পানি।

নদীর অন্যপাশে পাহাড়ি ঢাল, একটা মালভূমির দিকে উঠে গেছে ওটা। কী আছে ওখানে? কৌতূহল অনুভব করল মিশেল। পানি খেয়ে কিছুটা শক্তি ফিরে পেয়েছে, নদী পার হয়ে ঢালে উঠল ও, পাথরে হাত-পা বাধিয়ে উঠতে শুরু করল উপরে। বেশ কিছুটা সময় কসরত করবার পর মালভূমিতে উঠে আসতে সক্ষম হলো।

শরীর আর চলতে চাইছে না। উপরে পৌঁছেই হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল ও। গায়ের কাঁপুনি না থামা পর্যন্ত থাকল ওভাবেই। তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল।

থমকে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

দিগন্তের কাছে, আকাশের পটভূমিতে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল এক দুর্গ। গুম গুম করে দূরাগত বজ্রপাতের মত আওয়াজ ভেসে আসছে ওদিক থেকে।

লা তুয়োগ!

দুর্গটার খোঁজ পেয়ে গেছে ও!

ক্লান্তি আর দুর্বলতা ভুলে গেল মিশেল। নব উদ্যম নিয়ে দ্রুত পায়ে ওদিকে এগোতে শুরু করল ও।

অবশেষে এসে গেছে সেই পরম-প্রতীক্ষিত, পরম-কাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত। নিষ্ঠুর ধরা পড়েছে নির্মমের হাতে। লঁতেনাককে হাতের মুঠোয় পেয়েছে সিমুর্দা।

আটকা পড়ে গেছে বৃদ্ধ মাহ্খি, পালাতে পারেনি। আর আটকা পড়েছে ঠিক সেই জায়গায়, যেখানে সিমুর্দা তাকে আটকাতে চেয়েছিল। দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য লঁতেনাককে তার নিজের এলাকাতেই পরাস্ত করতে চেয়েছিল সে, চেয়েছিল লা তুয়োগ দুর্গের সামনে শাস্তি দিতে—বাস্তবে তা-ই ঘটতে চলেছে। এ-জন্যে ফুজের থেকে বিশেষ নির্দেশে একটা গিলোটিন আনাচ্ছে সিমুর্দা।

আত্মতৃপ্তিতে ভরে উঠেছে তার হৃদয়। লঁতেনাকের মৃত্যু মানে ভঁদির যুদ্ধের মৃত্যু... ফ্রান্সের নবজীবন। বুড়ো জেনারেলকে হত্যা করবার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা কুণ্ঠা নেই তার। বিবেক আর যুক্তি... দুটোই তার এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করছে। অপেক্ষা শুধু সময়ের। চূড়ান্ত এই বিজয় অর্জনের জন্য যথেষ্ট হিংস্র হতে হয়েছে সিমুর্দাকে, নিতে হয়েছে বহু প্রাণ, হাত রঞ্জিত করতে হয়েছে বহু মানুষের রক্তে। কিন্তু তার জন্য কোনও অনুশোচনা নেই তার মনে। কর্তব্যের খাতিরে ওসব করেছে সে। সবচেয়ে বড় কথা, তার নিষ্ঠুর রণকৌশলের কারণেই শেষ পর্যন্ত রক্ষা পাচ্ছে প্রজাতন্ত্র।

তবে এতকিছুর পরেও একটা ব্যাপারে দুশ্চিন্তা না করে পারছে না সিমুর্দা। কোণঠাসা হলেও এখনও পরাস্ত হয়নি

লঁতেনাক, তার জন্য হামলা করতে হবে লা তুয়োগ দুর্গে। ভয়ঙ্কর লড়াই হবে, আর সেটা পরিচালনা করবে গুভাঁ। লড়াইয়ে সরাসরি অংশ নেয়া তার স্বভাব। যদি কিছু হয়ে যায় ওর? কথাটা ভাবলেই বুক শুকিয়ে আসছে সিমুর্দার। গুভাঁকে নিজের সন্তান বলে ভাবে সে, সেই সন্তানের অমঙ্গল আশঙ্কায় কাঁপছে তার হৃদয়। গুভাঁর মৃত্যু চায় না সে।

কামান দাগার মধ্য দিয়ে ইতোমধ্যে আক্রমণের ঘোষণা দেয়া হয়ে গেছে। খুব শীঘ্রি শুরু হবে চূড়ান্ত হামলা। ব্যাপারটা স্রেফ কপাল বলতে হবে... সতর্কবাণী হিসেবে ছোঁড়া কামানের গোলাটার আঘাতে দুর্গের নীচতলার দেয়ালে একটা ফাটল দেখা দিয়েছে—সেটা মেরামতের সুযোগ নেই অবরুদ্ধ বিদ্রোহীদের। ওদের অবস্থা সত্যিই করুণ। যথেষ্ট পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র আছে ওদের, কিন্তু গোলাবারুদ নেই। অ্যামিউনিশনের স্বল্পতার কারণে একেকজন বড়জোর ত্রিশটা গুলি ছুঁড়তে পারবে, তার বেশি নয়। একটাই প্রার্থনা এখন তাদের মনে— গোলাগুলি যেন বেশিক্ষণ না হয়। শত্রুরা যেন তাড়াতাড়ি সম্মুখসমরে নামে, তা হলে বন্দুক-পিস্তলের বদলে ছুরি-তলোয়ার নিয়ে হাতাহাতি লড়াই করা যাবে।

দুর্গ অবশ্য এখনও দুর্ভেদ্য। একতলার হলঘরের বাইরের দিকে একটা বাড়তি পাঁচিল তুলে দুর্গের মূল অংশকে সুরক্ষিত করে তোলা হয়েছে। হলঘরের মাঝখানে জড়ো করে রাখা হয়েছে সব অস্ত্র, লড়াইয়ের সময় যেন যোদ্ধারা তাদের পছন্দসই অস্ত্র তুলে নিতে পারে। দোতলায় ঠিক একই মাপের আরেকটা হলঘর আছে, প্যাঁচানো লোহার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়... ওখানেও একইভাবে রাখা হয়েছে আরও বেশ কিছু অস্ত্র।

প্যাঁচানো সিঁড়িটা দিয়ে তিনতলাতেও ওঠা যায়। ওখানে

রয়েছে আয়নাঘর—চারদিকে কাঁচ লাগানো বিশেষ একটি কক্ষ, দুর্গের লোকজনের আশ্রয় নেবার জন্য। সেতু থেকে গন্ধক-মাখানো দড়ির এক প্রান্ত এই ঘরের ভিতরে এনে রেখেছে গুঁজ লু ক্রুয়োঁ, যাতে এখান থেকেই আগুন ধরানো যায় ওখানে। কামরার মাঝখানে টেবিল পেতে তাতে নানা ধরনের খাবার আর পানীয় রাখা হয়েছে, লড়াইয়ের ফাঁকে যোদ্ধারা এসে খাওয়াদাওয়া করে যেতে পারবে।

কামানের গর্জন শুনেই লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে অবরুদ্ধরা, আর মাত্র আধঘণ্টা পরে শুরু হবে হামলা। দুর্গের ছাতে উঠে গেছে গুঁজ লু ক্রুয়োঁ, চারদিকটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে, বোঝার চেষ্টা করছে কোন্ কোন্ দিক দিয়ে দুর্গে ঢোকার চেষ্টা করবে শত্রুরা। লঁতেনাক এরই মধ্যে হুকুম দিয়েছেন, অবরোধকারীরা এগিয়ে না আসা পর্যন্ত কেউ যেন গুলি না ছোঁড়ে। ওরা সংখ্যায় চার হাজার, বাইরে ওদের উপর গুলি ছুঁড়ে সুবিধে করা যাবে না। বরং ওদেরকে দুর্গে ঢুকিয়ে, নাগালের ভিতরে এনে গুলি করলে সাফল্যের সম্ভাবনা বেশি। আপাতত গুঁজ লু ক্রুয়োঁকে বলে দিয়েছেন, হামলা শুরু হলে যেন ছাত থেকে শিঙা বাজিয়ে ভিতরের সবাইকে সতর্ক করে দেয়।

নীচতলায় বাকিদের একত্র করেছেন লঁতেনাক। হলঘরের বিভিন্ন জায়গায় আর সিঁড়িতে অবস্থান নিয়েছে তারা। দুর্গের অভ্যন্তর এক অর্থে হামলাকারীদের জন্য মৃত্যুফাঁদ। এক সঙ্গে বেশি লোক ঢুকতে পারবে না সেখানে। হলঘরের প্রবেশপথ আর সিঁড়িটা বেশ সংকীর্ণ, ওখানে যারাই ঢুকবে তারাই শিকার হবে রাজতন্ত্রী বন্দুকধারীদের।

অন্যদিকে গুভাঁও আক্রমণের জন্য তৈরি হচ্ছে। শেষ মুহূর্তের প্রয়োজনীয় আদেশ-নির্দেশ দিচ্ছে সৈন্যদের। সিমুর্দার

কাছে খবর পাঠাল, মালভূমির দিকটা যেন ভালভাবে পাহারা দেয়া হয়। গিশঁমকে নির্দেশ দিল, বনের দিকে মূল সেনাদল নিয়ে পুরোপুরি তৈরি থাকার জন্য। কেউ পালাতে চাইলে তাকে গুলি করা যাবে না, চেষ্টা করতে হবে জীবন্ত আটকাবার। এরপর নিজের সঙ্গে একদল সৈন্য নিয়ে হামলা শুরুর ক্ষণ গুনতে শুরু করল।

অস্তগামী সূর্যের লালচে আলোয় রঙ লেগেছে প্রকৃতিতে। লা তুয়োগ দুর্গকে দেখাচ্ছে সেই লাল সাগরে ভাসমান একটা জাহাজের মত। আপন চিন্তায় হারিয়ে গেল গুভাঁ। আজকের যুদ্ধ তার জন্য ব্যতিক্রমী এক যুদ্ধ। এতদিন খোলা ময়দানে যুদ্ধ করেছে ও। আজ করতে হবে দুর্গের চার দেয়ালের ভিতরে, বদ্ধ জায়গায়। সেই জায়গা, যেখানে ও জন্মগ্রহণ করেছে। যেখানে কেটেছে ওর শৈশব আর কৈশোর।

চোখে দূরবীন লাগিয়ে চারপাশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল গিশঁম। হঠাৎ পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'যাক, তা হলে এল অবশেষে!'

ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল গুভাঁ। 'কীসের কথা বলছ?'

'মই, ক্যাপ্টেন। আমাদের মইটা আসছে।'

'সে কী! মইটা আগেই আসেনি?'

'জী না। আমার দূত ফিরে এসে জানিয়েছিল, জ্যাভ্নের কাঠের দোকানে প্রয়োজনীয় মাপের একটা মই পাওয়া গেছে, বারোজন প্রহরী আর একটা ওয়াগন-সহ ওটা রাতেই রওনা করিয়ে দেয়া হয়েছে। সকালে পৌঁছুনোর কথা ছিল, কিন্তু পৌঁছায়নি। আমি একটু দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম।'

'এখন আসছে বুঝলে কী করে?'

'ওই যে, দূরবীনে দেখা যাচ্ছে, পাহাড়ি পথ ধরে এদিকে

নেমে আসছে একটা ওয়াগন। সঙ্গে সশস্ত্র প্রহরী। মইটাই আনছে ওরা, কোনও সন্দেহ নেই।'

'দেখাও আমাকে,' দূরবীন নিয়ে পাহাড়ের দিকে তাকাল গুভাঁ। হ্যাঁ, সত্যিই দেখা যাচ্ছে ওয়াগনটা। 'যা বললে, প্রহরীর সংখ্যা তো তার চেয়ে বেশি। ব্যাপার কী?'

'পথে হয়তো বাড়তি লোক জোগাড় করেছে।'

'হুম। মই এসে গেলে আর অপেক্ষার দরকার কী? আক্রমণ শুরু করা যাক।'

'আরেকটু অপেক্ষা করুন, ক্যাপ্টেন। ওরা পনেরো মিনিটের ভিতরে পৌঁছে যাবে।'

'বেশ,' শ্রাগ করল গুভাঁ।

ভুল করছে তরুণ ক্যাপ্টেন ও তার সহকারী। ওরা জানে না, আসলে ওটা মইয়ের ওয়াগন নয়, গিলোটিনের ওয়াগন।

পিছনে পায়ের শব্দ শুনে ঘুরে দাঁড়াল গুভাঁ। বিষণ্ন চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সার্জেন্ট রাদু।

'কী ব্যাপার, সার্জেন্ট?'

'বুলে হুজের সৈন্যদের পক্ষ থেকে একটা আর্জি নিয়ে এসেছি, ক্যাপ্টেন।'

'কী আর্জি?'

'আপনি আমাদেরকে সম্মানের সঙ্গে মরবার সুযোগ দিন।'

'মানে?'

'আজকের অভিযানে পিছনদিকে রাখা হয়েছে আমাদের। এটা আমাদের জন্য অপমানজনক। দোউলে আমরা নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছি, তাও কি আপনি আমাদের উপর ভরসা করতে পারছেন না?'

'ব্যাপারটা তা নয়। তোমরা মাত্র বারোজন, তাই

তোমাদেরকে রিজার্ভ হিসেবে রাখা হয়েছে।'

'কিন্তু আমরা প্রথম সারিতে থাকতে চাই, ক্যাপ্টেন।'

'আমি চাই তোমরা পিছনে থাকো। যুদ্ধের শেষদিকে দরকার পড়তে পারে তোমাদের।'

'আমরা সেটা চাই না।'

'কী মুশকিল, এভাবে জেদ ধরছ কেন? এমন তো নয় যে বাহিনী থেকেই বাদ দেয়া হয়েছে তোমাদের।'

'বাদ দেয়ার মতই অবস্থা, ক্যাপ্টেন। বুলে হুজের সৈন্যরা সারাজীবন যুদ্ধের সামনের সারিতে থেকেছে। আমাদেরকে পিছনে পাঠানো মানে যুদ্ধ করতে না দেয়া।'

'আচ্ছা, আমি ভেবে দেখব কী করা যায়।'

'এখুনি ভাবুন, ক্যাপ্টেন,' জোর গলায় বলল রাদু। 'এই যুদ্ধ সাধারণ যুদ্ধ নয়। আমাদের ব্যাটালিয়নকে যে-লোক ধ্বংস করে দিয়েছে, এটা তাকে ধ্বংস করবার যুদ্ধ। চূড়ান্ত যুদ্ধ! এতে অংশ নেয়া আমাদের দায়িত্ব! তা ছাড়া ওই দুর্গে বন্দি বাচ্চারা আমাদের সন্তান! আমরা ওদের পিতৃত্বের ভার নিয়েছিলাম। ওদের উদ্ধার করাটাও আমাদেরই কর্তব্য। আজ সকালে লাইব্রেরির জানালায় ওদের মুখ দেখেছি আমি। এখন আর কিছুই দমাতে পারবে না আমাকে বা আমার সৈন্যদের। প্রাণ দিয়ে হলেও ওদেরকে ওখান থেকে নামিয়ে আনব আমরা।'

'এভাবে ব্যাপারটা ভেবে দেখিনি আমি,' রাদুর কাঁধে হাত রাখল গুভাঁ। 'তোমাদের আবেগ আর সাহস দেখে আমি মুগ্ধ, সার্জেন্ট। ঠিক আছে, মূল অভিযানেই থাকবে তোমরা। দু'ভাগ হয়ে প্রথম আর দ্বিতীয় সারিতে অংশ নেবে বুলে হুজের সৈন্যরা।'

'আমি কি ওই বারোজনেরই নেতৃত্ব দেব?'

'নিশ্চয়ই।'

'ধন্যবাদ, ক্যাপ্টেন।'

সামরিক কায়দায় সালাম ঠুকে বিদায় নিল রাদু।

কথা বলবার জন্য গিশঁমকে কাছে ডাকল গুভাঁ, কিন্তু ও মুখ খোলার আগেই তীক্ষ্ণ সুরে বেজে উঠল শিঙা।

বিশ

চমকে উঠে শব্দের উৎসের দিকে ঘুরল গুভাঁ আর গিশঁম। যা দেখল, তাতে অবাক না হয়ে পারল না।

ওদের শিবিরেই বেজে উঠেছে শিঙাটা, আর সেটা বাজানোর আদেশ দিয়েছে সিমুর্দা। অবরুদ্ধ শত্রুপক্ষের সঙ্গে কথা বলতে চাইছে সে। খানিক পরে দুর্গের ছাত থেকে পাল্টা শিঙা বাজিয়ে সম্মতি জানানো হলো। হাতে একটা সাদা রুমাল নিয়ে দুর্গের দিকে এগোতে শুরু করল সিমুর্দা।

'মানে কী এর?' বিস্মিত গলায় বলে উঠল গিশঁম। 'কী করতে চাইছেন উনি?'

'জানি না,' চিন্তিত গলায় বলল গুভাঁ। 'দেখাই যাক।'

দুর্গ-প্রাচীরের কাছাকাছি গিয়ে থামল সিমুর্দা। গলা চড়িয়ে বলল, 'ভিতরের লোকদের উদ্দেশে বলছি... আমাকে চিনতে পারছ?'

‘হ্যাঁ,’ দুর্গের ছাত থেকে জবাব দিল গুঁজ লু ব্রুয়োঁ।

‘আমি প্রজাতন্ত্রী সরকারের প্রতিনিধি।’

‘তুমি পারিন্হি-র গির্জার প্রাক্তন অধ্যক্ষ।’

‘আমি নাগরিক নিরাপত্তা পরিষদের দূত।’

‘তুমি একজন যাজক।’

‘আমি আইনসভার প্রতিনিধি।’

‘তুমি দল ও ধর্মত্যাগী।’

‘আমি বিপ্লবের কণ্ঠস্বর।’

‘তুমি দেশদ্রোহী।’

‘আমি সিমুর্দা!’

‘না, তুমি শয়তান!’

‘আমাকে চেনো তোমরা?’

‘শুধু চেনা? আমরা তোমাকে ঘৃণা করি।’

‘আমাকে হাতের মুঠোয় পেলে খুশি হবে নিশ্চয়ই?’

‘এখানে উপস্থিত প্রত্যেকে নিজের কল্লা দেবে তোমাকে হাতে পাবার বিনিময়ে।’

‘তার কোনও প্রয়োজন নেই। আমি স্বেচ্ছায় ধরা দিতে চাই।’

ছাত থেকে উচ্চকণ্ঠে হাসি ভেসে এল। ‘তা হলে চলে এসো!’

হতভম্ব হয়ে সিমুর্দার কথা শুনছে প্রজাতন্ত্রী শিবিরের লোকেরা। গিশঁম বলল, ‘ওঁর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? কী সব আবোল-তাবোল বকছেন!’

‘চুপ!’ চাপা গলায় বলল গুভাঁ। ‘আগে শোনোই না ওঁর কথা!’

‘এক শর্তে ধরা দিতে পারি আমি,’ চেঁচিয়ে বলল সিমুর্দা।

‘শুনতে চাও সেই শর্ত?’

জবাব না দিয়ে গুঁজ লু ক্রুয়োঁ বলল, ‘হঠাৎ ধরা দেবার খায়েশ হলো কেন, জানতে পারি?’

‘কারণ অহেতুক রক্তপাত পছন্দ নয় আমার। আদর্শগত মতপার্থক্য থাকলেও তোমরা আমাদের ভাই... একই মাতৃভূমি আমাদের। তোমাদেরকে আমি ভালবাসি।’

‘চমৎকার বলেছ, শয়তান! ভাই-ই বটে তুমি... কেইনের মত ভাই। আবেলের পিঠে যে ছুরি মেরেছিল!’

‘আমাকে অপমান করো যত খুশি,’ বলল সিমুর্দা। ‘কিন্তু আমার কথাগুলো শোনো। সন্ধির পতাকা নিয়ে আবেদন জানাচ্ছি তোমাদের কাছে। হ্যাঁ, সত্যিই আমরা ভাই... একই দেশমাতার সন্তান। তোমরা অসহায়, অবরুদ্ধ কিছু মানুষ... আমি তোমাদের বন্ধু হিসেবে সাহায্য করতে চাই। আজ তোমরা অন্ধ, অজ্ঞ; প্রার্থনা করি ঈশ্বর যাতে এই অন্ধত্ব আর অজ্ঞতা দূর করে দেন। সেটা যতক্ষণ না হচ্ছে, ততক্ষণ চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া আমার কর্তব্য। তাই আত্মদান করতে চাইছি... বন্ধুত্বের হাত বাড়াতে চাইছি তোমাদের দিকে। আমার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যদি তোমরা রক্ষা পাও, ক্ষতি কী? আমি এ-দেশের একজন নাগরিক, সেইসঙ্গে একজন যাজকও বটে। নাগরিক হিসেবে এতদিন যুদ্ধ করেছি, আর যাজক হিসেবে এখন এসেছি আবেদন জানাতে। আমার কথা শোনো। তোমাদের অনেকেরই স্ত্রী-সন্তান আছে। অন্তত ওদের কথা ভেবে সাড়া দাও আমার প্রস্তাবে।’

গুঁজ লু ক্রুয়োঁ ঠাট্টার সুরে বলল, ‘কান খোলা আছে আমাদের। যা খুশি বলতে পারো। তবে আমাদের কাছ থেকে সাড়া পাবার আশা কোরো না।’

‘মাথা গরম না করে ঠাণ্ডা মাথায় পরিস্থিতিটা বিচার করে

দেখো,' বলল সিমুর্দা। 'একটু পরেই হামলা হবে দুর্গে। চলবে গুলি, চলবে তলোয়ার, প্রাণ হারাবে মানুষ—দু'পক্ষেই! আমাদের অনেকেই আগামীকালের সূর্যোদয় দেখবে না। কিন্তু কেন এই রক্তপাত? কেন অকারণে শত-সহস্র লোকের জীবন বিসর্জন দেব আমরা, যখন মাত্র দু'জন মানুষের মৃত্যুতেই সমস্ত সংঘাতের অবসান ঘটানো যায়?'

'দু'জন মানুষ মানে? দু'জন মরলে যুদ্ধ শেষ হবে?'

'অবশ্যই!'

'তারা কারা?'

'আমি এবং লঁতেনাক,' শান্তকণ্ঠে জানাল সিমুর্দা। 'এ-ব্যাপারেই প্রস্তাব নিয়ে এসেছি আমি। তোমাদের পক্ষ থেকে লঁতেনাককে আমাদের হাতে তুলে দাও, আমিও স্বেচ্ছায় ধরা দেব তোমাদের হাতে। লঁতেনাককে গিলোটিনে চড়ানো হবে, আর তোমরাও আমাকে নিয়ে যা খুশি করতে পারবে।'

'শোনো যাজক,' থমথমে গলায় বলল গুঁজ লু ব্রুয়োঁ। 'হাতে পেলে তোমাকে আমরা অল্প আঁচে রোস্ট বানাব।'

'আমার তাতে আপত্তি নেই। যুদ্ধটা শেষ হলেই আমি খুশি।'

'তোমাকে হত্যা করলে যুদ্ধ শেষ হবে? বিশ্বাস করি না। তোমার লোকেরা বরং খেপে গিয়ে নতুন উদ্যমে হামলা করবে আমাদের উপর।'

'করবে না। আমি কথা দিতে পারি। নাগরিক নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য আমি। অসীম আমার ক্ষমতা। ধরা দেবার আগে লিখিত নির্দেশ দিয়ে যাব, লঁতেনাককে হস্তান্তর করলেই যাতে মুক্তি দেয়া হয় তোমাদের। কেউ সে-আদেশ অমান্য করবার সাহস পাবে না। ভাল করে ভেবে দেখো, আমি কিন্তু চমৎকার একটা সুযোগ দিচ্ছি তোমাদের। মেনে নিলে

দু'পক্ষেরই লাভ।'

'তুমি শুধু শয়তান নও, পাগলও,' রাগী গলায় বলল গুঁজ লু ক্রুয়োঁ। 'কেন বিরক্ত করছ আমাদের? কে আসতে বলেছে তোমাকে? ধৃষ্টতা দেখে অবাক হতে হয়—সেনিয়োখ্‌কে সমর্পণ করব তোমাদের হাতে... আমাদের কি মাথা খারাপ হয়েছে?'

'এর মধ্যে পাগলামির কিছু নেই,' বলল সিমুর্দা। 'লঁতেনাকের বিনিময়ে আমাকে তো পাচ্ছ!'

'কচু পাচ্ছি! আমাদের মাহ্‌খির নখেরও যোগ্য নও তুমি। তাঁকে হারাবার ক্ষতি তোমাকে হত্যা করে পোষাবে না।'

'সেক্ষেত্রে তোমরা সবাই মরবে। শেষবারের মত ভেবে দেখো ব্যাপারটা।'

নীরবতা নেমে এল। দুর্গের ভিতরে মাহ্‌খি দু লঁতেনাকও চুপ। সিদ্ধান্ত নেবার ভার ছেড়ে দিয়েছেন অধীনস্থদের উপরে।

খানিক পরে মুখ খুলল গুঁজ লু ক্রুয়োঁ। বলল, 'তোমার এই প্রস্তাব অযৌক্তিক, যাজক। এর আগে আমরাই একটা প্রস্তাব দিয়েছি—আমাদের প্রাণের বিনিময়ে বাচ্চা তিনটের প্রাণ। সেটা বিবেচনা না করে পাল্টা প্রস্তাব দেয়া উচিত হচ্ছে না তোমাদের।'

'তা হলে কী চাও তোমরা?' জিজ্ঞেস করল সিমুর্দা।

'আগে যা চেয়েছিলাম। আমাদের যেতে দাও, তার বিনিময়ে নিয়ে যাও বাচ্চাদের।'

'একজন ছাড়া সবাইকেই মুক্তি দেব আমরা।'

'কে সে?'

'লঁতেনাক।'

'তা হবার নয়। মাহ্‌খিকে কিছুতেই আমরা তুলে দেব না তোমাদের হাতে।'

'এই একটা শর্তেই আমাদের মধ্যে সন্ধি হতে পারে।'

'তা হলে জাহান্নামে যাও!' রাগী গলায় বলল গুঁজ লু ব্রুয়োঁ। 'চালাও হামলা, আমরাও তার উপযুক্ত জবাব দেব।'

দুর্গের উপরে শিঙা বেজে উঠল। আলোচনা শেষ। অস্ত্র হাতে শত্রুদের মোকাবেলা করবার জন্য তৈরি হলো অবরুদ্ধ রাজতন্ত্রীরা।

দেরি করবার মানে হয় না। সিমুর্দা নিরাপদ দূরত্বে সরে এলে আক্রমণ শুরু করবার সঙ্কেত দিল গুভাঁ। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল কামান। গোলার আঘাতে ধসিয়ে দেয়া হলো দুর্গ-প্রাচীরের একটা অংশ, সেখান দিয়ে পিল পিল করে দুর্গ আঙিনায় ঢুকে পড়ল প্রজাতন্ত্রী সৈন্যরা।

বেধে গেল তীব্র যুদ্ধ। শুরুতে কিছুক্ষণ গুলি-বিনিময় চলল, তারপর শুরু হলো ঢাল-তলোয়ার আর হাতাহাতি লড়াই। ক্রমাগত বিস্ফোরকের আঘাতে নীচতলার হলঘরে আক্রমণকারীদের ঢোকার মত একটা ফাঁক সৃষ্টি হলো বটে, কিন্তু ওখান দিয়ে ভিতরে ঢুকেই ইঁট-পাথরের ধুলো আর ধোঁয়ায় বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে সৈন্যরা। হিসেব করে গুলিও চালাচ্ছে বিদ্রোহীরা, ফলে একে একে লুটিয়ে পড়ছে হামলাকারী দলের সদস্যরা। প্রতিপক্ষের খুব একটা ক্ষতি করতে পারছে না ওরা।

লড়াইটা পুরোপুরিভাবেই নীচতলায় চলছে। রক্তের নহর বয়ে যাচ্ছে ওখানে। পড়ছে লাশের পর লাশ। চিৎকার করে সৈন্যদের উৎসাহ জুগিয়ে চলেছে গুভাঁ, একই ভঙ্গিতে বিদ্রোহীদের সাহস জোগাচ্ছে গুঁজ লু ব্রুয়ো। সেই চিৎকারে বিপুল উদ্যমে লড়াই করছে দুই পক্ষ। আহত ও মুমূর্ষুদের আর্তনাদে ভারী হয়ে উঠছে বাতাস। কিন্তু তাদের আর্তনাদে কান দেবার কেউ নেই। আহত আর নিহতদের দেহগুলোকে

পদদলিত করে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে সবাই।

বাইরে তখন ঘনঘোর রাত নেমে এসেছে। দুর্গের ভিতরে তাণ্ডব চললেও সেই শব্দ পৌঁছুচ্ছে না বেশিদূর। ফলে বনভূমি আর মালভূমিতে বিরাজ করছে অদ্ভুত এক নিস্তব্ধতা। এমনকী সেতুর দোতলায় বাচ্চারাও ঘুমাচ্ছে পরম শান্তিতে।

খুব শীঘ্রি লড়াই ভয়ানক আকার ধারণ করল। রীতিমত ব্যারিকেড গড়ে আক্রমণ প্রতিহত করে চলেছে বিদ্রোহীরা, তার সামনে অসহায় হয়ে পড়েছে প্রজাতন্ত্রীরা। অকাতরে প্রাণ হারাচ্ছে তারা, লড়ে যাচ্ছে স্রেফ জেদের বশে।

গুভাঁ নিজে হলঘরে হাজির, ওখান থেকে পরিচালনা করছে লড়াই। হঠাৎ আগ্নেয়াস্ত্রের এক ঝলক আলোতে দেখল, সিমুর্দা ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। মালভূমিতে থাকার কথা তার, কখন চলে এসেছে টেরই পায়নি গুভাঁ।

'আপনি এখানে কী করছেন?' জিজ্ঞেস করল ও।

'তোমাকে সাহায্য করতে এলাম,' বলল সিমুর্দা।

'পাগল হয়েছেন? এখানে থাকলে মারা পড়বেন আপনি!'

'আর তোমার বুঝি কিছু হবে না?'

'এখানে থাকার দরকার আছে আমার। আপনার নেই।'

'তুমি থাকলে আমিও থাকব।'

'না, গুরু।'

'হ্যাঁ, বাছা।'

বুঝে গেল গুভাঁ, জোরাজুরি করে লাভ হবে না। যাবে না সিমুর্দা। অগত্যা কাঁধ ঝাঁকাল ও। মনোযোগ ফেরাল লড়াইয়ের দিকে।

অবশেষে ক্ষয়ক্ষতির শিকার হতে শুরু করেছে বিদ্রোহীরা। লোকের সংখ্যা কমে গিয়ে পনেরোতে পৌঁছেছে।

সিমুর্দা চেঁচিয়ে উঠল, 'লঁতেনাক, লড়াইয়ের সাধ মেটেনি তোমার? আর কত রক্ত ঝরাতে চাও? শেষ পর্যন্ত হারতেই হবে তোমাদেরকে। সাড়ে চার হাজারের বিরুদ্ধে উনিশজন... এটা কোনও লড়াই হলো? এখনও সময় আছে, আত্মসমর্পণ করো। নিজে না বাঁচো, অন্তত তোমার সঙ্গীদেরকে বাঁচতে দাও।'

'এখুনি টের পাবে কে বাঁচে আর কে মরে!' পাল্টা চিৎকার করলেন লঁতেনাক। 'ফায়ার!'

গর্জে উঠল বিদ্রোহীদের বন্দুকগুলো।

'ব্যারিকেড গুঁড়িয়ে দাও!' চেঁচাল গুভাঁ। 'ওদেরকে কোনও সুযোগ দিয়ো না।'

'এভাবে সুবিধে করতে পারবে না তুমি,' মন্তব্য করল সিমুর্দা।

'এরচেয়ে ভাল কোনও বুদ্ধি থাকলে বলতে পারেন, গুরু।'

'পিছন থেকে আক্রমণ করতে পারলে ভাল হতো... ওই যে, দোউলে যেভাবে করেছিলে।'

'ওখানে খোলা জায়গায় যুদ্ধ করেছিলাম আমরা। পিছনে যাবার পথ ছিল। এখানে নেই।'

'কে বলেছে নেই? দুর্গের বাইরের দিকের দেয়াল বেয়ে উপরে ওঠা যেতে পারে। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে হামলা করা যাবে পিছন থেকে।'

'বুদ্ধিটা মন্দ নয়,' স্বীকার করল গুভাঁ। সৈন্যদের দিকে ফিরল। 'তোমাদের কেউ কি বাইরের দেয়ালটা বেয়ে উপরে উঠতে পারবে?'

সার্জেন্ট রাদু এগিয়ে এল। নিজ দলের ছ'জন সৈনিক নিয়ে আক্রমণের প্রথম সারিতে যোগ দিয়েছিল সে, এরই মধ্যে তাদের চারজন মারা গেছে। সে বলল, 'আমি পারব, ক্যাপ্টেন।'

'তা হলে যাও।'

মাথা ঝাঁকিয়ে হলঘর থেকে বেরিয়ে গেল রাদু। আঙিনায় পৌঁছে চাঁদের আলোয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল দুর্গের বাইরেটা। কামানের গোলার আঘাতে লম্বা একটা ফাটল দেখা দিয়েছে দুর্গপ্রাচীরে। খুব একটা চওড়া নয়, মানুষ ঢুকতে পারবে না, তবে ওটা উঠে গেছে দোতলার একটা জানালা পর্যন্ত। ফাটলে হাত-পা বাধিয়ে বাওয়া যাবে দেয়াল। জানালার পাল্লা আর গরাদও বিস্ফোরণের ধাক্কায় ভেঙেচুরে গেছে, ওই পথে ঢোকা সম্ভব দুর্গে।

খুশি হয়ে উঠল রাদু। গা থেকে খুলে ফেলল জ্যাকেট-সহ বাড়তি পোশাক-আশাক। কোমরে রাখল শুধু পিস্তল আর তলোয়ার। তারপর এগিয়ে গেল দেয়ালের দিকে। ফাটলে হাত-পা বাধিয়ে তরতর করে উঠে গেল দোতলায়। জানালার কাছে পৌঁছে উঁকি দিল ভিতরে।

দোতলার হলঘর খালিই বলা চলে, নিস্তেজ একজন মানুষ শুধু বসে আছে জানালার পাশের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে। চোখ পিট পিট করে তার দিকে তাকাল রাদু, কয়েক মুহূর্ত পরেই চিনতে পারল তাকে। শন্তে হিভা—বিদ্রোহী বাহিনীর সবচেয়ে দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। এখন অবশ্য আর দুর্ধর্ষ বলা চলে না তাকে, ভীষণভাবে আহত হয়েছে। একটা চোখ গলে গেছে তার, ভেঙে গেছে চোয়াল। মুমূর্ষু অবস্থায় কোনোমতে বসে আছে সে, প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাবার আগে ফিসফিস করে পানি চাইছে।

ওকে নিয়ে দুশ্চিন্তার কোনও কারণ দেখল না রাদু, জানালা গলে নিশ্চিন্তে ঢুকে পড়ল দোতলার হলঘরে। আহত লোকটাকে পেরিয়ে কয়েক পা এগোল, পরক্ষণে সটান দাঁড়িয়ে গেল তার ঘাড়ের চুলগুলো। পাঁই করে ঘুরতে শুরু করল রাদু... ঘুরতে

ঘুরতেই দেখল, মেঝে থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে শন্তে হিভা, শত্রুকে দেখতে পেয়ে আচমকা যেন শক্তি ফিরে পেয়েছে মরণোন্মুখ লোকটা। রাদু পুরোপুরি ঘুরে দাঁড়াবার আগেই এক হাতে তলোয়ার উঁচিয়ে আঘাত হানল সে।

স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে এমন আঘাতে কল্লা আলাদা হয়ে যাবার কথা; কিন্তু রাদুর কপাল ভাল, শন্তে হিভা একেবারে দুর্বল হয়ে পড়েছে। সার্জেন্টের ঘাড়ের উপর তলোয়ারের কোপ পড়ল বটে, কিন্তু সেটা সামান্য ক্ষত সৃষ্টি ছাড়া বড় কোনও ক্ষতি করতে পারল না। হাতের ঝাপটায় তলোয়ারটা সরিয়ে দিল রাদু, ছিটকে পিছিয়ে এল কয়েক পা। তলোয়ার ফেলে দিয়ে ত্রস্ত হাতে এবার কোমরের পিস্তল আঁকড়ে ধরল শন্তে লিভা, গুলি করতে চায় প্রতিপক্ষকে। তাকে লক্ষ্য করে বাঘের মত ঝাঁপ দিল রাদু। নিশানা করবার সময় নেই, পিস্তলটা খাপমুক্ত করেই ট্রিগার চাপল শন্তে লিভা।

রাদুর এক কানে আঁচড় কেটে চলে গেল গুলি। প্রতিপক্ষকে জাপটে ধরে মেঝেতে আছড়ে পড়ল সে। শুরু হলো ধস্তাধস্তি। দুর্বল শন্তে লিভা প্রতিরোধ গড়তে পারল না। তার হাত থেকে পিস্তল কেড়ে নিয়ে ভাঙা চোয়াল বরাবর জোর ঘুসি লাগাল রাদু। কাতরে উঠে চেতনা হারাল লোকটা। চাইলে এখন তাকে খুন করতে পারে সার্জেন্ট, কিন্তু করল না। মুমূর্ষ একজন মানুষের রক্তে হাত রাঙানোর কোনও মানে হয় না। এমনিতেই মরবে শন্তে লিভা।

উঠে দাঁড়াল রাদু। অন্ধকারে খুঁজতে শুরু করল সিঁড়ি। নীচে তখন তুমুল যুদ্ধ চলছে। সব শব্দই কানে আসছে তার। শব্দের উৎস লক্ষ্য করে এগোতে গিয়ে একটা টেবিলের সঙ্গে ধাক্কা খেলো ও। হাতড়াতে শুরু করল টেবিলের উপরটা। ওখানে নানা

ধরনের অস্ত্র সাজিয়ে রাখা হয়েছে। দোতলায় উঠে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার জন্য অস্ত্রগুলো জড়ো করে রেখেছে বিদ্রোহীরা। একটা বন্দুক পেয়ে গেল রাদু ওখানে, গুলি-ভরা। খুশিতে নেচে উঠল তার হৃদয়। যদিও পিস্তল আছে সঙ্গে, কিন্তু বন্দুক পাওয়ায় আরও ভাল হলো।

খানিক পরেই সিঁড়ি খুঁজে পেল ও। ধাপ ভেঙে নেমে গেল নীচে। ব্যারিকেডের পিছনে পৌঁছেই নির্দ্বিধায় গুলি ছুঁড়ল। পিঠে গুলি খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে মারা পড়ল দুজন বিদ্রোহী। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো বিশৃঙ্খলা। বিদ্রোহীরা ভাবল, বাইরে থেকে দোতলায় পৌঁছে গেছে শত্রুরা, ফাঁদে পড়ে গেছে তারা। লড়াইয়ের খায়েশ মিটে গেল তাদের। ব্যস্ত হয়ে পড়ল পিঠটান দেয়ায়।

গুলি ছুঁড়েই দোতলায় ফিরে এসেছে রাদু। দরজার পিছনে পজিশন নিয়ে আবার গুলি ছুঁড়ল, দোতলার অস্ত্রশস্ত্রের কাছে পৌঁছুতে দেবে না বিদ্রোহীদের। ওরা সে-চেষ্টা করলও না। লঁতেনাকের হুকুমে সিঁড়ি ধরে তিনতলায় উঠে গেল তারা। যাবার পথে রাদুর গুলিতে খতম হলো আরও কয়েকজন।

খানিক পরেই বিদ্রোহীদের ধাওয়া করে সিঁড়ি ধরে উঠে এল গুভাঁ আর সিমুর্দা। এবার আড়াল থেকে বেরুল রাদু। নেতাকে স্যালিউট ঠুকে বলল, 'ওরা সবাই তিনতলায় উঠে গেছে, ক্যাপ্টেন।'

'দারুণ দেখিয়েছ, সার্জেন্টি!' প্রশংসা করল গুভাঁ। পরমুহূর্তে রাদুর ঘাড় আর কানে রক্ত দেখে বলল, 'এ কী! তুমি তো দেখছি আহত!'

'ও কিছু না, ক্যাপ্টেন,' হালকা গলায় বলল রাদু। 'সামান্য রক্ত ঝরেছে, ওতে আমার কোনও অসুবিধে হবে না।'

'যাও, ক্ষতের চিকিৎসা করাও। এ-দিকটা এবার আমরা

দেখছি।'

'জী, সার।' আবার স্যালিউট ঠুকে চলে গেল রাদু।

সিমুর্দার সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনায় বসল গুভাঁ। রাদুর আক্রমণে কতজন আহত-নিহত হয়েছে, তার হিসেব করা হলো। বোঝা গেল, আর মাত্র সাতজন অবশিষ্ট আছে বিদ্রোহীদলে। খুব বেশি গুলি নেই তাদের হাতে, তা ছাড়া তিনতলার যে-ঘরটায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে ওরা, ওখান থেকে বেরুবার দ্বিতীয় কোনও পথও নেই। কাজেই আর পালাতে পারছে না ওরা। সরাসরি হামলা চালিয়েই ঘায়েল করা যাবে ওদের।

তবে তার আগে দলের লোকজনের বিশ্রাম প্রয়োজন। তাই কিছুটা সময়ের জন্য লড়াই বন্ধ রাখার হুকুম দেয়া হলো।

খানিক পরে ফিরে এল রাদু। স্যালিউট ঠুকে বলল, 'আমার একটা আর্জি আছে, ক্যাপ্টেন।'

'আবার কী?' জিজ্ঞেস করল গুভাঁ।

'তিনতলায় সবার আগে আমি উঠতে চাই।'

আপত্তির কিছু দেখল না গুভাঁ। অনুমতির তোয়াক্কা না করেও কাজটা করতে পারে সার্জেন্ট।

'বেশ,' বলল ও। 'তা-ই হবে।'

একুশ

তিনতলার আয়নাঘরে ঢুকে দরজা আটকে দিয়েছে বিদ্রোহীরা। কামরার ভিতরে একটা ওক কাঠের ভারী সিন্দুক ছিল, ওটা নিয়ে গিয়ে ঠেস দেয়া হয়েছে দরজার গায়ে। স্থায়ী কোনও সমাধান নয়, তবে দরজা ভাঙতে কিছুটা সময় লাগবে হামলাকারীদের। কাজটা মনের সান্ত্বনার জন্য করা। অনিবার্য নিয়তিকে একটু পিছিয়ে দেয়া আর কী।

দেয়ালে ঝোলানো একটা মশাল জ্বালা হয়েছে ইতোমধ্যে, সেই আলোয় হতাশ চোখে সঙ্গীদের দিকে তাকালেন লঁতেনাক। তিনি আর গুঁজ লু ক্রুয়োঁ ছাড়া আর আছে মাত্র পাঁচজন—শেতেনে, গিনিয়াজু, ওয়ানাখ্, ব্রান্দেমুখ্, আর গ্রাঁ ফক্কেয়া। কেউই একেবারে অক্ষত নয়, অল্প-বিস্তর আঘাত লেগেছে সবার গায়ে। গুলিও নেই তাঁদের কাছে। রিজার্ভ হিসেবে যেসব অস্ত্র-শস্ত্র রাখা হয়েছিল, সব দোতলার হলঘরে—কামরাটা এখন শত্রুদের দখলে। হাতের পাঁচ বলতে রয়েছে স্রেফ চারটা পিস্তল—সাতজনের জন্যে!

পরিস্থিতি সম্পূর্ণ প্রতিকূলে। লঁতেনাকের মনে হলো, খাড়া এক পাহাড়ের কিনারায় পৌঁছে গেছেন তাঁরা। এরপরেই গভীর

অতলান্ত খাদের শূন্যতা এবং অন্ধকার। পতন অনিবার্য। কোনও দিকে পালাবার পথ নেই। দুর্গ থেকে বেরুবার উপায় একটাই—ছাতে গিয়ে নীচে লাফ দেয়া। তারমানে আত্মহত্যা!

'সব শেষ, বন্ধুরা,' সঙ্গীদের উদ্দেশে বললেন লঁতেনাক। 'মিথ্যে আশা দেবার কোনও প্রয়োজন দেখছি না। গ্রাঁ ফঙ্কেয়া, তুমি তোমার পুরনো পেশায় ফিরে যাও। যাজক হিসেবে শেষ স্বীকারোক্তি গ্রহণ করো আমাদের।'

কথাটা শুনেই হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সবাই। কপালের একপাশ কেটে রক্ত ঝরছে গ্রাঁ ফঙ্কেয়ার। আঘাতটা বাম হাতে চেপে ধরে ডান হাতে পকেট থেকে একটা ক্রুশ বের করল সে। ওটা উঁচু করে ধরে ফিরল সঙ্গীদের দিকে। লঁতেনাক নিজে অবিশ্বাসী হলেও মাথা নিচু করলেন।

গ্রাঁ ফঙ্কেয়া বলল, 'এবার তোমরা একে একে নিজের জীবনের পাপকর্ম স্বীকার করো। মাহ্খি, আপনিই শুরু করুন।'

'আমি নরহত্যা করেছি,' শান্ত গলায় বললেন লঁতেনাক।

'আমিও নরহত্যা করেছি,' বলল ওয়ানাখ্।

'আমিও,' সুর মেলাল গিনিয়াজু।

একই স্বীকারোক্তি বেরুল ব্রান্দেমুখ্ আর গুঁজ লু ক্রুয়োঁর মুখ দিয়ে।

গ্রাঁ ফঙ্কেয়া বলল, 'বেশ, আমি ঈশ্বর, যিশু আর মাতা মেরির নামে তোমাদের ক্ষমা করলাম। তোমাদের আত্মা যেন স্বর্গে ঠাঁই পায়।'

সমবেত গলায় সবাই বলে উঠল, 'আমেন!'

সোজা হয়ে দাঁড়ালেন লঁতেনাক। 'এবার তা হলে আমরা মরবার জন্য প্রস্তুত।'

ধুমধাম করে আওয়াজ হলো সিঁড়ির দরজায়। হামলাকারীরা

এসে গেছে, দরজা ভেঙে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করছে তারা।

'ঈশ্বরের নাম নাও সবাই,' বলল গ্রাঁ ফঙ্কেয়া। 'আমরা এখন তাঁর জিম্মায়।'

'হ্যাঁ,' বললেন লঁতেনাক। 'আমরা এখন মৃত।'

বিড়বিড় করে প্রার্থনা করতে শুরু করল বিদ্রোহীরা। কয়েক মুহূর্ত পরেই ঘটল অবাক এক কাণ্ড। ওদের পিছন দিক থেকে ভেসে এল পাথরে ঘষা খাওয়ার আওয়াজ। ঝট্ করে সেদিকে তাকাল ওরা। সবিস্ময়ে লক্ষ করল, দেয়ালের একটা অংশ সরে গেছে... ওটা আসলে একটা গুপ্ত দরজা! ফাঁকা দিয়ে একটা মুখ উঁকি দিল প্রথমে, তারপর পুরো মানুষটাই বেরিয়ে এল। মুখে অনাবিল হাসি।

'বেশি দেরি করে ফেলিনি তো?' বলল সে।

'অলমালো!' চমকে উঠলেন লঁতেনাক। ক্লেমোর জাহাজের নাবিকটিকে চিনতে পেরেছেন। 'তুমি কোত্থেকে?'

'গুপ্তপথ ধরে এসেছি,' বলল অলমালো। 'আপনাকে তো সেদিনই বলেছিলাম, এই দুর্গে গোপনে ঢোকা আর বেরুনোর জন্য চোরা রাস্তা আছে। আপনি আমার কথা বিশ্বাস করলেন না। এখন তার প্রমাণ পেলেন তো?'

'ও... ওটা গুপ্তপথ?' বিস্ময়ে কথা আটকে যাচ্ছে যাহ্ণির।

'সী সেনিয়োর, দেয়ালের মাঝ দিয়ে একটা শাফট নেমে গেছে মাটির তলায়, ওখান দিয়ে সুড়ঙ্গপথে নীচের জঙ্গলে পৌঁছুনো যায়।'

'কী আশ্চর্য! আমি তো এর খবরই জানতাম না।'

'আমিও জানতাম না, আপনিই আমার সেনিয়োর। তা হলে আরও আগেই আসতাম।' হাসল অলমালো। 'যাক গে, ভুলটা যে এখন সংশোধন করতে পারছি, সে-ই ঢের। আসুন সবাই।

এই পথে খুব সহজে নিরাপদ জায়গায় চলে যেতে পারবেন আপনারা।'

'ঈশ্বর মহান!' উপরদিকে মুখ তুলে বলল গ্রাঁ ফঙ্কেয়া।

'কী বলে তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাব, তা বুঝতে পারছি না, অলমালো,' বললেন লঁতেনাক।

'চলুন, মাহ্‌খি,' বলল গিনিয়াজু, 'রওনা হওয়া যাক।'

'তোমরা আগে যাও,' লঁতেনাক বললেন। 'আমি সবার শেষে যাব।'

'না, না,' বলে উঠল গ্রাঁ ফঙ্কেয়া। 'আপনি আগে যান।'

'এখানে উদারতা দেখাবার কিছু নেই,' বললেন লঁতেনাক। 'তোমরা আহত, তাই তোমাদেরই আগে যাওয়া উচিত। আমার জন্য অপেক্ষা কোরো না। জঙ্গলে পৌঁছেই যে যেদিকে পারো, পালিয়ে যেয়ো।'

'যদি আলাদাই হতে হয়,' বলল গ্রাঁ ফঙ্কেয়া, 'পরে আপনাকে আবার খুঁজে পাব কীভাবে?'

'বনের ভিতরে একটা ফাঁকা জায়গা আছে—পিয়েখ্-গুভাঁ। ওটা তোমরা চেনো?'

'চিনি বৈকি।'

'তা হলে কাল দুপুরে ওখানে চলে এসো, আমি অপেক্ষা করব। ওখানেই আবার একজোট হব আমরা, শুরু করব নতুন লড়াই।'

গুপ্তপথের পাথুরে দরজাটা নিয়ে ঠেলাঠেলি করছিল অলমালো, ওটাকে নড়াতে না পেরে বলল, 'জলদি করুন আপনারা। দরজাটা বন্ধ করতে পারছি না আমি, বোধহয় অব্যবহারে জ্যাম হয়ে গেছে। শত্রুরা এখান দিয়ে পিছু নিতে পারবে আমাদের। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কেটে পড়া দরকার।'

সমস্যাটা গুরুতর। গম্ভীর মুখে ওর দিকে এগিয়ে গেল গুঁজ লু ক্রুয়োঁ। জিজ্ঞেস করল, 'এই পথে বনের ভিতরে পৌঁছুতে কত সময় লাগবে?'

'আপনাদের সঙ্গে আহত কেউ আছে? গুরুতর আহত?'

'না, অত খারাপ অবস্থা নয় কারও।'

'তা হলে পনেরো মিনিটের ভিতরেই বনে পৌঁছুনো যাবে।'

'তারমানে ওই পনেরো মিনিট শত্রুদের ঠেকিয়ে রাখলেই চলে? এরপর ওরা আর আমাদের ধরতে পারবে না?'

'ঠিক ধরেছেন?'

শঙ্কিত চোখে সিঁড়িঘরের দরজার দিকে তাকালেন লঁতেনাক। 'পনেরো মিনিট ওই দরজা টিকবে না। আর কয়েকটা ঘা পড়লেই ওটা ভেঙে যাবে। কে ঠেকাবে ওদেরকে?'

'আমি,' শান্ত গলায় বলল গুঁজ লু ক্রুয়োঁ।

'তুমি?'

'হ্যাঁ, জেনারেল। আমাদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে সুস্থ। আমার পক্ষে এই কামরাটা পনেরো মিনিট আগলে রাখা সম্ভব।'

'না, না, তা কী করে হয়? যদি কাউকে থাকতে হয় তো আমি থাকব।'

'আমি তাতে সম্মতি দিতে পারছি না বলে দুঃখিত। আপনার জীবনের দাম অনেক বেশি। আপনি আমাদের সংগ্রামের শেষ আশা। আমি সাধারণ এক সৈনিক, আমি মরলে কোনও ক্ষতি হবে না বিদ্রোহের। কিন্তু আপনার মৃত্যুতে যে ক্ষতি হবে, তা অপূরণীয়।'

কী বলবেন ভেবে পেলেন না লঁতেনাক। অকুতোভয় যুবকটির সামনে মাথা হেঁট হয়ে যেতে চাইল তাঁর।

সঙ্গীদের দিকে ফিরল গুঁজ লু ক্রুয়োঁ। 'বন্ধুগণ, চলে যাও

তোমরা। এদিককার চিন্তা আমার। যেভাবেই পারি, শত্রুদের আটকে রাখব অন্তত পনেরো মিনিট। তোমরা তোমাদের অস্ত্রগুলো আমাকে দিয়ে যাও।'

দ্বিরুক্তি না করে সব অস্ত্র নামিয়ে রাখল বিদ্রোহীরা। তারপর তড়িঘড়ি করে পা বাড়াল গুপ্তপথের দিকে।

'আসুন, সেনিয়োখ্!' দরজার কাছ থেকে ডাকল অলমালো। 'দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

বিষণ্ন চোখে গুঁজ লু ক্রুয়োঁর দিকে তাকালেন লঁতেনাক। 'আসি, বন্ধু। ভাগ্যে থাকলে আবার দেখা হবে আমাদের।'

'হবে না,' বলল গুঁজ লু ক্রুয়োঁ। 'আজ এখানে মরতেই হবে আমাকে। যান, সার।'

ওর সঙ্গে হাত মেলালেন লঁতেনাক, তারপর গুপ্তপথ ধরে ঝড়ের বেগে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ফাঁকটা খোলাই রয়ে গেল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মেঝে থেকে দুটো পিস্তল কুড়িয়ে নিল গুঁজ লু ক্রুয়োঁ। এগিয়ে গেল দরজার দিকে। ওপাশ থেকে ক্রমাগত আঘাত করা হচ্ছে পাল্লায়। ভারী সিন্দুকটা নড়াতে পারেনি প্রতিপক্ষ, এখন বিকল্প কৌশল বেছে নিয়েছে। পাল্লার উপরের অংশ ভেঙে ঢুকতে চাইছে আয়নাঘরে। মাস্কেটের আঘাতে এরই মধ্যে বেশ কয়েকটা ফুটো দেখা দিয়েছে দরজার গায়ে।

এক লাফে সিন্দুকের উপরে চড়ে বসল গুঁজ লু ক্রুয়োঁ, দরজার একটা ফুটোয় ঢুকিয়ে দিল পিস্তলের নল, গুলি করল ওখান দিয়ে। ওপাশে কাতর একটা চিৎকার শোনা গেল—গুলিতে মাথার খুলি উড়ে গেছে একজনের। হেসে উঠল গুঁজ লু ক্রুয়োঁ। অন্য পিস্তলটাও আরেকটা ফুটোয় রেখে চাপতে শুরু করল ট্রিগার। চিৎকার-চেঁচামেচি আর হৈ-হল্লা শুরু হলো সিঁড়িতে, ফায়ারিং লাইন থেকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করছে

প্রতিপক্ষ।

কৌশলটাতে চমৎকার কাজ হলো, বেশ কিছুটা সময় শত্রুকে ঠেকিয়ে রাখল গুঁজ লু ক্রুয়োঁ। আত্মতৃপ্তিতে ভুগতে শুরু করেছিল, আর সেটাই হলো কাল। হঠাৎ তলপেটে তীব্র ব্যথা অনুভব করল সে। ওদিকে তাকাতেই বিস্ফারিত হয়ে গেল চোখ। ওপাশে, হামাগুড়ি দিয়ে ফায়ারিং লাইন এড়িয়ে দরজার পাশে চলে এসেছে এক শত্রু, নীচের দিকের একটা ফুটোর মাঝ দিয়ে ঠেসে দিয়েছে তলোয়ার, ওটা গেঁথে গেছে তার পেটে। পিছন দিকে ছিটকে গেল সে, সিন্দুক থেকে আছড়ে পড়ল মেঝেতে। ককিয়ে উঠল। পেটের ক্ষত থেকে তখন গলগল করে গড়াতে শুরু করেছে রক্ত।

হাত থেকে পিস্তল ফেলে দিল গুঁজ লু ক্রুয়োঁ, চেপে ধরল ক্ষত। তারপর শরীর ঘষটে চলে গেল জানালার কিনারে। অসহ্য যন্ত্রণায় শরীর বিদ্রোহ করতে শুরু করেছে, দাঁতে দাঁত পিষে সহ্য করল সেই যন্ত্রণা। কাঁপা কাঁপা হাতে পকেট থেকে বের করল একটা দেশলাই, মেঝেতে ঘষে আগুন জ্বালল ওটায়। জ্বলন্ত কাঠিটা এবার ঠেকাল মেঝেতে পড়ে থাকা গন্ধক-মেশানো দড়িতে। ফস্ করে আগুন ধরে গেল ওটাতে, শিখাটা দড়ি ধরে জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেল... ছুটে গেল সেতুর দিকে!

ক্রূর হাসি হাসল গুঁজ লু ক্রুয়োঁ। 'আমার দায়িত্ব আমি পালন করেছি!'

বিকট আওয়াজ করে খানিক পরেই ভেঙে পড়ল দরজা। সবার আগে অস্ত্র হাতে হুড়মুড় করে আয়নাঘরে ঢুকল একজন মানুষ। তাকে দেখতে পেয়েই পিস্তল তুলে গুলি করল গুঁজ লু ক্রুয়োঁ, তবে লক্ষ্যভেদ করবার মত অবস্থা তার নেই। মানুষটার কনুই ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল গুলি। দ্বিতীয়বার গুলি ছুঁড়বার সুযোগ

পেল না সে, লোকটা ছুটে এসে তার হাত থেকে কেড়ে নিল পিস্তল। গর্জে উঠল:

'আত্মসমর্পণ করো! তুমি আমার বন্দি!'

'কক্ষনো না,' কষ্টেসৃষ্টে বলল গুঁজ লু ক্রুয়োঁ। আস্তে আস্তে মুখ তুলল, দেখতে পেল লোকটার চেহারা—সার্জেন্ট রাদু। 'আমাকে কখনোই তুমি বন্দি করতে পারবে না।'

কথাটা বলেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল সে।

পিছনে আরও সৈন্য উদয় হলো। তাদেরকে ঠেলে রাদুর কাছে এল গুভাঁ আর সিমুর্দা।

'এ একা কেন?' বিস্মিত গলায় জিজ্ঞেস করল গুভাঁ। 'বাকিরা কোথায়? লঁতেনাক?'

দেয়ালের ফাঁকটার উপর চোখ পড়েছে রাদুর। দেখেই বুঝে নিয়েছে ওটা কী। বলল, 'ওই যে... ওই পথে পালিয়েছে। নিশ্চয়ই এতক্ষণে চলে গেছে বহুদূর। ওদেরকে পালানোর সুযোগ করে দেবার জন্যই এতক্ষণ লড়াই করছিল গুঁজ লু ক্রুয়োঁ।'

'না, পালাতে দেয়া যাবে না ওদের,' গোঁয়ারের মত বলল সিমুর্দা। 'লোক পাঠাও ওদের পিছনে। দরকার হলে নরক পর্যন্ত ধাওয়া করবে।'

কথাটার জবাব দেবার সুযোগ পেল না গুভাঁ। তার আগেই চেঁচিয়ে উঠল এক সৈনিক। 'ক্যাপ্টেন! দেখুন!'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই চমকে উঠল গুভাঁ। আগুন ধরে গেছে সেতুতে!

'আমাদের বাচ্চারা!' হাহাকার করে উঠল রাদু।

'গিশঁম!' গলা চড়িয়ে ডাকল গুভাঁ। 'আমাদের মই কোথায়? বাচ্চাদের বের করে আনো এখুনি!'

'মই নেই, ক্যাপ্টেন,' বিমর্ষ গলায় বলল গিশঁম।

'নেই মানে? তখন না ওয়াগনটাকে আসতে দেখলাম?'

'ওটা অন্য ওয়াগন, সার। একটা গিলোটিন নিয়ে এসেছে। মই নিয়ে যেটার আসার কথা ছিল, ওটা আসেনি।'

হতাশায় হাত মুঠো করল গুভাঁ।

সুড়ঙ্গ ধরে বনের ভিতরে বেরিয়ে এসেছেন লঁতেনাক আর অলমালো। তাঁদের সঙ্গীরা আরও আগেই বেরিয়েছে, বনে পৌঁছেই নিশ্চয়ই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট লাগিয়েছে তারা, ওদের কোনও চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না কোথাও। সামনে রাস্তা দু'ভাগ হয়ে গেছে দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন লঁতেনাক। অলমালোকে বললেন, 'তুমি ডানে যাও, আমি বাঁয়ে যাচ্ছি।'

'আলাদা হয়ে যাব?' দ্বিধান্বিত গলায় জিজ্ঞেস করল অলমালো।

'হ্যাঁ। দু'জন একসঙ্গে থাকা বিপজ্জনক। একা থাকলে বরং দ্রুত পথ চলতে পারব আমরা।'

'আপনি এই এলাকার সব পথঘাট চেনেন? একাকী যেতে পারবেন?'

'পারব। আমাকে নিয়ে ভেবো না। যাও তুমি।'

'আবার কোথায় দেখা হবে?'

'বলেছি তো, পিয়েখ্-গুভাঁয়। কাল দুপুরে। ওখানে হাজির থেকো।'

'ঠিক আছে, সেনিয়োখ্।'

আর কথা না বাড়িয়ে ডানের পথ ধরল অলমালো। ঝোপঝাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই।

বাঁয়ের পথে হাঁটতে শুরু করলেন লঁতেনাক। নানা রকম

অনুভূতি খেলা করছে তাঁর ভিতরে। পরাজয়ের তিক্ততা তো আছেই, কিন্তু নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসতে পেরে এক ধরনের আনন্দও বোধ করছেন তিনি। কিছুক্ষণ আগে জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন, অথচ এখন তিনি মুক্ত, নিরাপদ। নতুন করে সাজাতে পারবেন পরিকল্পনা, শুরু করতে পারবেন নয়া লড়াই। আনন্দ বোধ হওয়াই স্বাভাবিক।

হাঁটতে হাঁটতে বুক পকেট থেকে ঘড়ি বের করে দেখলেন লঁতেনাক। রাত দশটা বাজে। সব মিলিয়ে দু'তিন ঘণ্টার বেশি লড়াই হয়নি, অথচ মনে হচ্ছে যেন কয়েক যুগ পেরিয়ে গেছে প্রথম কামানধ্বনির পরে। কতকিছু ঘটে গেল এর ভিতরে। বীরের মত লড়লেন তাঁরা, তাঁর জন্য আত্মত্যাগ করল গুঁজ লু ক্রুয়োঁ... সেসব মনে পড়তেই বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তাঁর।

বনের ভিতর থেকে একটু পরেই গিরিখাতে নেমে এলেন মাহ্খি। নদীর ধার ধরে দ্রুত পায়ে হাঁটতে থাকলেন। এই নদীই তাঁকে এখন পথ দেখাবে, নিয়ে যাবে শত্রু-অধ্যুষিত এলাকার বাইরে। কিন্তু কিছুদূর যেতেই থমকে দাঁড়ালেন তিনি। হঠাৎ করেই আলোকিত হয়ে উঠেছে নদীর পানি, উপর থেকে আসছে আলো। সেদিকে মুখ তুলতে শুরু করলেন তিনি, আর তখুনি রাতের নীরবতাকে খান খান করে দিল একটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠের চিৎকার।

বাইশ

সমস্ত ক্লান্তি আর অবসাদকে অগ্রাহ্য করে মালভূমির উপর দিয়ে লা তুয়োগ দুর্গের দিকে এগিয়ে এসেছে মিশেল। দেখতে দেখতে সূর্য অস্ত গেছে, আকাশে উঁকি দিতে শুরু করেছে রাতের তারা। দূরে, পারিন্‌হির গির্জায় বেজেছে সান্ধ্যকালীন প্রার্থনার ঘণ্টা। রাতের সেই পরিবেশ চিরে হেঁটে চলেছে ও।

হঠাৎ নিজেকে একটা গিরিখাতের কিনারে আবিষ্কার করল মিশেল। খাতের ওপারে দুর্গের কাঠামো আকাশ ছুঁয়েছে। ভিতর থেকে ভেসে আসছে গোলমালের আবছা আওয়াজ। যেখানে ও দাঁড়িয়েছে, সেখান থেকে সামান্য দূরে কামান আর নানা ধরনের অস্ত্রে সজ্জিত একটা যুদ্ধশিবিরও দেখা যাচ্ছে। খাতের উপর দিয়ে চলে যাওয়া একটা সেতুর মুখে স্থাপন করা হয়েছে শিবিরটা। যোদ্ধারা অস্ত্রহাতে পাহারা দিচ্ছে সেতুর মুখ, যাতে কেউ ঢুকতে বা বেরুতে না পারে।

কী করবে ভেবে পেল না মিশেল। এগিয়ে যাবে? নিজের কথা শুনিয়ে সাহায্য চাইবে সৈনিকদের? সিদ্ধান্ত নিতে পারল না। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে যুদ্ধ চলছে দুর্গে। এ-অবস্থায় ওকে শত্রুপক্ষের চর ভেবে বসতে পারে সৈনিকরা। তারচেয়ে একটু অপেক্ষা করা যাক। পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হলে নাহয় দুর্গে ঢোকার

একটা চেষ্টা চালানো যাবে।

নিস্তরঙ্গভাবে পেরিয়ে গেল কিছুটা সময়। তারপর হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল মিশেল। ধোঁয়ার একটা ঘন কালো মেঘ এসে ঢেকে দিয়েছে সবকিছু। চোখ কচলে সেতুর দিকে তাকাল ও। আগুন ধরে গেছে ওখানে! কে ধরাল? জানার উপায় নেই। কিন্তু সেতুর নীচতলায় লক লক করে আগুনের শিখা বেড়ে উঠতে দেখল ও। খুব শীঘ্রি দোতলা আর তিনতলাতে পৌঁছে যাবে।

সৈনিকরা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সেতুর এপারে তো বটেই, ওপারে দুর্গ থেকেও বেরিয়ে এসেছে অনেকে। ছোটাছুটি করছে সবাই। ওদের এই ব্যস্ততার কারণ বুঝল না মিশেল। সেতুর মধ্যে কি মূল্যবান বা গুরুত্বপূর্ণ কিছু আছে? তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ওদিকে তাকিয়ে রহস্যটা বোঝার চেষ্টা করল।

মালভূমির উঁচু একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে ও, সেতু থেকে বেশ খানিকটা উপরে। আগুনের আকার বড় হয়ে উঠতেই সেই আভায় পরিষ্কার দেখা গেল সবকিছু। দোতলার খোলা জানালা দিয়ে ভিতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল ও। লাইব্রেরি ওটা, ঘরময় সাজানো রয়েছে অনেকগুলো বইয়ের শেলফ। কিন্তু এ কী... মেঝেতে শুয়ে থাকা তিনটা দেহও যে দেখা যাচ্ছে—পূর্ণবয়স্ক মানুষ নয়, বাচ্চা! মাত্র এক মুহূর্ত, তারপরেই নিজের সন্তানদের চিনতে পারল মিশেল ওরা আগুনে পুড়ে মরতে চলেছে! আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে চিৎকার করে উঠল ও

'হা ঈশ্বর! আমার সন্তান! কে কোথায় আছ, আমার সন্তানদের বাঁচাও!'

পাগলের মত ও ছুট লাগাল সেতুর দিকে।

ওর চিৎকারই গিরিখাতের তলা থেকে শুনতে পেয়েছেন লঁতেনাক।

দুর্গ থেকে এরই মধ্যে বেরিয়ে এসেছে গুভাঁ আর সিমুর্দা, আদেশ দিয়েছে আগুন নেভাবার। কিন্তু তাদের সে-আদেশ পালন করবার উপায় নেই সৈনিকদের। পানি দরকার আগুন নেভানোর জন্য, সেই পানিই নেই ওদের কাছে। নদীটা গিরিখাতের তলায়। ওখান থেকে পানি তুলে আনা দুঃসাধ্য। বালতি হাতে বিভ্রান্তের মত ছোটাছুটি করছে সৈন্যরা।

সেতুর গায়ে গজিয়ে ওঠা আইভি লতা ধরে কিছুক্ষণের মধ্যে উপরে উঠে গেল আগুনের শিখা, তিনতলার শস্যভাণ্ডার মুহূর্তেই জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে। হাহাকার করে উঠল দর্শকরা। বাচ্চাদের বাঁচানো বোধহয় আর সম্ভব হলো না। উপরে-নীচে দু'দিকেই আগুন ধরে যাওয়ায় ফাঁদে পড়ে গেছে ওরা।

'মই! মই দরকার আমাদের!' চেঁচিয়ে উঠল গুভাঁ। 'একটা মই পেলেই নামিয়ে আনা যাবে ওদের।'

'মই নেই, সার,' মনে করিয়ে দিল গিশাঁম।

'তা হলে পানি আনো।'

'চেষ্টা করছি, সার। কিন্তু গিরিখাত থেকে দ্রুত পানি তোলার কোনও ব্যবস্থা নেই।'

'সেতুর নীচতলার দরজাটা ভাঙো তা হলে। সিঁড়ি দিয়ে উঠব আমরা দোতলায়।'

'দরজাটা তালা মারা। চাবি মাহ্‌খি লঁতেনাক নিয়ে গেছে। দরজাটাও লোহার, ওটা ভাঙা সম্ভব নয়।'

'চেষ্টা তো করো!'

কুড়াল নিয়ে ছুটে গেল কয়েকজন। বিপুল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ল দরজার উপরে। কিন্তু তাদের হামলার মুখে অটল রইল লোহার ভারী পাল্লা।

নীচ থেকে সবকিছুই শুনতে পাচ্ছেন লঁতেনাক। বুঝে

ফেললেন, গুভাঁর সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে চলেছে। বাচ্চাগুলোকে বাঁচাতে পারবে না সে। এ-নিয়ে অবশ্য তাঁর মাথা না ঘামালেও চলে। ব্যাপারটা চমৎকার এক ডাইভারশন। আগুন নিয়ে ব্যস্ত সবাই, নিশ্চিন্তে চলে যেতে পারবেন তিনি। কিন্তু কেন যেন মনের সাড়া পেলেন না। তিনটি অবোধ শিশু মরতে বসেছে... কিন্তু কেন? ওদের মৃত্যুতে কী লাভ হবে রাজতন্ত্রের বা প্রজাতন্ত্রের? ওরা তো কোনও পক্ষেরই নয়।

পকেটে হাত দিয়ে সেতুর চাবিটা স্পর্শ করলেন লঁতেনাক। চোয়াল শক্ত হয়ে গেল তাঁর। উল্টো ঘুরে হাঁটতে শুরু করলেন ফেলে আসা পথে। গুপ্তসুড়ঙ্গ ধরে দুর্গে ফিরে যাবেন।

উপরে তখন আগুনের সঙ্গে প্রাণান্তকর লড়াই চালাচ্ছে সৈনিকেরা। নদী থেকে পানি তোলার সময় নেই, যে-যার খাওয়ার পানির বোতল খালি করে ফেলেছে, দুর্গের ভিতর থেকেও আনা হয়েছে পানির কলসি... সব ছুঁড়ে দেয়া হচ্ছে আগুনের দিকে। কিন্তু তাতে কী আর এই লেলিহান শিখা থামে?

হতাশায় মাথা চেপে মাটিতে বসে পড়ল মিশেল, গিরিখাতের কিনার ঘুরে এরই মধ্যে সেতুর এ-পারে এসে পড়েছে সে। কাঁদছে অঝোর ধারায়। পরাজিত ভঙ্গিতে গুভাঁ আর সিমুর্দাও পিছিয়ে এসেছে, কিংকর্তব্য ঠিক করতে পারছে না। ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে জ্বলন্ত সেতুর সামনে ছোটাছুটি করছে রাদু। হঠাৎ শোনা গেল বজ্রকঠিন গলা।

'সরো, পথ দাও আমাকে।'

ঝট্ করে মানুষটার দিকে তাকাল সবাই।

'লঁতেনাক!' চমকে উঠে বলল সিমুর্দা।

কারও দিকে তাকালেন না বৃদ্ধ মাহ্খি। সোজা এগিয়ে গেলেন সেতুর দিকে। হাতে চাবি নিয়ে খুলে ফেললেন দরজার

তালা, ঢুকে গেলেন জ্বলন্ত অগ্নিশিখার ভিতরে। মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে রইল সবাই।

একটু পরেই দোতলার খোলা জানালায় উঁকি দিল লঁতেনাকের মুখ। কালি-ঝুলিতে সর্বাঙ্গ কালো হয়ে গেছে, গায়ের পোশাক থেকে উড়ছে ধোঁয়া। চেঁচিয়ে বললেন, 'একটা দড়ি দরকার আমার।'

ছুঁড়ে দেয়া হলো দড়ির গোছা। ওটার এক প্রান্ত দোতলার একটা পিলারে বাঁধলেন লঁতেনাক, অন্যপ্রান্ত ফেলে দিলেন নীচে। দড়িটা কোনাকুনিভাবে টান টান করে ধরল সৈনিকেরা। জর্জেতকে এক হাতে কোলে নিলেন মাহ্‌খি, গুনেজাঁ আর গোয়াঁইলাকে তাঁর গলা ধরে পিঠে ঝুলতে বললেন। তারপর ওদেরকে সহ দড়িতে পিছলে নেমে এলেন নীচে।

হাততালি দিয়ে উঠল সবাই। মিশেল ছুটে এল। বাচ্চাদের জড়িয়ে ধরে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিল তাদের।

রাদু স্লোগান দিল, 'মাহ্‌খি দীর্ঘজীবী হোন!'

'না,' মাথা নাড়লেন লঁতেনাক। 'রাজা দীর্ঘজীবী হোন।'

কৃতজ্ঞ চোখে তাঁর দিকে তাকাল রাদু 'আপনি সাক্ষাৎ দেবদূত, সেনিয়োখ্‌। এতদিন যা-ই করে থাকেন না কেন, এখন আপনার সত্যিকার চেহারা প্রকাশ পেয়ে গেছে।'

'কিছুই প্রকাশ পায়নি। আমি এখনও রাজার একান্ত ভৃত্য, তোমাদের খতম করে তাঁকে ফের সিংহাসনে বসাতে চাই।'

'যত খুশি বাজে বকুন, আপনি দয়ার সাগর

গুভাঁ কিছু বলল না। শুধু মাথা ঝাঁকাল লঁতেনাকের দিকে চেয়ে।

ভিড়ের মাঝ থেকে এবার এগিয়ে এল সিমুর্দা। হাত রাখল লঁতেনাকের কাঁধে। 'আপনাকে গ্রেফতার করছি আমি,

সেনিয়োখ্।'

আগুনে শরীরের বিভিন্ন জায়গা ঝলসে গেছে লঁতেনাকের, জ্বালাপোড়া করছে... তারপরেও তিনি হাসলেন। 'অন্য কিছু আমি আশাও করিনি।'

তেইশ

দুর্গের নীচতলায়, যে-হলঘরে আজ সন্ধ্যায় যুদ্ধ হয়েছে, তার পাশের একটা কামরায় তৈরি করা হলো অস্থায়ী কারাগার। লঁতেনাককে নিয়ে যাওয়া হলো ওখানে। মেঝেতে খড়ের বিছানা পেতে দেয়া হলো তাঁর শোয়ার জন্য। খাবার হিসেবে দেয়া হলো কয়েকটা রুটি আর এক জগ পানি।

রাত তখন এগারোটা। গুভাঁর কাছে গিয়ে সিমুর্দা বলল, 'আমি কোর্ট-মার্শাল ডাকছি। তাতে থাকবে তিনজন বিচারক—আমি, গিশঁম আর রাদু। প্রধান বিচারকের দায়িত্বটা আমিই নেব। তোমাকে রাখলাম না, কারণ লঁতেনাক তোমার আত্মীয়। আমরা কনভেনশনের বিধান অনুসারে চলব। পরিচয় নিশ্চিত করে শাস্তি দেব অভিযুক্তকে। বেশি সময় নেব না। আগামীকাল বিচার, তার পরদিন গিলোটিনে শিরশ্ছেদ।'

এর উত্তরে কিছুই বলল না গুভাঁ। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে এল দুর্গ থেকে। বনের ধারে নিজের তাঁবুর সামনে গিয়ে বসল।

সেতুতে তখনও আগুন জ্বলছে। রাতের নীরবতার মাঝে শোনা যাচ্ছে কড়ি-বরগা পোড়ার আওয়াজ। সৈনিকরা আহতদের সেবা-শুশ্রূষা করছে, কবর খুঁড়ছে নিহতদের জন্য—গিশঁম তদারক করছে সেসব কাজ। রাদু গেছে মিশেল আর তার সন্তানদের কাছে। একাকী বসে থাকতে থাকতে উদাস হয়ে গেল গুভাঁ।

একটা কথাই কানে বাজছে ওর—আগামীকাল বিচার, তার পরদিন গিলোটিন। আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনও সুযোগ নেই লঁতেনাকের। ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে তাঁর। সেটা কি উচিত? মানুষটা শেষ পর্যন্ত যে-মহত্ত্ব দেখাল, এর বিনিময়ে অন্তত প্রাণে বাঁচার কি কোনও অধিকার নেই তাঁর? যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিলেও তো চলে। মৃত্যুদণ্ডের দরকার কী?

দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগতে শুরু করল গুভাঁ। ওর মনের ভিতরে যে-আদর্শ এতকাল অটল-অক্ষয় ছিল, তা দুলতে শুরু করেছে হঠাৎ করে। এতদিন মনে-প্রাণে প্রজাতন্ত্রী ছিল ও, কিন্তু এখন কেন যেন মনে হচ্ছে, বিপ্লব আর জনতার শাসনের চেয়েও বড় হলো মনুষ্যত্ব... মানবতা।

প্রত্যেক মানুষের জীবনে একটা করে ভিত্তিভূমি থাকে। সেই ভিত্তিভূমি যদি কোনও কারণে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, তা হলে বিপন্ন হয়ে ওঠে সমগ্র অস্তিত্ব। গুভাঁর মনে হলো, আজ ওর জীবনের সেই ভিত্তিভূমি তছনছ হয়ে গেছে। দু'হাতে মাথা চেপে ধরে মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পাবার সমাধান খুঁজতে থাকল। ও এমন এক সত্যকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে, যা ওকে এই বেদনাময় অবস্থা থেকে উদ্ধার করবে... ওকে সঠিক পথ বাতলে দেবে।

জীবনে অনেক যুদ্ধ করেছে গুভাঁ, অনেক যুদ্ধ দেখেছে। কিন্তু

আজ রাতে যে-যুদ্ধ দেখেছে, তা আগে কখনও প্রত্যক্ষ করা তো দূরে থাক, কল্পনারও অতীত ছিল। আজ ও দেখেছে ভালর সঙ্গে মন্দের, শুভর সঙ্গে অশুভর এক অপার্থিব দ্বন্দ্ব, যেখানে শেষ পর্যন্ত শুভ জয়ী হয়েছে। জয়ী হয়েছে মানবতা। গুভাঁ কিছুতেই বুঝতে পারছে না কীভাবে সম্ভব হলো এই জয়? কেমন করে ক্রোধ আর ঘৃণার বিশাল পাহাড়টাকে ফাটিয়ে দিয়ে তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল মানবতা আর মমতার এক স্বতস্ফূর্ত নদী?

গুভাঁর দু'চোখে যেন ধাঁধা লেগে গেছে শাশ্বত সত্যের এক উজ্জ্বল ছায়ামূর্তি দেখতে পেয়ে। মূর্তিটা লঁতেনাকের... লঁতেনাকের বিবেকের। ওর মনে হচ্ছে, বৃদ্ধ মাহ্খির সঙ্গে নতুন এক লড়াইয়ে নামতে হবে তাকে। তবে সে-লড়াই মানুষে মানুষে নয়, বরং বিবেকের সঙ্গে বিবেকের। এই লড়াইয়ের ময়দান হবে ওর আত্মা।

চিন্তায় ডুবে গেল গুভাঁ। ও এমন এক দেশের স্বপ্ন দেখে, যেখানে কোনও গৃহযুদ্ধ থাকবে না... থাকবে না অপরাধ, ঘৃণা, বা প্রতিহিংসা। অথচ প্রজাতন্ত্রের আন্দোলন এখন পর্যন্ত সে-স্বপ্ন সফল করতে পারেনি। বরং রাজতন্ত্রী হয়েও ওর স্বপ্নের বাস্তব রূপ দেখিয়ে দিয়েছেন লঁতেনাক। হিংসা-ক্রোধ ত্যাগ করে ফিরে এসেছেন তিনি, তিনটি শিশুর জীবন বাঁচানোর জন্য। এই কাজ করতে গিয়ে যে ধরা পড়বেন, তা জানতেন। অথচ ভয় পাননি। অথচ যে-মানুষটা এতবড় আত্মত্যাগের উদাহরণ স্থাপন করল, তাকেই শূলে চড়াবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে সিমুর্দা। এটাই কি বিপ্লব? এটাই কি প্রজাতন্ত্রের আদর্শ? যারা সত্যের জন্য সংগ্রাম করছে, যারা নিজেদেরকে সত্যের সৈনিক বলে পরিচয় দেয়... তাদের মধ্যে কি ক্ষমা বা অনুগ্রহ বলে কোনও কিছু অস্তিত্ব থাকতে পারবে না? বিপ্লবীদের সংগ্রামে কি উদারতা বা মহত্ত্বের

স্থান থাকবে না? রাজতন্ত্রের সমর্থকরা অসহায় আর্ত মানুষকে উদ্ধার করবে, আর প্রজাতন্ত্রীরা তার পুরস্কার দেবে শিরশ্ছেদ করে? এতে কারা মহিমান্বিত হবে, আর কারাই বা হবে কলঙ্কিত?

ছটফট করতে থাকল গুভাঁ। কী করে এই অন্যায় সইবে ও? তা ছাড়া লঁতেনাক ওর আত্মীয়। দু'জনের শরীরে একই পরিবারের রক্ত বইছে। লঁতেনাকের প্রতি অবিচার কি ওর প্রতিও অবিচার নয়? বিপ্লব তো মানুষকে তার রক্তের সম্পর্ক অস্বীকার করতে বলেনি। বিপ্লব শুধু মানুষকে শোষণ-পীড়ন থেকে মুক্তি দিতে চায়... সম্পর্ক থেকে নয়।

তা হলে কী করা উচিত ওর? ভেবে পেল না গুভাঁ। লঁতেনাককে মুক্তি দেবে? তা হলে ফ্রান্সের কী হবে? লঁতেনাক তো ঠিকই ইংরেজদের নিয়ে আসবেন দেশের মাটিতে, বিপন্ন করবেন স্বাধীনতা। তিন মাসের অক্লান্ত চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত ধরা হয়েছে মাহ্‌খিকে। তাঁকে মুক্তি দেয়া মানে দেশকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া... ফ্রান্সের অগণিত নাগরিককে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া... ফের নতুন করে গৃহযুদ্ধকে জাগিয়ে তোলা। লঁতেনাককে মুক্তি দেয়া মানে বন্দি একটা বাঘকে ছেড়ে দেয়া।

কেন কথাটা বিশ্বাস করতে পারছে না গুভাঁ। লঁতেনাককে আর বাঘ বলে মানতে ইচ্ছে করছে না। আজ সমস্ত বিপ্লব, যুদ্ধ-বিগ্রহ, রাজতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র আর পার্থিব দ্বন্দ্বসমস্যার ঊর্ধ্বে উঠে তিনি যে মানবতা আর পিতৃত্ববোধের পরিচয় দিয়েছেন, তার সঙ্গে ব্যাঘ্রসুলভ হিংস্রতার কোনও মিল নেই। একটি ত্যাগের মহিমা দিয়ে সারা জীবনের সমস্ত নীচতা ও বর্বরতার প্রায়শ্চিত্ত করেছেন তিনি। এখন গুভাঁর পালা সেই একই মহত্ত্ব দেখাবার... যুক্তিতে তা-ই বলে।

কিন্তু যুক্তি আর আবেগের দোলাচলে দুলছে গুভাঁ। যুক্তি বলছে লঁতেনাককে মুক্তি দিতে, আবেগ বলছে সে-কাজ করে দেশকে বিপদের মুখে ঠেলে না দিতে। এর কোনও সমাধান খুঁজে পাচ্ছে না ও। গুভাঁর মনে হলো, সীমাহীন শূন্যতায় ভরা দুটো খাদের মুখে দাঁড়িয়ে আছে ও, তার একটাতে ওকে ঝাঁপ দিতে হবে। হয় লঁতেনাককে বাঁচাতে হবে, নয়তো দেশকে। কোন্‌টা করা উচিত... কোন্‌টা ওর কর্তব্য, তা কিছুতেই বুঝতে পারছে না।

অন্য সব দায়বদ্ধতার চেয়ে কর্তব্যকে বড় করে দেখে সিমুর্দা। গুভাঁও তা-ই দেখে। কিন্তু সেই কর্তব্যকেই খুঁজে পাচ্ছে না। একদিকে দেশ আর সমাজ, অন্যদিকে এক বৃহত্তর ন্যায়-নীতি ও মানবতা, যা সব দেশ ও কালের ঊর্ধ্বে। কোন্‌টাকে ছেড়ে ও কোন্‌টাকে ধরবে?

ধীরে ধীরে গভীর হলো রাত। ঘড়িতে একটা বাজল। তাঁবুর সামনে থেকে উঠে পড়ল গুভাঁ। পায়চারি করতে লাগল দুর্গের আঙিনায়। সেতুর ধ্বংসাবশেষে তখনও অগ্নিশিখা আর ধোঁয়ার নৃত্য চলছে। হাওয়ার প্ররোচনায় কখনও লাফিয়ে উঠছে আগুন, আবার কখনও বা রাশ রাশ ধোঁয়ার চাপে হারিয়ে যাচ্ছে শিখাগুলো। সেতু তো নয়, গুভাঁর মনে হলো আসলে জ্বলছে ওর হৃদয়টাই।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল ও। আগুনের আভায় একটা ওয়াগন দেখতে পেয়েছে... কাল সন্ধ্যায় যেটা এসেছে। দুর্গের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ওটা। গিলোটিনটা নামিয়ে রাখা হয়েছে ওটার পিছন থেকে। আলো-আঁধারির মাঝে ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে প্রাণহীন যন্ত্রটাকে। ওটাকে দেখেই মনের তোলপাড় দ্বিগুণ হয়ে উঠল গুভাঁর। না, এভাবে আর চলে না... করণীয় স্থির করতে চাইলে

লঁতেনাকের সঙ্গে কথা বলতে হবে তাকে।

দুর্গে ঢুকে গেল গুভাঁ। হাজির হলো হলঘরে। কামরার দু'ধারে খড় বিছিয়ে সার বেঁধে শুয়ে আছে ক্লান্ত-অবসন্ন সৈনিকরা। গভীরভাবে ঘুমাচ্ছে সবকিছু ভুলে গিয়ে। একেই বলে যুদ্ধ। যেখানে নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে ওরা, সেখানেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে তাদের অগণিত বন্ধু ও সহযোদ্ধার রক্ত... অথচ তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই কারও।

কারাপ্রকোষ্ঠের দরজার সামনে চলে গেল গুভাঁ। ঢুলু ঢুলু চোখে এক সৈনিক পাহারা দিচ্ছে ওখানে। ওকে দেখতে পেয়েছে ঝট্ করে সিধে হলো। কপালে হাত ঠেকিয়ে স্যালিউট ঠুকল।

'দরজা খোলো,' আদেশ দিল গুভাঁ।

চাবি বের করে তালা খুলল প্রহরী। দরজা ঠেলে প্রকোষ্ঠে ঢুকে পড়ল গুভাঁ। পিছনে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল আবার।

কামরার ভিতরে টিম টিম করে একটা লণ্ঠন জ্বলছে, সেই আলোয় বৃদ্ধ মাহ্খিকে দেখতে পেল গুভাঁ—অশান্ত ভঙ্গিতে পায়চারি করছেন। ওকে ঢুকতে দেখেই থমকে দাঁড়ালেন। ক্ষণিকের জন্য ভাঁজ পড়ল কপালে, তারপরেই হাসলেন তিনি। বললেন:

'সুপ্রভাত, গুভাঁ। দয়া করে দেখা দিতে আসায় ধন্যবাদ। এতক্ষণ একা একা খুব খারাপ লাগছিল। কথা বলবার জন্য একজন মানুষ খুঁজছিলাম।'

'কিছু দরকার আপনার?' জিজ্ঞেস করল গুভাঁ। 'প্রহরীকে বললেই চলত।'

'সেরকম কিছু না। আমি আসলে বলতে চাইছিলাম যে, শুধু শুধু সময় নষ্ট করছ তোমরা। বিচার-আচারের নাটক করবার

দরকার কী? আমাকে এখুনি গিলোটিনে চড়িয়ে দাও না! পুরো করো তোমার সাফল্যের পাল্লা।'

'ওটাকে সাফল্য বলছেন আপনি?'

'নয়তো কী? প্রজাতন্ত্রীদের ধর্মই তো রাজপুরুষদের হত্যা করা... অভিজাতদের হত্যা করা। ওসব কাজ দিয়েই সাফল্য মাপো তোমরা। কিন্তু সত্যিকার অভিজাত... সত্যিকার সামন্ত কাকে বলে, তা কি তুমি জানো? কোনোদিন চোখেও দেখোনি বোধহয়। এইবার আমাকে ভাল করে দেখো। সামন্তরা হচ্ছে এমন এক শ্রেণীর মানুষ, যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, বিশ্বাস করে সামাজিক প্রথা, পরিবার আর পূর্বপুরুষের ঐতিহ্যে। রাজার প্রতি ভক্তি আর আনুগত্য, আর দেশের প্রাচীন ধর্ম, আইন আর ন্যায়বিচারের প্রতি কোনোরকম দ্বিধা নেই তাদের। দাঁড়িয়ে কেন, বসো। একদিন এই কারাগারে আমাদের পূর্বপুরুষেরা আটকে রাখতেন অপরাধী প্রজাদের... আজ সেই প্রজারাই এখানে আটকে রেখে একজন রাজপুরুষকে। এ-সবই সম্ভব হচ্ছে তোমার মত দলত্যাগীর কারণে। আমি বুঝতেই পারছি না, গায়ে রাজ-পরিবারের রক্ত থাকার পরেও কীভাবে তুমি এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারলে! কীভাবে পরিবারের নাম আর ঐতিহ্য ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারলে! অবশ্য এর জন্য আমিও কম দায়ী নই। তোমার বাবা-মা মারা যাওয়ার পর তোমাকে আমি নিজের কাছে রাখিনি... অভিজাত পরিবারের শিক্ষাগুলো দিইনি। সে-কাজের ভার ছেড়ে দিয়েছিলাম সিমুর্দার মত একটা ছোটলোকের হাতে। তুমি তো এমন হবেই!'

'আমি মনে করি না উনি আমাকে কোনও ভুল শিক্ষা দিয়েছেন।'

'দেয়নি? রক্তের সম্পর্কের একজন আত্মীয়কে হত্যা করতে

চলেছ তুমি... কে দিয়েছে এই শিক্ষা? অথচ আমাকে দেখো... তিন-তিনবার তোমাকে লক্ষ্য করে কামান তাক করেছিলাম আমি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দাগতে পারিনি সেই কামান। যুদ্ধে যদিও কোনও ক্ষমা নেই, আগুন আর তলোয়ার নিয়েই আমাদের কারবার, তবু আমি তোমাকে শত্রু হয়েও মারতে পারিনি। মনে পড়ে গেছে রক্তের সম্পর্কের কথা। সেই তুমি যোগ দিয়েছ প্রজাতন্ত্রী নামের রাজদ্রোহীদের দলে, যারা আমাদের প্রিয় রাজাকে হত্যা করেছে।'

এই কথার কোনও জবাব খুঁজে পেল না গুভাঁ।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন লঁতেনাক, বলতে থাকলেন, 'যদি ভলতেয়ার আর হুসো-কে ফাঁসিকাঠে ঝোলানো হতো, তা হলে বিপ্লব নামের এই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতো না দেশে। এসব বাজে চিন্তা ওই লোকগুলোই ঢুকিয়েছে মানুষের মাথায়। আমি বুঝি না রাজতন্ত্রের মধ্যে আপত্তিকর কী আছে।

'অস্বীকার করব না, আমাদের পক্ষের লোকেরাও অনেক বাড়াবাড়ি করেছে। কিন্তু সবাইকে এক পাল্লায় ফেলে বিচার করা উচিত নয় তোমাদের। এই আমার কথাই ধরো, সারাজীবন আমি ন্যায় ও সত্যের পথ অবলম্বন করে চলেছি। এ-ধরনের মানুষের সংখ্যাই বেশি রাজভক্তদের মাঝে। কিন্তু তুমি আর তোমার বন্ধুরা... তোমাদের পথটাই ভুল। তোমরা দেশের সৎ লোকদের উৎখাত করে তার জায়গায় মন্দ লোকদের ক্ষমতায় বসিয়েছ। শক্তি আছে তোমাদের, জনসমর্থন আছে... যা-খুশি-তাই করতে পারো। কিন্তু জেনে রেখো, পনেরোশ' বছর ধরে ফ্রান্সে যে-রাজতন্ত্র চলে এসেছে, তার অভাব কোনোদিন পূরণ করতে পারবে না। যে-সব রাজপুরুষ আর অভিজাতদের হত্যা করেছ তোমরা, তাদের স্থান তোমাদের নেতারা কোনোদিনই নিতে

পারবে না।

'ভাল করে ভেবে দেখো, আসলে কী তোমরা? নির্বিচারে মানুষ খুন করে চলেছ, পদদলিত করছ সমস্ত প্রাচীন প্রথা আর আইন, ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছ ঈশ্বরের বেদিগুলো। এসব হচ্ছে বিশ্বাসঘাতক আর কাপুরুষদের কাজ। ভক্তি, বিশ্বাস, ত্যাগ... মানবচরিত্রের মহান এসব গুণের কোনোটাই তোমাদের মধ্যে নেই। এসবের অভাবই শেষ পর্যন্ত ধ্বংস করবে তোমাদেরকে। যাক গে, এ-নিয়ে ভাষণ দিয়ে আর লাভ নেই। যে-কাজে এসেছ, সেটা সম্পন্ন করো, গুভাঁ। আমাকে হত্যা করো!'

লঁতেনাকের কথাগুলো গুভাঁর অন্তরের অন্তস্তলে তীব্র আলোড়ন তুলল। মাথা হেঁট হয়ে গেল ওর। বুঝতে পারল, বৃদ্ধ মাহ্খি যা বলছেন তা একেবারে ভুল নয়। যে-আদর্শের কথা ভেবে বিপ্লবে যোগ দিয়েছিল ও, এখন আর সেই আদর্শের অস্তিত্ব নেই ওদের প্রজাতন্ত্রে। এখনও এতে সমর্থন দিয়ে যাওয়া মানে অন্যায়কে সমর্থন দেয়া।

খানিক পর মুখ তুলে লঁতেনাকের দিকে তাকাল ও। চেহারায় আমূল পরিবর্তন এসেছে। শান্ত গলায় বলল, 'আপনি মরবেন না, চাচা। অন্তত আমার দেহে যতক্ষণ প্রাণ আছে, ওদেরকে এই অবিচার করতে দেব না আমি।'

ভুরু কোঁচকালেন লঁতেনাক। 'মানে?'

'আপনি মুক্ত। চলে যান এখান থেকে।'

'কীভাবে? সিমুর্দা আমাকে যেতে দেবে ভেবেছ?'

'ওঁর কিছু জানার প্রয়োজন নেই।' গা থেকে নিজের কোট খুলে ফেলল গুভাঁ। মাহ্খি আর ওর শরীরের মাপ একই রকম, ওটা পরিয়ে দিল তাঁকে। নিজের টুপি খুলে পরিয়ে দিল তাঁর মাথায়।

‘এ কী করছ তুমি?’ বিস্মিত গলায় বললেন লঁতেনাক।

‘ন্যায়ের পথ বেছে নিচ্ছি,’ বলল গুভাঁ। ‘চলে যান আপনি। পোশাকের কারণে সবাই ভাববে আমিই যাচ্ছি। টুপিটা একটু নামিয়ে রাখবেন, যাতে চেহারা দেখা না যায়। বনে ঢোকার আগে কথা বলবেন না কারও সঙ্গে, ঠিক আছে? এমনিতেই এখন গভীর রাত, সবাই ঘুমাচ্ছে... আশা করি কোনও অসুবিধে হবে না।’

‘কিন্তু... কিন্তু...’ কথা আটকে যাচ্ছে লঁতেনাকের, ‘...আমি চলে গেলে তোমার কী হবে?’

‘আমাকে নিয়ে ভাববেন না, আপনি নিজেকে বাঁচান।’

‘ওরা তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেবে, গুভাঁ।’

‘আদর্শ আর মানবতাকে বিকিয়ে দিয়ে কাপুরুষের মত বাঁচতে চাই না আমি। তারচেয়ে বীরের মত মরা অনেক ভাল। আর কথা নয়, দেরি হয়ে যাচ্ছে।’ দরজার কাছে গিয়ে টোকা দিল গুভাঁ। প্রহরী দরজা খুলে ধরতেই লঁতেনাককে ঠেলে প্রকোষ্ঠ থেকে বের করে দিল ও।

বাইরে পা রেখে ক্ষণিকের জন্য স্থাণু হয়ে গেলেন লঁতেনাক। ভাইপোকে মৃত্যুর মুখে ফেলে রেখে যেতে মন চাইছে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে টের পেলেন, ঢিল ছোঁড়া হয়ে গেছে, এখন আর তাকে ফেরানোর উপায় নেই। লঁতেনাক যদিও না-ও পালান, গুভাঁর অভিসন্ধি জেনে ফেলবে সবাই, শাস্তি দেয়া হবে ওকে। তাতে ব্যর্থ হয়ে যাবে অকুতোভয় যুবকটির আত্মত্যাগ।

তাড়াতাড়ি কোটের কলার তুললেন বৃদ্ধ মাহ্‌খি। টুপিটা একটু নিচু করে ঢাকলেন নিজের চেহারা। তারপর দ্রুত পা ফেলে বেরিয়ে এলেন দুর্গ থেকে। কেউ তাঁকে বাধা দিল না। পোশাক দেখে সবাই তাঁকে গুভাঁ বলে ভাবল, কেউ কেউ

স্যালিউটও দিল। পাল্টা স্যালিউট দিয়ে বনের ভিতরে ঢুকে পড়লেন তিনি। একটু পরেই হারিয়ে গেলেন অন্ধকারে।

কারাপ্রকোষ্ঠে রয়ে গেল গুভাঁ। অদ্ভুত এক প্রশান্তি নিয়ে খড়ের বিছানায় শুয়ে পড়ল ও। এখন আর ঘুমাতে অসুবিধে হবে না ওর।

চব্বিশ

সকাল হলো। দুর্গের হলঘরে সাজানো হলো আদালত। বড় টেবিলের ওপাশে বিচারকদের তিনটা চেয়ার, উল্টোদিকে খানিক দূরত্ব বজায় রেখে একটি কাঠের টুল—ওখানে অভিযুক্তকে বসানো হবে। টেবিলের দু'পাশে আরও দুজনের বসার ব্যবস্থা থাকল—একজন হলো কমিশনার-অডিটর... আইন বিষয়ক মতামত দেবার জন্য; অন্যজন আদালতের রেজিস্ট্রার... বিচারের পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করবে সে।

দুপুরবেলায় শুরু হলো বিচারের কাজ। প্রথমে আসন গ্রহণ করল তিন বিচারক—সিমুর্দা, গিশঁম আর রাদু। তারপর ডেকে পাঠানো হলো বন্দিকে।

কারাপ্রকোষ্ঠের দরজা খুলে বন্দিকে আদালতে নিয়ে এল দু'জন প্রহরী। মাথা নিচু করে রেখেছিল সে, বিচারকদের সামনে পৌঁছে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তার চেহারা দেখে ভ্রূকুটি করল

সিমুর্দা।

'গুভাঁ! তুমি এখানে কী করছ? আমি বন্দিকে আনতে বলেছি।'

গুভাঁ বলল, 'আমিই এখন বন্দি।'

'তুমি!'

'হ্যাঁ, আমি।'

'আর লঁতেনাক?'

'উনি পালিয়ে গেছেন।'

'পালিয়ে গেছে? কীভাবে?' সিমুর্দা হতভম্ব। 'প্রকোষ্ঠের ভিতরে কোনও গোপন সুড়ঙ্গ ছিল?'

'না, তাকে বাইরে থেকে সাহায্য করা হয়েছে।'

'কে সাহায্য করেছে?'

'আমি।'

'কী!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সিমুর্দা।

'হ্যাঁ, আমিই সাহায্য করেছি লঁতেনাককে,' বলল গুভাঁ। 'কারাপ্রকোষ্ঠে ঢুকে আমার পোশাক পরিয়ে দিয়েছি, তারপর নিজে ভিতরে থেকে বের করে দিয়েছি তাঁকে। রাতের বেলা ঘটেছে এই ঘটনা, অন্ধকারে কেউ বুঝতে পারেনি প্রকোষ্ঠ থেকে কে বেরুল। এতক্ষণে আপনাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেছেন তিনি।'

ফ্যাল ফ্যাল করে টেবিলে উপবিষ্ট সঙ্গীদের সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় করল সিমুর্দা। সবাই মুখের ভাষা হারিয়েছে। ছাত্রের দিকে আবার দৃষ্টি ফেরাল সে। বিড়বিড় করে বলল, 'আ... আমি বিশ্বাস করি না তুমি এ-কাজ করেছ।'

'করেছি, গুরু।'

'কিন্তু... কিন্তু এ যে অসম্ভব!'

‘এটা সত্য।’

‘ঠাট্টা-মশকরার সময় নয় এটা, গুভাঁ। লঁতেনাককে নিয়ে এসো।’

‘বললাম তো উনি এখানে নেই। বহুদূরে চলে গেছেন।’

‘তুমি কি পাগল হয়ে গেছ?’

‘না। যা ঘটেছে ঠিক তা-ই বলছি আপনাদের।’

‘যদি সত্যিই এমনটা করে থাকো, তা হলে শাস্তি পেতে হবে তোমাকে!’

‘জানি, মৃত্যুদণ্ড।’

শব্দটা শোনামাত্র মুখ থেকে রক্ত সরে গেল সিমুর্দার। পুত্রসম ছাত্রটির ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে। আর সেটা নিশ্চিত করতে হবে তাকেই!

কয়েক মুহূর্ত নীরবতা বিরাজ করল। তারপর নিজেকে সামলে নিল প্রাক্তন যাজক। গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, ‘বেশ, তা হলে এই আদালত আজ তোমার বিচারই করবে। প্রহরীরা, অভিযুক্তকে তার আসনে বসাও।’

টেবিলের মুখোমুখি টুলে বসল গুভাঁ।

‘বিচারকাজ শুরু করা যাক,’ আনুষ্ঠানিক ভঙ্গিতে বলল সিমুর্দা। ‘অভিযুক্ত, তোমার নাম-পদবী বলো।’

‘আমি ক্যাপ্টেন গুভাঁ। গণফৌজের উপকূলীয় দলের অধিনায়ক।’

‘যে-বন্দি পালিয়ে গেছে, তার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক আছে তোমার?’

‘একই পরিবারের মানুষ আমরা। সম্পর্কে তিনি আমার চাচা।’

‘তুমি কনভেনশনের জারি করা বিধান জানো?’

'জানি।'

'এই বিধান সম্পর্কে তোমার কিছু বলার আছে?'

'না। এই এলাকায় আমি নিজেই এই বিধান প্রচার করেছি... সবাইকে তা মেনে চলার আদেশ দিয়েছি।'

'তা হলে তোমার পক্ষে যুক্তিতর্ক উপস্থাপনের জন্য একজন উকিল ঠিক করো।'

'আদালতের আপত্তি না থাকলে আমি নিজেই আত্মপক্ষ সমর্থন করতে চাই।'

'আপত্তি নেই। বলো কী বলবে।'

একটু সময় চুপ থেকে নিজের কথা গুছিয়ে নিল গুভাঁ। তারপর বলল, 'আমি যে-অপরাধ করেছি, তা করেছি সম্পূর্ণ বিবেকের তাড়নায়, আবেগের বশে। দোষী লোকটার ভাল কাজ আমাকে তার অতীত অপরাধগুলোর কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল। নিজের জীবন বিপন্ন করে তিনটি শিশুকে জীবন্ত দগ্ধ হওয়া থেকে উদ্ধার করেছেন তিনি... আর কাজটা করেছেন কোনও ধরনের প্রতিদান পাবার আশা না করে। হ্যাঁ, আমাদের অনেক ক্ষতি করেছেন লঁতেনাক—খুন করেছেন প্রজাতন্ত্রী সৈন্যদের, জ্বালিয়ে দিয়েছেন গ্রামের পর গ্রাম, বিদেশি শক্তির সাহায্য নিয়ে উৎখাত করতে চেয়েছেন প্রজাতন্ত্রী সরকারকে। কিন্তু কাল সন্ধ্যায় যা তিনি করেছেন, তার সামনে বাকি সবকিছু গৌণ বলে মনে হয়েছে আমার কাছে। এমন মহান একজন মানুষকে শাস্তি দেয়া মস্ত বড় এক অন্যায় বলে মনে হচ্ছিল, তাই তাঁকে মুক্তি দিয়েছি আমি। জানি, আইনের চোখে ওটা অপরাধ... তাই অপরাধ স্বীকার করে নিচ্ছি আমি। আর কিছু না হোক, এতে আমার আত্মসম্মান অক্ষুণ্ন থাকছে।'

'এ-ই তোমার বক্তব্য?' জিজ্ঞেস করল সিমুর্দা।

'হ্যাঁ। একজন সামরিক নেতা হিসেবে আমি একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছি। এবার বিচারক হিসেবে আপনি আপনার দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন।'

'কোন্ দৃষ্টান্তের কথা বলছ?'

'আমার মৃত্যুদণ্ডের।'

'তুমি সেটাকে ন্যায়সঙ্গত ভাবছ?'

'শুধু ন্যায়সঙ্গতই নয়, প্রয়োজনীয়ও মনে করি।'

গম্ভীর হয়ে গেল সিমুর্দা। কমিশনার-অডিটরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার আইনি মতামত দাও।'

'এখানে ঘোরানো-প্যাঁচানোর কিছু নেই,' বলল কমিশনার-অডিটর। 'কনভেনশনের বিধানে স্পষ্টভাবে লেখা আছে—প্রজাতন্ত্রী কোনও সৈনিক বা যোদ্ধা যদি বিদ্রোহী কোনও বন্দিকে হাতে পেয়েও ছেড়ে দেয়, তা হলে তাকে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করতে হবে।'

'হুম,' মাথা ঝাঁকাল সিমুর্দা। 'এবার তা হলে ভোটাভুটিতে যাব আমরা। সহ-বিচারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আইনের বিধান তোমরা শুনলে, এবার তোমাদের মতামতের পালা। ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অনুসারে রায় দেয়া হবে। গিশঁম, তুমিই শুরু করো।'

মূর্তির মত বসে ছিল গিশঁম। এবার নড়েচড়ে বলল, 'আইনের বিধান অমোঘ, অপরিবর্তনীয়। বিচারক হিসেবে সাধারণ মানুষের চেয়ে ঊর্ধ্বে থাকতে হবে আমাকে। আবেগ-অনুভূতিকে প্রশ্রয় দেয়া উচিত হবে না। ক্যাপ্টেন গুভাঁকে আমি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তাই বলে আইনের ব্যত্যয় সমর্থন করতে পারি না। তা ছাড়া লঁতেনাককে মুক্তি দিয়ে দেশকে মস্ত বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছেন তিনি। ব্যর্থ করে দিয়েছেন আমাদের এতদিনের লড়াই...

এতদিনের রক্তক্ষয়। তিনি অপরাধী, দোষী। কাজেই আমি তাঁর মৃত্যু চাই।'

'রেজিস্ট্রার, লেখো মৃত্যুদণ্ড,' নির্দেশ দিল সিমুর্দা।

লিখল রেজিস্ট্রার—*গিশঁম: মৃত্যুদণ্ড।*

'সঠিক ভোট দিয়েছ তুমি, গিশঁম,' বলল গুভাঁ। 'ধন্যবাদ।'

'এবার সার্জেণ্ট রাদুর পালা,' বলল সিমুর্দা।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রাদু, সামরিক কায়দায় সালাম দিল গুভাঁকে। তারপর বলল, 'এ-ই যদি আপনাদের বিচার হয়, তা হলে তো একটু পরে লঁতেনাক আর আমাদের এই সেনাপতির পক্ষে আমি যা বলব, তাতে আমারও ফাঁসি হবে! তবু বলি, আমাদের ওই বৃদ্ধ শত্রু যখন আগুনে ঝাঁপ দিয়ে তিনটা বাচ্চাকে উদ্ধার করল, আমি তাকে সাহসী বীর হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছি। ক্যাপ্টেন গুভাঁ যদি সেই বীরকে মুক্তি দিয়ে থাকেন, তা হলে তাঁকে আমি সত্যিকার নেতা হিসেবে মেনে নিচ্ছি। যদি সেইণ্ট লুইয়ের ক্রুশ দেবার ক্ষমতা থাকত আমার, তা হলে এঁদেরকে তা-ই দিতাম। কী করতে চলেছি আমরা? ক্যাপ্টেন গুভাঁর মত একজন দুর্ধর্ষ সেনাপতিকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে চাইছি! এমন একজন মানুষকে পদোন্নতি না দিয়ে তাঁর মাথা কেটে ফেলতে চাইছি! কেন? মানবতা দেখিয়েছেন বলে? আরেক বীরের কীর্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন বলে? এভাবে যদি চলতে থাকে... যদি ভাল কাজের জন্য মানুষকে গিলোটিনে চড়ানো হয়... তা হলে শেষ পর্যন্ত একটা ভাল মানুষও দেশে অবশিষ্ট থাকবে ভেবেছেন? আমি রাজনীতি বুঝি না, কনভেনশন বুঝি না... কিন্তু এটুকু বুঝতে পারছি, ওসব মেনে চললে গতকাল সন্ধ্যায় তিনটা শিশুকে জীবন্ত দগ্ধ হতে দিতে হতো... লঁতেনাকের মাথা কাটতে হতো। তাতে কী গৌরব অর্জন করতাম আমরা? না,

আমি এসব সমর্থন করতে পারছি না। আপনারা যা খুশি বলতে পারেন, কিন্তু আমার ক্যাপ্টেন কোনও অপরাধ করেননি। আমি তাঁর মৃত্যু চাই না।'

'তুমি তা হলে ওর মুক্তি চাও?' জিজ্ঞেস করল সিমুর্দা।

'আমি চাই ওঁকে প্রজাতন্ত্রের প্রধান করা হোক!'

'বাজে বোকো না,' বিরক্ত হলো সিমুর্দা। 'যা জিজ্ঞেস করছি তার জবাব দাও। তুমি ওর মুক্তির সপক্ষে ভোট দিচ্ছ?'

'হ্যাঁ। প্রয়োজনে ওঁর বদলে আমার মাথা কেটে নিন আপনারা।'

'রেজিস্ট্রার, লেখো মুক্তি।'

লিখল রেজিস্ট্রার—*রাদু: মুক্তি।*

রায় এবার পুরোপুরি নির্ভর করছে সিমুর্দার উপরে। সে যেদিকে ভোট দেবে, সেদিকই সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে। উঠে দাঁড়াল সে।

থমথমে গলায় বলল, 'অভিযুক্ত গুভাঁ, আমাদের বিচারকাজ শেষ। প্রজাতন্ত্রের নামে অনুষ্ঠিত এই সামরিক আদালত তার বিচারকদের মতামতের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে...' একটু থামল সিমুর্দা, উদ্গত আবেগ সামাল দিতে ঠোঁট কামড়ে ধরল। পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে শেষ করল বাক্যটা, '...তোমাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করছে। কারণ ওটাই আমার ভোট।' কথাটা বলতে বলতে বিষাদে ছেয়ে গেল তার চেহারা।

হাসল গুভাঁ 'আমি এই রায় মেনে নিচ্ছি।'

সকরুণ চোখে ওর দিকে তাকাল সিমুর্দা। 'আগামীকাল সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে গিলোটিনে তোমার শিরশ্ছেদ করা হবে।'

উঠে দাঁড়াল গুভাঁ। 'আদালতকে ধন্যবাদ।'

'প্রহরীরা, আসামীকে কারাগারে নিয়ে যাও।'

গুভাঁকে হলঘর থেকে বের করে নিয়ে গেল দুই প্রহরী। ধপ্ করে চেয়ারে বসে পড়ল সিমুর্দা। মুখ ঢাকল দু'হাতে।

দাবানলের মত খবরটা ছড়িয়ে পড়ল সৈন্যশিবিরে। ক্যাপ্টেন গুভাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে! প্রতিবাদে ফেটে পড়ল সবাই। এতদিন গুভাঁর সমালোচকের অভাব ছিল না, কিন্তু এবার ওরা বুঝতে পারছে, অকুতোভয় যুবকটি আসলে কতখানি মূল্যবান তাদের জন্য। ওর কারণেই বিদ্রোহীদের দখলমুক্ত হয়েছে বহু গ্রাম আর জনপদ, ওর কারণেই এতদিন ফ্রান্সের উপকূলে অবতরণ করতে পারেনি ইংরেজ সেনারা। ভঁদির যুদ্ধে প্রজাতন্ত্রীদের টিকিয়ে রেখেছিল ও-ই, শক্ত হাতে দমন করেছিল বিদ্রোহীদের। এমন একজন সেনানায়ককে মৃত্যুদণ্ড দেবার সাহস পেল সিমুর্দা? কারণ কী? কারণ তিনি তিনটি শিশুর জীবনরক্ষার কারণে একজন বৃদ্ধকে মুক্তি দিয়েছেন। স্রেফ জেদের বশে তার প্রতিশোধ নিচ্ছে সিমুর্দা।

তবে এইসব প্রতিবাদের ফলে আদালতের সিদ্ধান্ত নড়চড় হলো না। নাগরিক নিরাপত্তা পরিষদের সমর্থনপুষ্ট সিমুর্দার ক্ষমতা অসীম, প্রকাশ্যে তার বিরোধিতা করে মরবার সাহস নেই কারও। প্রতিবাদের কলরব সীমাবদ্ধ রইল সৈনিকদের তাঁবুর মাঝে... শিবিরের ভিতরে।

ধীরে ধীরে রাত গভীর হলো। দুর্গের হলঘরে ঘুমিয়ে পড়ল সৈনিকরা। সবাই ঘুমিয়ে গেলে লণ্ঠন হাতে কারাপ্রকোষ্ঠের সামনে হাজির হলো সিমুর্দা। ইশারায় প্রহরীকে দরজা খুলতে বলল। একটু পর ঢুকে পড়ল প্রকোষ্ঠে।

ভিতরটা অন্ধকার ও নিঝুম। নিস্তব্ধ ঘরটায় গুভাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসের ছন্দায়িত শব্দ ছাড়া আর কোনও আওয়াজ

নেই—ঘুমাচ্ছে ও। মেঝের উপর লণ্ঠনটা নামিয়ে রাখল সিমুর্দা এগিয়ে গেল গুভাঁর দিকে, হাঁটু গেড়ে বসল ওর পাশে। ঘুমন্ত মুখটার দিকে তাকিয়ে বুকটা অব্যক্ত এক যন্ত্রণায় দুমড়ে-মুচড়ে যেতে শুরু করল। শেষ পর্যন্ত গুভাঁর একটা হাত তুলে চুমো খেলো সে।

সঙ্গে সঙ্গে চোখ মেলল তরুণ ক্যাপ্টেন। বসতে বসতে বলল, 'ও, আপনি, গুরু? আমি ভাবলাম বুঝি মৃত্যু চুমো খাচ্ছে আমার হাতে।'

কিছু বলতে পারল না সিমুর্দা। অস্ফুট গলায় শুধু নাম ধরে ডাকল ছাত্রকে। 'গুভাঁ!'

পরস্পরের চোখে চোখ রেখে চুপচাপ বসে রইল দু'জনে। বিষাদের কালো মেঘ ছেয়ে রেখেছে সিমুর্দার চেহারাকে। তা লক্ষ করে একটু হাসল গুভাঁ। বলল, 'আপনি এত কষ্ট পাচ্ছেন কেন, গুরু? আমি তো আপনাকে কোনও রকম দোষারোপ করছি না। এক জীবনে অনেক করেছেন আপনি আমার জন্য। পিতার ভালবাসা, শিক্ষক হিসেবে শিক্ষা... সবই দিয়েছেন আপনি আমাকে। স্রেফ এক অভিজাত হিসেবে জন্ম নিয়েছিলাম আমি, আপনি আমাকে মানুষ বানিয়েছেন। আপনিই দিয়েছেন আমাকে চিন্তাশক্তি, মানবিক বাস্তবতাবোধ, সত্যের চাবিকাঠি। এই ঋণ শোধ হবার নয়। আজ যা করেছেন, তাও কর্তব্যের খাতিরে... নিয়ম-শৃঙ্খলাকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য। আমার কোনও অভিযোগ নেই তাতে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল সিমুর্দা। বলল, 'রাতে কিছু খাওনি শুনলাম। একটু খাবার নিয়ে এসেছি। খাবে?'

'এখন আর খাওয়া-দাওয়া! তাও আপনি যখন কষ্ট করে এনেছেন, দিন।'

আলখাল্লার ভিতর থেকে রুটি বের করে দিল সিমুর্দা। জগ থেকে পানি ঢেলে রাখল গুভাঁর সামনে। সব খেয়ে নিল তরুণ ক্যাপ্টেন। সবশেষে পানি খেয়ে বলল, 'ধন্যবাদ, গুরু।'

'ধন্যবাদ দেবার কিছু নেই। এটাও আমার কর্তব্য।'

দেয়ালে হেলান দিয়ে বসল গুভাঁ। বড় করে শ্বাস ফেলে বলল, 'যা কিছু ঘটছে, তাতে আমি কাউকেই দোষ দিচ্ছি না। বিপ্লব মানে অস্থিরতা, সবকিছু ঠিকঠাক চলতে পারে না এমন পরিস্থিতিতে। বিশেষ করে এই বছরটা... মানে ১৭৯৩... আমার তো মনে হয় এটাই দেশের ইতিহাসে বিশেষ একটা জায়গা দখল করে রাখবে। এই বছরেই বর্বরতার ভিত্তির উপরে আমরা নতুন এক সভ্যতার জন্ম দিচ্ছি।'

'হ্যাঁ,' বলল সিমুর্দা। 'এই সভ্যতায় কর্তব্য আর অধিকার সমান্তরাল। প্রজাতন্ত্রের চেয়ে বড় আর কিছু নেই। আমাদের করনীতি সমানুপাতিক আর প্রগতিশীল। সামরিক কাজ বাধ্যতামূলক। শ্রেণীবৈষম্যের কোনও স্থান নেই এতে।'

'একে কি আদর্শ শাসনব্যবস্থা বলা যায়? গুরু, আপনি যে প্রজাতন্ত্রের কথা বলছেন তাতে ভক্তি, ভালবাসা, আত্মত্যাগ, দয়া... এসব গুণাবলীর স্থান কোথায়? আপনি সাম্য আর সমতার কথা বলছেন, কিন্তু আমি পছন্দ করি ছন্দ। আপনার প্রজাতন্ত্র সবকিছুকে মাপে, ওজন করে কিন্তু আমার স্বপ্নের প্রজাতন্ত্র মানুষকে তুলে নিয়ে যায় অসীম এক উচ্চতায়।'

'তাতে তুমি মেঘের রাজ্যে হারিয়ে যাবে।'

'আর আপনারা হারাবেন হিসাব-নিকাশের জটিল অঙ্কে।'

'সবকিছুর সমন্বয় ও ভারসাম্য হয় না, গুভাঁ। ওটা স্বপ্নের কথা।'

'আমি স্বপ্ন দেখতে ভালবাসি। স্বপ্ন মানুষকে বড় হতে

শেখায়, বড় কিছু করতে উৎসাহ জোগায়।'

'কাব্য! তুমি কাব্য করছ! আমার ওতে বিশ্বাস নেই।'

'হ্যাঁ, তা জানি। কিন্তু কাব্যে বিশ্বাস না থাকলে যে আকাশ, বাতাস, সূর্যের আলো, ফুল, বসন্তের সৌরভ, নক্ষত্রের আলো... এই সবকিছুকেই অবিশ্বাস করতে হয়!'

'ওগুলো মানুষের খিদে মেটাতে পারে না।'

'এটা ভুল বললেন। চিন্তাটাও একদিক থেকে মানুষের খোরাক। ওটাও মানুষকে পুষ্ট করে।'

'তুমি হেঁয়ালি করছ। প্রজাতন্ত্র বাস্তব সত্য। এই প্রজাতন্ত্র সমাজের সব মানুষকে তাদের প্রাপ্য বুঝিয়ে দেয়।'

'কিন্তু পার্থিব প্রাপ্য জিনিসের বাইরেও তো অনেক কিছু পাবার থাকে মানুষের। সেগুলো কে ওদেরকে দেবে?'

'আইন দিতে পারে না, এমন কী আছে?'

'আছে সাম্য, আছে ভ্রাতৃত্ব।'

'মানে?'

'আপনি বাধ্যতামূলক সামরিক কাজের কথা বললেন, কিন্তু কে কাকে মারবে? কে কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে? যুদ্ধের চেয়ে শান্তি কি ভাল নয়? সেনাবাহিনী পুষতে না হলে রাষ্ট্রীয় খরচ অনেক কমে আসবে। যে-পরিমাণ টাকা বাঁচবে, তাতে জনগণের উপর অযথা কর চাপাতে হবে না।'

'তুমি চাইছ দেশে সেনাবাহিনী থাকবে না?'

'শুধু সেনাবাহিনী নয়... বিচারক, যাজক, সরকারি আমলা... এদের কারুরই দরকার নেই। মানে... যদি শান্তি আর ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করা যায় আর কী। তার বদলে মানুষকে নামিয়ে দিতে হবে সৃষ্টিশীল কাজে। সেটা চাষাবাদও হতে পারে, বিজ্ঞানও হতে পারে, আবার শিল্প-সংস্কৃতিও হতে পারে। দেশে তখন উৎপাদন

বাড়বে, পাওয়া যাবে নতুন নতুন প্রযুক্তি আর আবিষ্কার। উন্নতির পথে বাতাসের বেগে ধেয়ে চলব আমরা।'

'আবারও সেই স্বপ্নের জগতে ফিরে গেছ তুমি। এসব বাস্তবে সম্ভব নয়।'

'চেষ্টা করতে দোষ কী? যাক গে,' কাঁধ ঝাঁকাল গুভাঁ। 'ওই তিনটা বাচ্চা আর ওদের মায়ের কী হবে?'

'ওরা মুক্ত,' বলল সিমুর্দা। 'চাইলে যেদিক খুশি চলে যেতে পারে, কিংবা আমাদের মাঝ থেকে মেয়েটি কাউকে স্বামী হিসেবে বরণ করে তার চরণদাসী হয়েও থেকে যেতে পারে।'

'দাসী কেন? নারী-পুরুষের মিলন কি সম-অধিকারের ভিত্তিতে হতে পারে না?'

'সন্তানদের দায় তা হলে কার উপর বর্তাবে?'

'লালন-পালনের দায় অবশ্যই পিতা-মাতা দু'জনেই বহন করবে। এরপর সে-দায় যাবে যেখানে ওরা বাস করবে, সেই শহর বা গ্রামের উপর। তারপর ওদের দায় নেবে দেশমাতা। সবশেষে পুরো সমাজের উপর দায় বর্তাবে।'

'তুমি ঈশ্বরের কথা বললে না?'

'ঈশ্বর এই ধাপের সর্বশেষ পর্যায়ে আছেন। তিনি তো পুরো সৃষ্টির জন্যই দায়ী।'

'তিনি কী চান বলে মনে হয় তোমার? কেন এত বিভেদ আর সমস্যা দিয়েছেন আমাদেরকে?'

'ওগুলো স্রেফ চলার পথের বাধা, গুরু। আসলে ঈশ্বর চান প্রগতি, অগ্রগতি। যদি মানুষকে উল্টোপথে হাঁটাতে চাইতেন, তা হলে আমাদের চোখদুটো সামনে না দিয়ে পিছনে দিতেন তিনি।'

ওদের কথাবার্তা শুনে মনে হতে পারে, গুরু আর শিষ্য তাদের ভূমিকা বদল করেছে। গুভাঁ আজ শিক্ষা দিতে শুরু করেছে

সিমুর্দাকে। ও যেন এক ভবিষ্যদ্বক্তা ও দূরদর্শী হয়ে অনেক কিছুই দেখতে পাচ্ছে।

সিমুর্দা বলল, 'গুভাঁ, তুমি বড্ড দ্রুত চলতে চাইছ।'

'হ্যাঁ, চাইছি। কারণ আমাদের হাতে সময় কম,' বলল গুভাঁ। 'আমরা দুজনেই আসলে স্বপ্ন দেখছি, কিন্তু আমাদের নীতি আর চিন্তাধারা ভিন্ন। আপনি চাইছেন সামরিক কাজ বাধ্যতামূলক হোক, আর আমি চাইছি বিদ্যালয়ের শিক্ষা বাধ্যতামূলক হোক। আপনি চান সব মানুষ সৈনিক হোক, আমি চাইছি সব মানুষ শিক্ষিত নাগরিক হোক। আপনি চান ওরা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠুক, আমি চাই ওরা চিন্তাশীল হয়ে উঠুক। আপনি যে-প্রজাতন্ত্রকে তলোয়ারের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন, তাকে আমি প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছি বিবেক আর চিন্তাশক্তির উপরে।'

'যতদিন না সে-প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, ততদিন তুমি কী করবে?'

'তার প্রতীক্ষায় থাকব। দুনিয়াতে না হোক, মৃত্যুর ওপার থেকে।'

'ততদিন বর্তমানকে অস্বীকার করবে?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'বর্তমানে ঝড় বইছে। এই ঝড় একটা ভাল কাজ করবে—আমাদের সভ্যতার মাঝে যত নোংরা আর্বজনা জমেছে, তা উড়িয়ে নিয়ে যাবে। ঝড়টাকে ভয় পাবার কিছু নেই। লক্ষ্য যদি অটুট থাকে, বিবেকবুদ্ধি যদি জাগ্রত থাকে, ঝড়টা আমাদের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। বরং যে-স্বপ্ন আমরা দেখছি, সেটাকে বাস্তবে পরিণত করতে সাহায্য করবে। কিছু গড়তে গেলে কিছু ভাঙতেই হয়—এটাই প্রকৃতির নিয়ম।'

'আর সমাজের নিয়ম?'

'সমাজ তো প্রকৃতিরই একটা উন্নত রূপ। মানুষ তার জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি, শিল্প, সংস্কৃতি আর প্রতিভা দিয়ে প্রকৃতিকে সমাজে পরিণত করে। আমি তাই প্রাণের উপর স্বাধীনতা, অন্তরের উপর সাম্য আর আত্মার উপর সৌহার্দ্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। শেকল টানার জন্য জন্ম হয়নি মানুষের, তার জন্ম হয়েছে মুক্তির আকাশে ওড়ার জন্য। আমি চাই মানুষ কীটপতঙ্গের জীবন ত্যাগ করে পাখাঅলা প্রাণীর মত আকাশে উড়বে।'

আবেগে আপ্লুত হয়ে গেছে গুভাঁ। গলা ধরে এল ওর। চোখ জ্বলতে থাকল জ্বলজ্বল করে। ওর দৃঢ় ভাষণের বিপক্ষে আর কোনও কথা খুঁজে পেল না সিমুর্দা। চুপ হয়ে গেল।

ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত দুটোর ঘণ্টা বাজল। প্রকোষ্ঠের বাইরে শোনা গেল পদশব্দ। প্রহরীদলের পালাবদল চলছে। কিন্তু গুভাঁ যেন কিছুই শুনছে না। স্বপ্নের জগতে হারিয়ে গেছে ও।

সিমুর্দা জিজ্ঞেস করল, 'কী ভাবছ?'

'ভবিষ্যতের কথা,' বলল গুভাঁ। 'বড়ই ভাল লাগছে সে-সময়ের কথা ভেবে। আমাকে এবার ক্ষমা করুন, গুরু। একটু একা থাকতে চাই।'

মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল সিমুর্দা। সাবধানে চোখের জল মুছে বেরিয়ে এল প্রকোষ্ঠ থেকে।

পঁচিশ

যথাসময়ে ফর্সা হয়ে এল পুবের আকাশ। ভোরের প্রথম আলোয় উদ্ভাসিত হলো লা তুয়োগ দুর্গ এবং তার আঙিনায় দাঁড়িয়ে থাকা গিলোটিন। নীল আকাশের পটভূমিতে ভয়ঙ্কর যন্ত্রটা যেন নিজের স্পর্ধা দেখাচ্ছে।

একদিকে প্রাচীন পাথরের দুর্গ, আরেকদিকে কাঠ আর লোহা দিয়ে তৈরি গিলোটিন... দেখে মনে হচ্ছে যেন দুটো মূর্তিমান দানব পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছে চরম কোনও বোঝাপড়ার জন্য। লা তুয়োগ হলো অতীত শাসনব্যবস্থার সন্তান, আর গিলোটিন বর্তমানের। লা তুয়োগ প্রাক্তন রাজতন্ত্রের প্রতিভূ, গিলোটিন বর্তমানের সন্তান, প্রজাতন্ত্রের প্রতিভূ। বাস্তিল যেমন ছিল প্যারিসের দুর্গ, লণ্ডন টাওয়ার যেমন ছিল ইংল্যাণ্ডের দুর্গ, জার্মানির যেমন ছিল স্পিলবার্গ, ইটালির ছিল সেইণ্ট অ্যাঞ্জেলোর প্রাসাদ... ঠিক তেমনি লা তুয়োগ হলো ব্রিটানির এক দুর্ভেদ্য দুর্গ। পনেরোশ' বছরের সুপ্রাচীন রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র আর দাসত্বের ইতিহাস পুঞ্জীভূত হয়ে আছে এর মাঝে। আর গিলোটিনের ইতিহাস মাত্র এক বছরের।

লা তুয়োগ দুর্গ দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সমন্বিত কীর্তি। ভূমিদাস-জমিদার, প্রভু-ক্রীতদাস, সাধারণ মানুষ ও

সামন্তবর্গ, যাজক-বিচারক... সবারই কিছু না কিছু অবদান আছে দুর্গটায়। লু তুয়োগ যেন শ্রেণীদ্বন্দ্ব আর শ্রেণী-সমন্বয়ের এক জটিল রহস্যময় গ্রন্থি, আর গিলোটিন হলো সেই গ্রন্থিমোচনের জন্য ব্যবহৃত এক দুর্ধর্ষ কুঠার। রাজতন্ত্র আর সামন্ততন্ত্রের হাজারো আতিশয্য, হাজারো অন্যায়-অবিচার আর অত্যাচারের সাক্ষী হয়ে আছে দুর্গটা। গিলোটিন তার বিপক্ষে নাঙ্গা তলোয়ার।

এক বিশাল অরণ্যচ্ছায়ার মাঝে যুগ যুগ ধরে নিজের বর্বর দেহটাকে লুকিয়ে রেখেছে লা তুয়োগ। তার বড় বড় খোলা জানালাগুলো দিয়ে এক কুটিল দৃষ্টিকে ছড়িয়ে দিয়েছে দূর-দূরান্তে। কত অত্যাচার-উৎপীড়নের ঘটনা ঘটেছে তার অভ্যন্তরে! ফুটন্ত তেল, জ্বলন্ত আলকাতরা আর গলন্ত সীসার মধ্যে কত না মানুষ দগ্ধ হয়েছে... কত নরকঙ্কাল স্তূপ হয়ে আছে তার অন্ধকার কারাগারে! ঘন কৃষ্ণ এবং জটিল অরণ্যের চাদর মুড়ি দিয়ে বর্বরোচিত প্রশান্তিতে ঘুমিয়ে থাকা দুর্গটা বহুদিন পর আজ যেন জেগে উঠেছে। একটি ভয়ের বস্তু যেন আরেকটি ভয়ের বস্তুকে দেখছে... হিংসা দেখছে প্রতিহিংসাকে... অপরাধ আর উৎপীড়ন দেখছে এক ভয়ঙ্কর প্রতিশোধকে।

মানবজাতির এ-সব ব্যাপারে প্রকৃতির কিন্তু কোনও আগ্রহ নেই। প্রকৃতি চিরকালই নির্মম... চিরকালই উদাসীন। আজকের ভোরের শান্ত প্রকৃতি যেন অন্য দিনগুলোর তুলনায় একটু বেশিই গৌরবোজ্জ্বল সাজে সজ্জিত হয়ে উঠেছে। মৃদুমন্দ হাওয়া বইছে, সূর্যের তপ্ত-নরম কিরণ ছড়িয়ে পড়ছে গাছের ডালে ডালে। দেখা-অদেখা হাজারো জলধারায় সিক্ত ফুজের অরণ্য কুয়াশার মিহি ঘোমটায় মুখ ঢেকে রেখেছে। আকাশের শান্ত-নিবিড় নীলিমা, মেঘমালার শুভ্রতা, নদী-জলধারার স্বচ্ছতা, পান্নাসবুজ গাছপালার বর্ণগন্ধময় উচ্ছ্বাস, ঘাসের মখমল-ঢাকা প্রসারিত

প্রান্তরের অটল অক্ষুণ্ণ প্রশান্তি... সবকিছুর মাঝে মিশে আছে প্রকৃতির পবিত্র হাসি।

মানুষের হিংসা-প্রতিহিংসার তাণ্ডব থেকে এ-কারণেই প্রকৃতি এত ব্যতিক্রম। প্রকৃতির শাশ্বত সৌন্দর্যের মাঝে মানুষের সমস্ত অনাচার ফুটে ওঠে বিশ্রী নগ্নতায়। মানুষ যত ভয়ঙ্কর বা বর্বর হোক না কেন, প্রকৃতি কখনও তাকে আপন মাধুরী থেকে বঞ্চিত করে না, বরং নিজেকে বিলিয়ে দেয় অকৃপণ হাতে। মানুষ হত্যা করে, ধ্বংস করে... কিন্তু বসন্তের সৌন্দর্য, ফুলের সুষমা, নক্ষত্রের আলো ঠিকই থাকে। তাদের কোনও পরিবর্তন হয় না।

মহান প্রকৃতির এই অপরূপ প্রতিচ্ছবির সামনে মানবিক লজ্জার ভয়ঙ্কর প্রতীক হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে লা তুয়োগ দুর্গ। দুর্গ নয়, আসলে যেন এক বধ্যভূমি—শাস্তি আর উৎপীড়নের এক তীর্থপীঠ। অতীতের কৃষ্ণ কলঙ্ক। তার পাশেই আজ দাঁড়িয়ে আছে বর্তমানের নতুন এক দানব—গিলোটিন। এদের অগ্রাহ্য করে প্রকৃতি রাঙিয়ে তুলেছে আকাশ, ছড়িয়ে দিয়েছে সুরভি।

সে এক আশ্চর্য পরিবেশ।

ভোরের আলো ফোটার আগে থেকেই বিশাল এক ভিড় জমেছে দুর্গ-আঙিনায়। প্রজাতন্ত্রী বাহিনীর চার সহস্রাধিক সৈন্য সমবেত হয়েছে তাদের প্রিয় অধিনায়কের মৃত্যুদণ্ড দেখবার জন্য।

আকাশ ফর্সা হলে দুর্গের ছাতে উঠে এল সিমুর্দা। প্রজাতন্ত্রের পতাকা-তলে একটা চেয়ার পেতে দেয়া হয়েছে তার জন্য। ওখানে বসে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবার দৃশ্য দেখবে সে। আজ... বহুদিন পর... আবার যাজকের পোশাক পরেছে সে। তার সঙ্গে বেমানান ভঙ্গিতে কোমরে ঝুলিয়েছে পিস্তল আর তলোয়ার। নির্ধারিত আসনে বসে আসামীকে হাজির করবার নির্দেশ দিল

সে।

ঢাক বেজে উঠল। দুর্গের প্রবেশপথ থেকে গিলোটিন-মঞ্চের গোড়া পর্যন্ত সার ধরে দাঁড়াল অস্ত্রধারী সৈন্যরা। তাদের মাঝ দিয়ে প্রহরী-পরিবেষ্টিত অবস্থায় বের করে আনা হলো গুভাঁকে। পুরোদস্তুর সামরিক ইউনিফর্ম পরানো হয়েছে ওকে, কোমরে তলোয়ারও ঝোলানো হয়েছে। সৈন্যরা অস্ত্র উঁচু করে সামরিক কায়দায় তাকে সম্মান দেখাল। প্রত্যুত্তরে মৃদু হাসল গুভাঁ। ওর চেহারায় ভয়ের কোনও চিহ্ন নেই, বরং গতরাতের সেই স্বপ্নালু আনন্দ এখনও খেলা করছে চোখে-মুখে। ক্ষণিকের জন্য মুখ তুলে ছাতের কিনারায় তাকাল, চোখাচোখি হলো সিমুর্দার সঙ্গে, তারপর আবার গর্বিত ভঙ্গিতে এগিয়ে চলল গিলোটিনের দিকে। সিমুর্দার চেহারায় বিষাদের ছায়াটা গাঢ় হলো আরও।

গিলোটিন মঞ্চের গোড়ায় গিয়ে থামল গুভাঁ। কোমরের বেল্ট আর তলোয়ার খুলে তুলে দিল এক প্রহরীর হাতে। তারপর গর্বিত ভঙ্গিতে সিঁড়ি ধরে উঠে গেল উপরে। জল্লাদ এগিয়ে এল, হাত ধরে ওকে নিয়ে গেল মঞ্চের প্রান্তে।

শেষবারের মত দুর্গের ছাতের দিকে তাকাল গুভাঁ। হাত তুলে বিদায় জানাল পিতৃসম শিক্ষককে। তারপর স্লোগান দিল, 'প্রজাতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক!'

ওকে হাঁটু গেড়ে বসালো জল্লাদ, কড়িকাঠের খাঁজে হাত আর মাথা রাখতে দিল, তারপর আটকে ফেলল উপর থেকে আরেক টুকরো তক্তা নামিয়ে। ফ্রেমের ঠিক তলায় ঘাড় পাতা অবস্থায় রয়েছে এখন গুভাঁ, ফ্রেমের উপরে ঝুলছে ওজনসহ ধারালো ব্লেড, দড়ির গিঁঠ খুলে দিলেই সবেগে নেমে আসবে, ধড় থেকে আলাদা করে দেবে মাথা। ভয়ঙ্কর এক দৃশ্য!

চারদিক থেকে হাহাকার করে উঠল সৈন্যরাঃ *মার্জনা করো!*

মার্জনা করো!!

কিন্তু তাদের আকুতি যেন শুনতে পেল না সিমুর্দা। বজ্রকণ্ঠে গর্জে উঠল, 'শাস্তি কার্যকর করো!'

তার সে-চিৎকারে স্তব্ধ হয়ে গেল সৈনিকরা।

দড়ির গিঁঠ খুলে দিল জল্লাদ। ভারী ব্লেডটা যেন প্রবল আক্রোশে নেমে এল গুভাঁর ঘাড় বরাবর। আর তখুনি দুর্গের ছাত থেকে ভেসে এল একটা গুলির আওয়াজ! নিজের বুকে পিস্তল ঠেকিয়ে গুলি করেছে সিমুর্দা!

গুভাঁর কাটা মাথা যখন গিলোটিনের নীচের ঝুড়িতে আছড়ে পড়ল, ঠিকই একই সময়ে চেয়ার থেকে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল প্রাক্তন যাজক। এক রাশ রক্ত বেরিয়ে এল তার মুখ দিয়ে। কয়েক মুহূর্ত তিরতির করে কাঁপল চোখের পাতা, তারপর বুজে গেল।

এভাবেই, একসঙ্গে পৃথিবী ত্যাগ করল গুরু-শিষ্য... দুটি অবিচ্ছেদ্য আত্মা। একটার উজ্জ্বলতায় হারিয়ে গেল অন্যটা।

***